শামসুর রাহমানের কবিতার নান্দনিকতা

তারানা নুপুর
রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ৫৯৮৭৪-সি
শিক্ষাবর্ষ : ২০১১-২০১২
বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ. ডি. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

জুলাই ২০১৭

Dhaka University Institutional Repository

শামসুর রাহমানের কবিতার নান্দনিকতা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ. ডি. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

জুলাই ২০১৭

তত্ত্বাবধায়ক

ড. বেগম আকতার কামাল
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা

গবেষক

তারানা নুপুর
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়
ত্রিশাল, ময়মনসিংহ

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন-পত্র

আমি **তারানা নুপুর**, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়, এই মর্মে প্রত্যয়ন করছি যে, অধ্যাপক **ড. বেগম আকতার কামালের** তত্ত্বাবধানে সম্পন্নকৃত এই অভিসন্দর্ভ বা অভিসন্দর্ভের কোনো অংশ অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিগ্রি বা প্রকাশের জন্য উপস্থাপন করা হয়নি।

তারানা নুপুর

সহকারী অধ্যাপক,
বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন-পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, তারানা নুপুর কর্তৃক উপস্থাপিত ***শামসুর রাহমানের কবিতার নান্দনিকতা*** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে রচিত। এই অভিসন্দর্ভ বা এর কোনো অংশ অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো ডিগ্রি বা প্রকাশের জন্য উপস্থাপন করা হয়নি।

ড. বেগম আকতার কামাল
গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক ও অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়	:	কবিতার নান্দনিকতার পরিপ্রেক্ষিত ও স্বরূপ	১-২১
দ্বিতীয় অধ্যায়			
প্রথম পরিচ্ছেদ	:	মিথ-প্রতীক-চিত্রকল্প-রূপক-প্রতিরূপক: চেতনার অন্তর্বয়ন	২২-৬০
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	:	পুনরাবৃত্তি, সমান্তরালতা ও তালিকায়ন: শব্দ-ভাষার বিন্যাস	৬১-৯৭
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	:	স্বপ্ন-কল্পমালা ও পরাবাস্তবতা: চেতন-অবচেতনের রূপায়ণ	৯৮-১৩৯
চতুর্থ পরিচ্ছেদ	:	ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ ও আয়রনি: সমকালীন রাজনৈতিক চেতনার প্রতিফলন	১৪০-১৫৯
পঞ্চম পরিচ্ছেদ	:	ব্যক্তি-সত্তার নানা রূপান্তর: আধুনিক রীতির প্রয়োগকলা	১৬০-১৮৬
উপসংহার	:		১৮৭-১৮৯
পরিশিষ্ট	:	শামসুর রাহমানের জীবনপঞ্জি	১৯০-১৯২
পরিশিষ্ট	:	শামসুর রাহমানের গ্রন্থপঞ্জি	১৯৩-১৯৮
পরিশিষ্ট	:	সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি	১৯৯-২০৯

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

শামসুর রাহমানের কবিতার নান্দনিকতা শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক, আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক, ডক্টর বেগম আকতার কামাল- এর তত্ত্বাবধানে ২০১১-২০১২ শিক্ষাবর্ষের পিএইচ. ডি. গবেষণাপত্ররূপে রচিত। এই অভিসন্দর্ভের সামগ্রিক পরিকল্পনা-প্রণয়ন ও রূপরেখা নির্মাণে তাঁর নির্দেশনা ও অনুপ্রেরণা আমার গবেষণার অন্যতম প্রবর্তনা। গবেষণা কাজে তাঁর সমৃদ্ধ গ্রন্থাগারটি উন্মুক্ত ছিল আমার জন্য। শামসুর রাহমান সম্পর্কিত সমস্ত সহায়ক গ্রন্থ, পত্র-পত্রিকা, স্মৃতিকথা, সাক্ষাৎকার ও তথ্যাদি সরবরাহ করে তিনি নিরন্তর উৎসাহ যুগিয়েছেন আমাকে। এই গবেষণায় আমার সমস্ত সীমাবদ্ধতাকে পরিপূর্ণতা দানে তাঁর অবদান অপরিসীম।

আমি আন্তরিকভাবে ঋণী শামসুর রাহমানের প্রিয় পুত্রবধূ টিয়া রাহমানের নিকট। তিনি কবির গ্রন্থাগারটি সস্নেহে উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন আমার জন্য। শামসুর রাহমানের জীবনব্যাপী কাব্য-অনুসন্ধিৎসার ফসল—তাঁর সংগৃহীত গ্রন্থাদি আমাকে গভীরভাবে সহায়তা করেছে তাঁর কাব্যরুচি নির্ণয়, কাব্য-প্রবর্তনাসমূহের উৎস সন্ধান ও সামগ্রিকভাবে কবির নান্দনিক বোধের সামীপ্য অর্জনে। আমার এ গবেষণায় টিয়া আপার সান্নিধ্য, কল্যাণ-কামনা ও আন্তরিক প্রেরণা আমাকে চিরদিন আপ্লুত করে রাখবে।

শামসুর রাহমানের কবিতার নান্দনিকতা শীর্ষক অভিসন্দর্ভে 'উপসংহার' ব্যতীত দু'টি অধ্যায় বিদ্যমান। পরিশিষ্টরূপে সংযোজিত হয়েছে 'শামসুর রাহমানের জীবনপঞ্জি', 'শামসুর রাহমানের গ্রন্থপঞ্জি' ও 'সহায়ক গ্রন্থাবলি ও পত্র-পত্রিকাপঞ্জি'। 'কবিতার নান্দনিকতার পরিপ্রেক্ষিত ও স্বরূপ' শিরোনামে অভিসন্দর্ভের প্রথম অধ্যায়ে কবিতার নান্দনিকতার স্বরূপ এবং নন্দনতত্ত্বের সাথে তার সম্পর্ক নিরূপণসূত্রে প্রাচীন কাল থেকে সমকাল পর্যন্ত চর্চিত নানা নন্দন-বীক্ষার সমান্তরালে কবিতার নান্দনিক চারিত্র্যের বিবর্তন ও রূপায়ণ-কৌশলের বৈচিত্র্য আলোচিত হয়েছে। সার্বিকভাবে কবিতার নান্দনিকতার ইতিহাস, কৌশল ও সমালোচনার সারাৎসার এই অধ্যায়ের উপজীব্য। এ অভিসন্দর্ভের দ্বিতীয় অধ্যায়ে শামসুর রাহমানের প্রকাশিত সমস্ত কাব্যগ্রন্থকে কালানুক্রমিকভাবে সুনির্দিষ্ট নান্দনিক প্রবণতায় চিহ্নিত করে নিম্নোক্ত পাঁচটি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত করা হয়েছে :

এক. 'মিথ-প্রতীক-চিত্রকল্প-রূপক-প্রতিরূপক : চেতনার অন্তর্বয়ন'

দুই. 'পুনরাবৃত্তি, সমান্তরালতা ও তালিকায়ন : শব্দ-ভাষার বিন্যাস'

Dhaka University Institutional Repository

তিন. ‘স্বপ্ন-কল্পমালা ও পরাবাস্তবতা : চেতন-অবচেতনের রূপায়ণ’

চার. ‘ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ ও আয়রনি : সমকালীন রাজনৈতিক চেতনার প্রতিফলন’

পাঁচ. ‘ব্যক্তি-সত্তার নানা রূপান্তর : আধুনিক রীতির প্রয়োগকলা’

দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদে শামসুর রাহমানের প্রথম পর্যায়ে রচিত কাব্যসমূহ অর্থাৎ *প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে* (১৯৬০) থেকে *নিরালোকে দিব্যরথ* (১৯৬৮) পর্যন্ত কাব্যগুলোতে মিথ-প্রতীক-চিত্রকল্প-রূপক-প্রতিরূপকে কবি-চেতনার নান্দনিক রূপায়ণের স্বরূপ আলোচিত হয়েছে। প্রথম পর্যায়ের এই কাব্যগুলো কবির ব্যক্তিগত বিষাদ-চৈতন্য থেকে পরের পর্বের বৃহত্তর দেশচেতনায় উত্তরণের উপক্রমণিকারূপে এবং নান্দনিক নিজত্ব প্রতিষ্ঠার নিরীক্ষা-পর্বরূপে চিহ্নিত হয়েছে।

নিজ বাসভূমে (১৯৭০) থেকে *ফিরিয়ে নাও ঘাতক কাঁটা* (১৯৭৪) পর্যন্ত কাব্যগুলোতে সমষ্টিচেতন কবি ১৯৭১ এর স্বাধীনতা যুদ্ধের সংকটাবর্তের অনুভূতিগুলোকে প্রকাশ করতে প্রয়োগ করেছেন কবিতার পুনরাবৃত্তি, সমান্তরালতা ও তালিকায়ন রীতি। দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পর্যায়ের কাব্যগুলোতে *আদিগন্ত নগ্ন পদধ্বনি* (১৯৭৪) থেকে *কবিতার সঙ্গে গেরস্থালি* (১৯৮৩) পর্যন্ত কাব্যগুলোতে কবির অন্তর্বাস্তবতার বহিরাশ্রয় হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে বাস্তব-পরাবাস্তবের সংমিশ্রণ কৌশল এবং মিথ চিত্রণের নতুনত্ব। ১৯৮৪ থেকে ১৯৯০ কাল-পর্বে প্রকাশিত কাব্যগুলোতে দৈশিক সংকটে কবি পুনরায় বহির্মুখী ও প্রকাশমুখর—দেশজুড়ে সমকালীন স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে গণঅভ্যুত্থানে জনতার সাথে সমস্বরিক। ফলে, রাজনৈতিক-সামাজিক অসঙ্গতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে কবি ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ, আয়রনির ব্যবহারে কবিতার শব্দ-ভাষা ও প্রকাশভঙ্গিকে কেমন প্রত্যক্ষ করে তোলেন, তা বর্ণিত হয়েছে দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ পরিচ্ছেদে। পঞ্চম পরিচ্ছেদে ১৯৯১ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত শামসুর রাহমানের জীবদ্দশার শেষ দুই দশকে রচিত কাব্যসমূহের নান্দনিক প্রয়োগ কৌশল সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এ পর্যায়ের কাব্যে পরাবাস্তবতা, স্বপ্ন-চিত্রকল্প, বস্তুজগতের কাল্পনিক রূপান্তরধর্মিতা (transmutation) প্রভৃতি নানা আধুনিক প্রকরণ কৌশলে কবির অন্তর্বাস্তবতা প্রকাশের স্বরূপ চিহ্নিত হয়েছে। ‘উপসংহারে’ শামসুর রাহমানের কবিতার নান্দনিক অভিজ্ঞান এবং কাব্যরীতি ও প্রকৌশলের সারমর্ম বিধৃত।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, শামসুর রাহমানের কবিতার বিষয়-ভাবনা আলোচনা এ অভিসন্দর্ভের উদ্দেশ্য নয় বরং কাঠামো-নির্ভর আলোচনার মাধ্যমে তাঁর কবিতার নন্দন-নিরীক্ষার নানা মাত্রা ও রূপায়ন-রীতি বিশ্লেষণই গবেষকের অন্বিষ্ট। তবে, আঙ্গিক-ভাবনার অংশরূপে কবিতার বিষয়, পরিপ্রেক্ষিত ও

Dhaka University Institutional Repository

প্রাসঙ্গিক তথ্যসমূহ অনালোচিত থাকেনি। সার্বিকভাবে, শামসুর রাহমানের কবিতার শিল্পচেতনা ও প্রকরণবৈচিত্র্যের প্রতি অভিনিবেশ আরোপ এই গবেষণার লক্ষ্য। শামসুর রাহমান একই সময়-পর্বে বিভিন্ন রকম কবিতা রচনা করেছেন এবং তাঁর বিভিন্ন সময়পর্বের কবিতাসমূহের মধ্যেও নান্দনিক সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। তাঁর প্রত্যেক পর্বের কাব্যের প্রধান নান্দনিক প্রবণতাগুলো চিহ্নিত করে এই অভিসন্দর্ভের অধ্যায় ও পরিচ্ছেদ বিভাজন করা হয়েছে। তা থেকে শামসুর রাহমানের সমগ্র কাব্যের প্রকরণগত রূপান্তর ও কাব্যকলার বৈচিত্র্য নিরূপণ করা হয়েছে।

অনুদিত কাব্য এবং ছড়াসমূহ ব্যতীত ১৯৬০ থেকে ২০০৬ পর্যন্ত দীর্ঘ সময় জুড়ে রচিত শামসুর রাহমানের সমস্ত কাব্য এই গবেষণার পরিধিভুক্ত। এ ক্ষেত্রে প্রাথমিক উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে ঐতিহ্য প্রকাশনীর *শামসুর রাহমান রচনাবলী*র প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড এবং পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত অনন্যা প্রকাশনীর *কবিতা সমগ্র শামসুর রাহমান*। বর্তমান অভিসন্দর্ভে মূলগ্রন্থরূপে উপর্যুক্ত সংকলনগুলো ব্যবহৃত হয়েছে।

অভিসন্দর্ভ রচনাকালে আমি ব্যবহার করেছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার এবং জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার। উক্ত তিন গ্রন্থাগার-কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারীদের আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আমার জীবনসঙ্গী নূরুল ইমরান এবং পুত্র মাভৈ সকল কৃতজ্ঞতার ঊর্ধ্বে। উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভটি আমার বাবার উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত।

তারানা নুপুর
১৯ জুলাই, ২০১৭

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়
কবিতার নান্দনিকতার পরিপ্রেক্ষিত ও স্বরূপ

পৃথিবীর সকল সুন্দর অনুভূতিই নান্দনিক নয়; প্রত্যেক প্রকাশই শিল্পিত নয়। সব সুন্দর থেকেই কাব্য সৌন্দর্যের জন্ম হয় না কিংবা প্রকাশ মাত্রেই শব্দ-ভাষা নান্দনিক হয়ে ওঠে না। যে কোনো সুন্দরই শিল্পীর অন্তর্জগৎ-জারিত হয়ে নতুন রূপ ও রসে প্রকাশিত হয়ে নান্দনিকতাপ্রাপ্ত হয়। বস্তুজগতের সত্য ও সুন্দর কবির অহং বা আমিত্ব, অভিজ্ঞতা ও স্বজ্ঞা এবং রূপ-সৃষ্টির ধারাবাহিকতায় রসনিস্পন্ন হয়ে তবেই নান্দনিক হয়ে ওঠে। কবির উদ্দেশ্য সেই নতুন সুন্দরের প্রতিষ্ঠা। বস্তুজগতের তথ্য আর কবিতার সত্য ভিন্ন। শিশুর হাসি, পাখির কলতান, পল্লবের মর্মর—এসব সুন্দর ও শ্রবণ-সুভগ কিন্তু রূপজগতের কোনো সুন্দর কিংবা কুৎসিত কবির স্বজ্ঞা ও চেতনায় নতুন সত্য ও সুন্দরের জন্ম দেয়। সেই সুন্দরই কবিতার সুন্দর। নান্দনিকতার মুল কথা এই 'সৌন্দর্য'। প্রকৃতির সন্দর্শন থেকে শুরু করে তার চিন্ময় প্রকাশ পর্যন্ত কবির এই নান্দনিক অভিজ্ঞতার কোনো সরল সমীকরণ সম্ভব নয়। প্রত্যেক কবির নান্দনিক আদর্শও ভিন্ন, তবু কবি ও নন্দনতাত্ত্বিকগণ যুগে-যুগে সেই চিরন্তন সৃষ্টি-রহস্যের সার সন্ধানে এবং ব্যখ্যা-বিশ্লেষণে উৎসুক থেকেছেন। নান্দনিকতা দর্শন-নিরপেক্ষ, স্বাধীন এবং একটি বিমূর্ত সত্তা। ফলে, নন্দনতত্ত্ব নান্দনিকতার উপর নির্ভরশীল একটি সাধারণীকৃত ধারণা মাত্র—কোনো স্বতঃসিদ্ধ সিদ্ধান্ত নয়। রুচি, অভিজ্ঞতা, পর্যবেক্ষণ, মূল্যবিচার ও নানা মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনে কালে-কালে কবিতার নান্দনিকতার সাথে-সাথে রূপান্তরিত হয়েছে নন্দনতত্ত্ব । সেইসব আলোচনার কেন্দ্রবস্তু হয়ছে কখনো কবির স্বজ্ঞা-রহস্য, কখনো রূপমুখ্যতা; কখনো নির্বস্তুকতা অথবা বস্তুবাদিতা, কখনো অবচেতনের রূপরহস্য, কাঠামোসর্বস্বতা কিংবা কলাকৈবল্যবাদ। সময়ের সাথে-সাথে পরিবর্তিত হয়েছে কবিতার নান্দনিকতার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

কবিতা তার প্রাগৈতিহাসিক পর্বের যূথকৃত্যের মিশ্র সম্পর্ক ছেড়ে মৌখিক-পরম্পরায় বাহিত হয়ে, মহাকাব্যের মহিমা পেরিয়ে গীতিকবিতার নিজত্বে আপন গৌরব প্রতিষ্ঠা করেছে বহুকাল আগেই। কবিতার নান্দনিকতা সমষ্টিবোধ থেকে কালক্রমে ব্যক্তিবোধে রূপান্তরিত হয়েছে। মহাবিশ্ব যেমন এক মহাঘনীভূত শক্তি থেকে ক্রমশ সূক্ষ্ম হতে হতে উল্কায় পরিণত, কাব্যও তেমনি তার বিশ্বম্ভর মূর্তি থেকে ক্ষয়ে-ক্ষয়ে কবি-রূপ উল্কাখণ্ডের মধ্যে আবদ্ধ (সুধীন্দ্রনাথ, ১৯৯৫: ১৩)। কবিতা মানব জাতির এক অনিঃশেষ অভিযাত্রার নাম। কবিতার নান্দনিকতা যুগে-যুগে সেই সব যাত্রা-রহস্যে কবির অভিজ্ঞতা ও প্রকাশের সার আর নন্দনতত্ত্ব সেই ভ্রমণবৃত্তান্তের খুঁটিনাটি বিশ্লেষণ। কবিতার

Dhaka University Institutional Repository

নান্দনিকতার প্রতীতিসমূহ যেমন রূপান্তরশীল, তেমনি নন্দনতত্ত্বও শিল্প ও যুগানুভূতির সাথে-সাথে ক্রমাগ্রসর।

গ্রেকো-রোমান যুগের 'মাইমেসিস' বা অনুকরণের প্রাচীন বীক্ষণ থেকে কবিতার নান্দনিক মূল্যায়নের ধারণা আরো গভীর ও ব্যাপ্ত প্রত্যয় অর্জন করে পরবর্তীকালে। প্লেটো শিল্পকে 'অনুকরণের অনুকরণ'রূপে মূল্যায়ন করেছিলেন অর্থাৎ তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিতে কবিতা বস্তু বা প্রকৃতির নিম্নতর প্রতিফলন মাত্র। প্লেটো এই অনুকরণকে নেতিবাচক বলে প্রত্যাখ্যান করেন আর অ্যরিস্টটল সেই অনুকরণকে সুন্দর ও অর্থপূর্ণ বলে সমর্থন করেন। কিন্তু, কবি সাধারণ অর্থে কেবল একজন ভাস্কর বা পটুয়া শিল্পী নন, যে দৃশ্যবস্তুকে কেবল মূর্তিরূপ দান করেন। প্রত্যক্ষণ এবং তার প্রকাশই শিল্প নয়। প্লেটো বা অ্যরিস্টটলের সময়ের অনুকৃতির নান্দনিক ধারায় অনালোকিত থেকে যায় কবির স্বজ্ঞা বা তাঁর নান্দনিক সংবেদনা। অথচ, কবির নান্দনিকতার কেন্দ্র এই স্বজ্ঞা এক চিন্ময় বিস্ময়। উত্তরকালের নন্দন-ভাবনায় গুরুত্ব পেয়েছে কবির অনুভূতি, কল্পনা, ইন্দ্রিয়বোধ ও 'সাবলাইম'-রহস্য—কবিতায় বাচ্যার্থের অতিরিক্ত যে ব্যঞ্জনাকে ভারতীয় নন্দনশাস্ত্রে বলা হয় কবিতার 'ধ্বনি' বা আত্মা (অতুলচন্দ্র, ২০০২: ১০)। সংবেদনা থেকে আনন্দময় রূপ-সৃষ্টির অন্তর্বর্তী এই কবি-আত্মার রহস্যময় পথ-পরিক্রমাকে কেন্দ্র করে অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে-সব কবি ও কাব্যসমালোচকগণ তত্ত্বজিজ্ঞাসায় মত্ত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে বমগার্টেন (১৭১৪-১৭৬২), কান্ট (১৭২৪-১৮০৪), ফ্রেডরিক শিলার (১৭৫৯-১৮০৫), উইলিয়াম ফিখটে (১৭৬২-১৮১৪), ফ্রেডরিক শ্লেগেল (১৭৭২-১৮২৯), ফ্রেডরিক হেগেল (১৭৭০-১৮৩১) প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। ঊনবিংশ শতাব্দীর রোমান্টিক কবিতায় ব্যক্তিক ও নৈর্ব্যক্তিক, বিশ্বজনীন ও বিশেষ, সীমা-অসীম, ইন্দ্রিয়জাত ও মানবিক, বস্তুজগত ও কল্পনার মধ্যে যে নানা মাত্রার সমন্বয় ঘটে, সে প্রবর্তনার উৎস ছিল এই দার্শনিকদের নানা নন্দন-ভাবনা ও কাব্য-বিশ্লেষণ। বস্তুত, নন্দনতত্ত্ব বা আর্টের দর্শনের উত্থান ঘটে এ সময়। এর পূর্বে আর্ট সীমাবদ্ধ ছিল কেবল শিল্পীর সৃষ্টি ও ভোক্তার আনন্দে। নান্দনিক অভিজ্ঞতা, নান্দনিক সঙ্গতি, নান্দনিকতা, নন্দনতত্ত্ব প্রভৃতি ধারণা ও অভিপ্রায়গুলো সমন্বিত হয় এবং 'নন্দনতত্ত্ববিদদের এক নতুন প্রজন্ম নন্দনতত্ত্বের ভেতরকার সব সংগঠনগুলো খুলে খুলে দেখার কাজে ব্যাপৃত হলেন এ সময়' (ঈগলটন, ২০০৪: ২৯)।

নন্দনশাস্ত্রের জনক বমগার্টেন তাঁর *Aesthetica* (১৭৫০) গ্রন্থে কবিতার নন্দনতত্ত্বকে (poetics) একটি স্বতন্ত্র বিজ্ঞানরূপে প্রতিষ্ঠা দিতে প্রয়াসী ছিলেন। কবিতাকে তিনি সংজ্ঞায়িত

Dhaka University Institutional Repository

করেছিলেন 'perfect sensate discourse' বা সু-সংবেদী শব্দভাষ্যরূপে (Beiser, 2009: 126)। 'সেন্স' বা ইন্দ্রিয়-সংবেদী শব্দ-ভাষার রূপায়ণকেই (sense representation) তিনি কবিতার প্রথম শর্তরূপে চিহ্নিত করেছেন। দ্বৈতীয়িক বৈশিষ্ট্যরূপে তিনি উল্লেখ করেছেন কবিতার 'confused representation' বা বিমূর্ত উপস্থাপনকে, যা বাচ্যার্থকে ছাড়িয়ে নতুনরূপে মূর্ত হয়, যাকে সরল ভাষায় চিহ্নিত করা যায় না। কারণ, কবির সুবেদী অন্তর থেকে উৎসারিত হয়ে তা এক ধরনের ব্যাপকতা অর্জন করে। কবিতা তখন intensive থেকে extensive হয়ে ওঠে (Beiser, 2009: 129)। একটি সাধারণ ভাব তখন হয়ে উঠতে পারে নৈর্ব্যক্তিক, বিশ্বজনীন, শাশ্বত।

ইমানুয়েল কান্ট তাঁর *Critique of Judgment* (১৭৯০) গ্রন্থে বমগার্টেনের রোমান্টিক নন্দনতত্ত্বের এই ইন্দ্রিয়-সংবেদনাজনিত জ্ঞানের ধারণাকে সরল ও যৌক্তিক আখ্যায় উপস্থাপন করেন এবং স্বজ্ঞা, কল্পনা, ইন্দ্রিয়বোধ প্রভৃতি যে নান্দনিকতার অপরিহার্য শর্ত নয়, তা ব্যক্ত করেন। কান্টের তত্ত্ব মতে, বহির্জগৎ ঠিক সেইরূপ, যেমনভাবে আমরা তাকে প্রত্যক্ষ করি। একটি নির্দিষ্ট স্থান ও সময়খণ্ডে বসে আমরা জগৎকে তার আপন সংস্থিত রূপেই প্রত্যক্ষণ করি এবং সেই প্রত্যক্ষণে সক্রিয় থাকে কবির নিজস্ব বিচারবুদ্ধি (judgment)। কবি সেই প্রত্যক্ষণ থেকে সরাসরি যে সৌন্দর্য নির্মাণ করেন, তা-ই কবিতার অতীন্দ্রিয় সৌন্দর্য বা 'transcendental beauty'। কান্ট কবির স্বজ্ঞা এবং সংবেদনা, কল্পনা এবং সকল বিমূর্ত অভিজ্ঞতার পরিবর্তে কবি-মানসে বস্তুর যৌক্তিক চিন্তার প্রয়োগরূপে সৌন্দর্যকে চিহ্নিত করে নান্দনিকতার বস্তুনিষ্ঠ ব্যাখ্যা প্রয়োগে আগ্রহী ছিলেন। কান্টের দর্শন অনুযায়ী—কবির চেতনার রঙে পান্না সবুজ হয় না, পান্না সবুজ বলেই তা সবুজ মনে হয়। কবির যৌক্তিক মন নির্ধারণ করে তার হরিৎ-মাত্রা। কান্টের বক্তব্যে—কবি বস্তুজগতের সুন্দর থেকে সরাসরি শিল্প অভিমুখে যাত্রা করেন, এর মধ্যে স্বজ্ঞা, কল্পনা বা বিমূর্ততার অবকাশ নেই। কবির রুচি অথবা বিচারে যদি পান্নাকে সবুজ বলে মনে হয়, তবে কবি আত্মা তৃপ্ত হয়, আনন্দ লাভ করে এবং সেই আনন্দ শিল্পে প্রকাশ করেন। তখন পান্নার খাঁটি সবুজতা সর্বজনীনতা অর্জন করে। এভাবে কবি একটি অতীন্দ্রীয় transcendental ও বিশ্ববোধে উত্তীর্ণ হন। অর্থাৎ কান্ট কবিতার নান্দনিক জননে ইন্দ্রিয়বোধের প্রাধান্যকে নস্যাৎ করে দেন এবং বস্তুকে সৌন্দর্যের উৎসরূপে প্রাধান্য দেন। নান্দনিকতার বহু বিবর্তন শেষে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে পৌঁছে এডমন্ড হুসার্ল (১৮৫৯-১৯৩৮) প্রমুখ অবভাসবাদী তাত্ত্বিকগণ তাঁদের আধুনিক তত্ত্বে কান্টের মতই শুদ্ধ প্রত্যক্ষণ ও তার তূরীয় (transcendental) প্রকাশকে শিল্পের সার বলে জেনেছেন। কান্টের তত্ত্ব সম্পূর্ণতা পায় তাঁর উত্তরসূরী জার্মানির 'জেনা' সম্প্রদায়ের দার্শনিক শিলার (১৭৫৯-১৮০৫), ফিখটে (১৭৬২-১৮১৪),

Dhaka University Institutional Repository

শ্লেগেল (১৭৭২-১৮২৯) প্রমুখের যুক্তিবাদী দর্শনে। অপর জার্মান দার্শনিক ফ্রেডরিক হেগেলের (১৭৭০-১৮৩১) তত্ত্বের কল্পনা, ভাব ও পরম ব্রহ্মের তত্ত্ব রোমান্টিক কবিদের প্রভাবিত করে। হেগেল বলেন যে, প্রকৃতিতে যে সুন্দর তা তত সুন্দর নয়, কবির কল্পনায় জন্ম নেয়া নতুন সুন্দরই মহত্তর—''for the beauty of art is the beauty that is born born again, that is of the mind; mind, and mind only, is capable of truth (Bosanquet, 1886: 3) ঠিক রবীন্দ্রনাথ যেমন বলেন, ''আমারি চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ,/ চুনি উঠল রাঙা হয়ে।/ আমি চোখ মেললুম আকাশে,/ জ্বলে উঠলো আলো/ পূর্বে পশ্চিমে।/ গোলাপের দিকে চেয়ে বললুম, সুন্দর,/ সুন্দর হলো সে '' (রবীন্দ্রনাথ,১৩৯০: ৩৯২)। অর্থাৎ, হেগেলের মতে, বস্তু দর্শনে কবির মনে যে ভাব বা idea'র জন্ম হয়, তারই আলোয় শিল্পের নতুন সত্যের জন্ম হয়। এই সৃষ্টি-রহস্য সম্পর্কে হেগেল বলেন, একজন বালক যেমন জলে ঢিল ছুঁড়ে আনন্দের সাথে তীরে দাঁড়িয়ে লক্ষ করে জলের কম্প্রমান বৃত্ত-পরিবৃত্তগুলো, তেমনি কোনো বস্তু বা বিষয় শিল্পীর মনে তাঁর নিজস্ব ভাবনার যে জলতরঙ্গ সৃষ্টি করে, তা থেকেই সৃষ্টি হয় নতুন রূপ—একেই হেগেল বলেছেন শিল্প-সৃষ্টির দ্বিস্তরী প্রক্রিয়া (twofold way) (Bosanquet, 1888: 58-59)। হেগেলের ভাববাদী নন্দনতত্ত্বের প্রতিধ্বনিই শোনা যায় রোমান্টিক কবিদের কাব্যাদর্শে। একইভাবে, জার্মান দার্শনিকদের তত্ত্বের প্রভাব পড়ে ওয়ার্ডসওয়ার্থ (১৭৭০-১৮৫০) ও কোলরিজ (১৭৭২-১৮৩৪) রচিত রোমান্টিক কবিতার নান্দনিকতার মুখপত্র *Lyrical Ballads* (১৭৯৮) এ। ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও কোলরিজের কবিতার বহিরাশ্রয় হয়ে ওঠে সাধারণ মানুষ, জীবন, প্রকৃতি এবং কবিতার অন্তঃপ্রেরণা হয় কল্পনা ও আবেগ। ওয়ার্ডসওয়ার্থ শক্তিশালী আবেগের স্বতঃস্ফূর্ত বহিঃপ্রকাশকেই কবিতারূপে সংজ্ঞায়িত করেন—''Poetry is the spontaneous overflow of powerfull feelings'' (Sen & others, 1994: 54)। পার্সি বিশি শেলী (১৭৯২-১৮২২) তাঁর *A Defence of Poetry* (১৮২১) প্রবন্ধে রোমান্টিক কবিতার ভাব, প্রকৃতি ও নান্দনিকতা নিয়ে আলোচনা করেন। শেলীর কাব্যাদর্শে বুদ্ধিবৃত্তি (reason) এবং কল্পনা (imagination) হলো কবির কাব্য রচনার দুই মূল নিয়ন্ত্রক শক্তি—এই দু'য়ের সমন্বয় কবিতা। বুদ্ধিবৃত্তি হলো কবির অভিজ্ঞান আর 'কল্পনা' তার পর্যবেক্ষণ—প্রথমটি কবিতার দেহ আর দ্বিতীয়টি হলো প্রাণ। সুতরাং, ''the expression of the imagination'' অর্থাৎ, কল্পনার প্রকাশকেই কবিতা বলেছেন শেলী (Shelly, 1904, 12)। হৃদয়গ্রাহী, ইন্দ্রিয়চেতন ও সুরেলা শব্দ-ভাষায় কবির অহং, কল্পনা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে রহস্যতন্ময়, অতীন্দ্রিয় ও বিশ্বজনীন করে তোলাই ছিল রোমান্টিক কবিতার নান্দনিক প্রত্যয়। বস্তুবিশ্বের সত্যকে

Dhaka University Institutional Repository

কল্পনার নতুন সত্যে রূপান্তরই ছিল কবিতার সৌন্দর্য—কীট্‌সের ভাষায়—'truth is beauty'। কীট্‌সের এই অন্তর্সত্যের সাথে যোগাযোগ ছিল রবীন্দ্রনাথেরও। তবে, রবীন্দ্রনাথ বস্তুজগৎ, কবির কল্পনা ও তাঁর প্রকাশের রূপটি খুঁজে পেয়েছিলেন উপনিষদের ত্রিমাত্রিক ব্রহ্ম-স্বরূপে। ব্রহ্মার তিনটি সত্তা হলো—সত্যম, জ্ঞানম, অনন্তম্। প্রথমটিকে রবীন্দ্রনাথ কল্পনা করেন বস্তুজাগতিক অস্তিত্বের সাথে কবির সম্পর্করূপে, দ্বিতীয়টি কবির অভিজ্ঞতা বা কল্পনা-জগত, তৃতীয়টি সেই অনুভূতির প্রকাশ। রবীন্দ্রনাথের নান্দনিক দর্শনে সীমা থেকে অসীমে, বস্তুজগৎ থেকে বিশ্বজাগতিকতায় উত্তরণের সেতু এই ত্রিত্ব (রবীন্দ্রনাথ, ১৮৮০: ৩৭৫)। রবীন্দ্রনাথ প্রকাশকেই 'আনন্দ' বলেছেন। কারণ, প্রকাশের মধ্য দিয়ে অরূপকে রূপলোকে ব্যক্ত করা যায়। তাই, আনন্দের দেবতা 'আবিঃ' কবির উপাস্য (রবীন্দ্রনাথ, ১৮৮০: ৩৭৮)। সুতরাং, রবীন্দ্রনাথের ভাবনা অনুযায়ী নান্দনিকতার সার কথা হলো কবির হৃদয়ের 'ঐক্যের আদর্শ', যা দিয়ে তিনি অন্তরাত্মার সাথে বহির্লোকের মিলন ঘটান—প্রকাশ ঘটান শব্দ-ধ্বনি-ছন্দে—সীমাকে অসীম করে তোলেন। কবি তাঁর প্রকাশের ক্ষেত্রে যে শব্দ-ভাষা ব্যবহার করেন, তাকেও তাই আভিধানিক অর্থের সীমা ছাড়িয়ে সত্যের অসীমতাকে প্রকাশ করতে হয়। এইভাবেই বিশ্বলোকের সাথে কবির চিরকালের সম্পর্ক স্থাপিত হয় (রবীন্দ্রনাথ, ১৮৮০: ৩৮৯)। রবীন্দ্রনাথ কল্পনা ও প্রকাশকে নান্দনিক ঐক্যে সমন্বিত হওয়াই বাঞ্ছণীয় মনে করেছেন, তবে তাতে রূপের দায়িত্ব যে অধিক, সেকথা জোর দিয়ে বলেছেন। কীট্‌সের পঙ্‌ক্তি উদ্ধরণসূত্রে তিনি বলেন—

> শেষ কথা হচ্ছে : Truth is beauty। কাব্যে এই ট্রুথ রূপের ট্রুথ, তথ্যের নয়। কাব্যের রূপ যদি ট্রুথ-রূপে অত্যন্ত প্রতীতিযোগ্য না হয় তা হলে তথ্যের আদালতে সে অনিন্দনীয় প্রমাণিত হলেও কাব্যের দরবারে সে নিন্দিত হবে (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৭৪: ২৫৩-২৫৪)।

বিংশ শতাব্দীতে এসে যাঁর তত্ত্বে প্রকাশবাদী নান্দনিক ধারার সূত্রপাত হয়, যিনি আরো পরে কাঠামোবাদীদের প্রেরণা ছিলেন, তিনি বেনেদিত্তো ক্রোচে (১৮৬০-১৯৫২) । এমনকি বিংশ শতাব্দীতে কবিতার নন্দনতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে ভাষার আধিপত্যের সূচনা-সূত্রও ক্রোচের যুগান্তকারী তত্ত্বে ছিল। ক্রোচে কবিতায় স্বজ্ঞার গুরুত্বকে স্বীকার করলেও মূলত প্রকাশকেই প্রধান ভেবেছিলেন। ক্রোচের মতে সৃষ্টি ও প্রকাশ একই ক্রিয়ার দুই দিক মাত্র—বস্তুর প্রতিরূপ সৃষ্টিও যা, তার প্রকাশও তাই। স্বজ্ঞা ও প্রকাশ একই ক্রিয়ার নামান্তর মাত্র এবং যেহেতু সহজ জ্ঞানের প্রতিরূপ সৃষ্টিই শিল্প, সেহেতু তা প্রকাশ ব্যতীত আর কিছুই নয়। ক্রোচে'র ভাষায়—''Intuitive knowledge is expressive knowledge… to intuitive is to express; and nothing else (nothing more, but nothing less) than to express" (Doglas, 1965: 11)।

Dhaka University Institutional Repository

ক্রোচে বলেন—'' Art is Expression" (Bosanquet, 1919: 1) এবং যেহেতু, স্বজ্ঞাই প্রকাশ, সেহেতু ভাষাই প্রকাশ ''all expression is language" (Bosanquet, 1919: 5)। ভাব ও ভাষা ক্রোচের কাছে তাই অভিন্ন। কারণ, কোনো কবির রসোপলব্ধি হলে অনুরূপ শব্দ-ভাষার মধ্য দিয়ে তার প্রকাশ ঘটে। 'ভাষার অতীত কোনো ভাবের সত্তা ক্রোচে মানতে রাজি নন; ভাব যদি সত্যিই গভীর হয় প্রকাশ আসবে অনিবার্য পথেই (দেবীপ্রসাদ, ১৩৫৩, ৩০)। ক্রোচে'র এই ভাষাভিত্তিক নন্দন-বীক্ষা ছিল পূর্বজ গিয়ামবাত্তিস্তা ভিকো'র (১৬৬৪-১৭৪৪) তত্ত্ব দ্বারা প্রভাবিত, যেখানে ভিকো আদিম মানুষের ভাষা ও কল্পনার সাথে কবিতার সংযোগ সূত্র কল্পনা করেছিলেন (Bosanquet, 1919: 4) । ভিকো'র মত ক্রোচেও বলেন ভাষার দর্শন আর শিল্পের দর্শন অভিন্ন এমনকি ভাষাতত্ত্ব এবং নন্দনতত্ত্ব একই বিজ্ঞান—''aesthetic and linguistic, is no far as they are true sciences, but one single scienc" (Khadey, 1922: 13)। ক্রোচে কাব্য-ভাষাকে এতো গুরুত্ব দিয়েছিলেন, কারণ নান্দনিক প্রকাশে কবির স্বজ্ঞার সাথে সবচেয়ে ঘনিষ্ট সম্পর্ক এই ভাষার। ভাষা যেহেতু ভাবকেও ধারণ করে, ফলে যে কেউ ভাষার স্বজ্ঞাকে অনুসরণ করে কবির মানসলোকেও পৌঁছতে পারে। তাছাড়া, ক্রোচে'র মতে, ভাষাই যথেষ্ট কবিত্বপূর্ণ। নিঃসন্দেহে ক্রোচে'র এই ভাষা ও প্রকাশকেন্দ্রিক মতবাদ বিংশ শতাব্দীর আধুনিক কাঠামোবাদের প্রেরণাসূত্র। তবে, এই কাঠামোবাদী, যাঁরা মূলত নান্দনিকতার নেতিতে বা 'anesthetic' এ বিশ্বাসী, তাঁদের মত ক্রোচে কবির স্বজ্ঞাকে নিস্প্রয়োজনীয় বলে ভাবেননি। মূলত ক্রোচে'র তত্ত্বে কবির স্বজ্ঞা তাঁর প্রকাশেরই অংশ, যেমন কাঠামোবাদীরা বলেন কবিতার ভাব তার শব্দ-ভাষারই অংশ (Eagleton, 2007: 50)। ক্রোচে কবিতার নান্দনিকতার আধুনিক প্রকাশবাদী ধারার পূর্বসূরী। ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রেও ভামহ, বামন প্রমুখ কাব্যে রীতিবাদের পক্ষপাতী ছিলেন। 'কাব্যং গ্রাহ্যমলংকারাং' কিংবা 'রীতিরাত্মা কাব্যস্য' তাঁদের অনুধ্যানের বিষয় ছিল (অতুল, ২০০২: ৮-৯)। অষ্টাদশ শতাব্দী জুড়ে ভাববাদী ও রূপবাদী নন্দনতাত্ত্বিকদের মধ্যে বিতর্ক চলে। ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে শুরু হয় রূপবাদীদের প্রতাপ। রোমান্টিক কাব্যের 'আনন্দবাদ' কিংবা অষ্টাদশ শতাব্দীতে ম্যাথু আর্নল্ডের কলাদর্শ 'Art for art's sake'এর ধারণাটি ক্রমে প্রবল হতে-হতে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে নতুনভাবে এক 'কলাকৈবল্যবাদী' ধারার জন্ম দেয়, যা শেষ পর্যন্ত 'অবক্ষয়বাদী' (ডেকাডেন্স) সাহিত্যধারায় সমীকৃত হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ফ্রান্সে জন্ম নেয়া এই নান্দনিকতার মূল লক্ষ্যও ছিল 'শিল্পের জন্য শিল্প'। রোমান্টিক যুগের কলাকৈবল্যবাদের সুবাদে কবিতা প্লেটোনিক ধারণার মঙ্গলময়তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিল। তখন কবিতার নান্দনিকতার সাথে সম্পর্ক ছিল কেবল সৌন্দর্য ও আনন্দের। বিংশ শতাব্দীর নব্য কলাকৈবল্যবাদীরা ছিলেন মূলত আঙ্গিকবাদী। ওই

Dhaka University Institutional Repository

শতাব্দীতেই কার্ল মার্কস (১৮১৮-১৮৮৩) প্রণীত 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদে' বিশ্বাসী মার্কসবাদী নন্দনতাত্ত্বিকগণ শ্রেণীবিভক্ত সমাজের বাস্তবতাবর্জিত এই কলাসর্বস্ব কবিতা, যা বিপ্লবকে নির্জিত করে এবং কেবল অবসরের সাধনা করে, তাকে পরিত্যাজ্য বলে মনে করেন। মার্কসবাদীরা শিল্পকর্মে সামাজিক ভূমিকাকে প্রাধান্য দেন এবং তাকেই নান্দনিকতার একমাত্র আদর্শরূপে গণ্য করেন। ফলে, এই ধারায় কবিতার আঙ্গিক অপেক্ষা বিষয় প্রাধান্য পেতে শুরু করে। 'শিল্পের জন্য শিল্প' ঊনবিংশ শতাব্দীতে সমাজতান্ত্রিক বস্তুবাদী ভাবনায় জীবন-বিশ্লিষ্ট বুর্জোয়া নান্দনিকতারূপে অভিযুক্ত হয়। প্লেখানভ (১৮৫৬-১৯১৮) আঙ্গিকের প্রতি কবির ঐকান্তিক আগ্রহকে তাঁর রাজনৈতিক ও সামাজিক উদাসীনতার ফল বলে মনে করেন এবং এ ধরনের শিল্প জনমনে নৈরাশ্যসঞ্চারী বলে অবাঞ্ছনীয় ঘোষণা করেন (সাঈদ, ১৯৮৫: ১৯)। শিল্প লক্ষ্যহীন কোনো সৌন্দর্য-চর্চা নয়, বরং সমাজ-মানসের পরিবর্তনে তার কার্যকরী ভূমিকা থাকা প্রয়োজন বলে মনে করে মার্কসীয় নন্দনতত্ত্ব। টলস্টয় (১৮২৮-১৯১০) কথিত প্রতিফলন তত্ত্বের (reflection theory) ভিত্তিতে একজন কবি তাঁর সমাজ ও পরিপার্শ্বের সাথে সংশ্লিষ্ট—সমাজ গঠনে তাঁর সক্রিয় ভূমিকা থাকা প্রয়োজন। সেজন্যই আধার অপেক্ষা আধেয় কবিতার জন্য অধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। লুনাচারস্কির (১৮৭৫-১৯৩৩) মতে সমাজ-বিচ্ছিন্ন, আধেয়-বর্জিত আঙ্গিকসর্বস্ব সাহিত্য প্রায়শই পলায়নমুখী, শব্দাড়ম্বরপূর্ণ কিংবা চটুল বরং সেই সাহিত্যই মহৎ যেখানে আঙ্গিক সর্বোতভাবে আধেয় দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় (সাঈদ, ১৯৮৫: ৬৩)। একই কারণে শিল্পে ব্যক্তিকেন্দ্রিকতাকেও বিশেষত প্রকৃতিবাদী, মনস্তত্ত্ববাদী এবং বিমূর্ত আঙ্গিকবাদীদের রচনাকর্মগুলোকে আক্রমণ করেছিলেন মার্কসবাদী নন্দনতাত্ত্বিকগণ। মূলত, মার্কসবাদী নন্দনতত্ত্বের সাথে-সাথে কিয়ের্কেগার্ড (১৮১৩-১৮৫৫), নীট্‌সে (১৮৪৪-১৯০০), হাইডেগার (১৮৮৯-১৯৭৬), সার্তে (১৯০৫-১৯৮০) প্রমুখ দার্শনিকদের নন্দনভাবনার মধ্য দিয়ে অস্তিত্ববাদী ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক নন্দন-জিজ্ঞাসার জন্ম হয় ঊনবিংশ শতাব্দী থেকেই যা আধুনিক নন্দনতত্ত্বকে অংকুরায়িত করে চলে। এর পূর্বেই দেকার্ত (১৫৯৬-১৬৫০) তাঁর তত্ত্বে চৈতন্যশীল ব্যক্তিসত্তার ধারণা দিয়েছিলেন। আবার, ব্যক্তিকেন্দ্রিক দর্শনের সাথে সে সময় মার্কসবাদী সমাজতান্ত্রিক দর্শনের সমন্বয় সাধনের ঘটনাও দুর্লক্ষ নয়। চল্লিশের দশকে অস্তিত্ববাদী দর্শনের জনক জাঁ পল সার্তের ভাবনায় ব্যক্তির অস্তিত্বের সাথে সামাজিক বাস্তবতা ও ঐতিহাসিক বাস্তববাদের একটি সমন্বয় লক্ষ করা যায়। সার্তে তখন মার্কসীয় দ্বান্দ্বিক বাস্তবতাকে স্বীকার করে নিয়েই ব্যক্তির মুক্তির তাগিদ অনুভব করেছিলেন (তন্ময়, ১৯৬৩: ১০১)। চার্লস ডারউইনের (১৮০৯-১৮৮২) উদ্বর্তন তত্ত্ব এবং ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষণ তত্ত্ব ব্যক্তির সামাজিক ও অন্তর্মানসে বিজ্ঞানভিত্তিক জিজ্ঞাসার জন্ম দেয়। যন্ত্রনির্ভর পুঁজিবাদী সমাজে ব্যক্তিগত বিচ্ছিন্নতা আধুনিক কবিতার নতুন জগত নির্মাণ করে, যা

Dhaka University Institutional Repository

মার্কসীয় কবিতার জীবনমুখী, বস্তুনির্ভর, সমাজচেতন ও সমাজ পরিবর্তনের অঙ্গীকার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আত্মকেন্দ্রিক, চেতনা-চংক্রমণকারী, নৈরাশ্যকরোজ্জ্বল, বিচ্ছিন্নতা-বিলাসী, কলাবৈচিত্র্যের অনুরাগী হয়। যদিও মার্কসিস্ট আধুনিক কবিদের কেউ কেউ সমাজবাস্তবতার ধারণাটি নানা নতুন আঙ্গিকে প্রকাশের দায়বদ্ধতা অনুভব করেছেন। ফেদেরিকো গার্সিয়া লোরকা (১৮৯৮-১৯৩৬), আঁদ্রে ব্রেতোঁ (১৮৯৬-১৯৬৬), লুই আরাগঁ (১৮৯৭-১৯৮২), পাবলো নেরুদা (১৯০৪-১৯৭৩), ডাব্লিউ. এইচ.অডেন (১৯০৭-১৯৭৩) প্রমুখ কবিরা আধার ও আধেয়র নানা দ্বন্দ্বের মধ্যেও মার্কসবাদী সমাজ-সংলগ্নতাকে তাঁদের সাহিত্যের অন্বিষ্ট করেছিলেন তবে, এঁদের প্রত্যেকেই আধুনিক কবিতার নতুন-নতুন নানা আঙ্গিকের প্রতিও সমান তন্নিষ্ঠ ছিলেন। এছাড়া লুকাচ (১৮৮৫-১৯৭১), থিওডর অ্যাডর্ন (১৯০৩-১৯৬৯), গ্রাম্‌সি (১৮৯১-১৯৩৭), জেমসন (১৯৩৪) প্রমুখ উত্তর-পর্যায়ের মার্কসবাদী নন্দনতাত্ত্বিকগণও যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে আধুনিক কাব্যের দুর্বোধ্যতা ও বহুত্ববাদী শিল্প-জিজ্ঞাসাকে অল্পাধিক আত্তীকৃত করেছেন তাঁদের তত্ত্বে (Eyestennisson & Liska, 2007: 115)। বিশ্বযুদ্ধ মধ্যবর্তী মার্কসবাদীদের সাথে তাঁদের চিন্তার পার্থক্য সূচিত হয় এখানেই।

প্রথম পর্যায়ের মার্কসীয় কবিতার জনযোগাযোগের বাস্তবতাটি ভেঙে দেন বিংশ শতাব্দীর আধুনিক কবিকূল। তাঁরা কবিতায় বৈচিত্র্য এবং দূরূহতাকে অন্বিষ্ট করেন। আধুনিক কবিতার নান্দনিকতা কোনো একটি বিশেষ ধরনের প্রবণতা বা সমধর্মী কোনো নন্দনতাত্ত্বিক দর্শন দ্বারা প্রভাবিত হয়নি। কবিতার একেকটি উপাদান—যেমন প্রতীক কিংবা চিত্রকল্পকে কেন্দ্র করে কিংবা পরাবাস্তবতার মত কোনো একটি নতুন প্রবণতাকে কেন্দ্র করে ভিন্ন-ভিন্ন নিরীক্ষাধর্মী কাব্যধারার জন্ম নেয়, যার মধ্য দিয়ে আধুনিক কবিরা তাঁদের কাব্যাদর্শ এবং ভাষাশৈলীর নতুনত্বকে প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট হন।

আধুনিকতাবাদ বিকাশের অব্যবহিত পূর্বে, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দুই দশকে ফ্রান্সে রোমান্টিক কবিতার একটি পরিণত ও নতুনতর ভাব-তরঙ্গ লক্ষ করা যায় বোদলেয়ার (১৮২১-১৮৬৭), মালার্মে (১৮৪২-১৮৯৯), ভালেরি (১৮৭১-১৯৪৫), র‍্যাঁবো (১৮৫৪-১৮৯১) প্রমুখ প্রতীকবাদী কবিদের কবিতায়। প্রতীকবাদী কবিরা দুর্মরভাবে রোমান্টিক হলেও তাঁরাই ছিলেন আধুনিক কবিতার অগ্রদূত। প্রতীকবাদী আন্দোলন আধুনিক কবিতায় এক নতুন ধারার জন্ম দেয়। ইতঃপূর্বে কবিতায় প্রতীকের ব্যবহার ছিল সীমাবদ্ধ—ভাষার অলঙ্করণের একটি ক্ষুদ্র উপকরণরূপে। প্রত্যক্ষ প্রকাশের পরিবর্তে অপ্রত্যক্ষ কোনো চিত্র বা শব্দের মাধ্যমে কবির আবেগকে সংকেতায়িত

Dhaka University Institutional Repository

করার নাম ছিল প্রতীকায়ন। কবির বিমূর্ত ভাবকে মূর্ত করে তোলা কিংবা অসীমকে সীমার মাঝে রূপ দানের অবলম্বন ছিল প্রতীক। কিন্তু, আধুনিক প্রতীকবাদী কবিরা তাঁদের অন্তর্জগতকে শব্দের জাদুতে, প্রকৃতির রূপ-রস-গন্ধ-সুরে দৃশ্যমান ও শ্রুতিময় করে তোলেন এক বিস্তৃত প্রতীকায়ন কৌশলে। তাঁরা কবিতাকে ইন্দ্রিয়-সংবেদী করে তালেন 'synaesthesia'র প্রয়োগে—এক ইন্দ্রিয়কে উদ্দীপ্ত করে অন্য ইন্দ্রিয়ের সংবেদনাকে জাগিয়ে তোলেন কবিতায় (জাহাঙ্গীর, ১৯৮৮: ৮)। ফলে, তাঁদের কবিতায় প্রকৃতির রঙ পরিবর্তিত হত সুরে, সুর রূপান্তরিত হত রঙে আর রঙ বদলে যেত গন্ধে। বস্তুত বাস্তববাদের ধাতব কঠিন অত্যাচার থেকে বাঁচিয়ে নিয়ে কবিতায় তাঁরা আনলেন এক প্রগাঢ় প্রশান্তি। তাঁরা প্রকৃতির পানে ফিরলেন কিন্তু তা রোমান্টিক কবিদের মত নয়, বরং আধুনিক মানুষের চেতনার বিবিক্তিকে সঞ্চারিত করলেন প্রকৃতিতে—জাদু রহস্যে ভরা এক অন্তরীপীয় কুয়াশাচ্ছন্নতায় আবৃত করলেন কবিতাকে। সে কবিতার প্রত্যেক প্রতীকে অন্তরাত্মা দৃশ্যমান হয়ে উঠল। সবকিছু মিলে যে আত্মিক, প্রশান্ত, গূঢ় শব্দ-ভাষার চর্চায় তাঁরা প্রবৃত্ত হলেন, তাকে তাঁরা বললেন ধর্মের সমকক্ষ—'রিচ্যুয়ালে'র মত পবিত্র (Symons, 1919: 8-9)। যেমন, বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪) অনুদিত শার্ল বোদলেয়ারের 'প্রতিষঙ্গ' কবিতাটিতে রূপ-রস-গন্ধময় বিচিত্র চরিত্রের রহস্যময় প্রকৃতিকে প্রতীকান্বিত করা হয়েছে একটি মন্দিরের সূত্রে—

প্রকৃতি মন্দির এক; স্তম্ভরাজি, প্রাণের কম্পনে
মাঝে-মাঝে অস্পষ্ট প্রলাপে দেয় সংকেত ছড়িয়ে;
সেখানে মানুষ আসে প্রতীকের অরণ্য পেরিয়ে
যে-অরণ্য দেখে তাকে অনুক্ষণ অভ্যস্ত নয়নে।

বহু ভিন্ন প্রতিধ্বনি—দূরাগত, গভীর, অত্বর,
অবশেষে খুঁজে পায় অন্ধকার, গাঢ় সমতান,
সেই মতো বর্ণ গন্ধ পরস্পরে জানায় উত্তর।

কোনো-কোনো গন্ধ যেন অর্গানের নিঃস্বনে কোমল,
প্রেইরির সবুজে মাখা, শিশুর পরশে সুখময়;
অন্যেরা—বিজয়ী, খিন্ন, কলুষিত, ঐশ্বর্যে উচ্ছল,

এনে দেয় অসীমের আদিগন্ত বিরাট বিস্ময়—
অম্বর, কস্তুরী, ধূপ, পরিকীর্ণ গম্ভীর লোবান
গুঞ্জরে আনন্দময় আত্মার ইন্দ্রিয়ের গান।
(বুদ্ধদেব, ১৯৮১: ৩৯)

প্রকৃতপক্ষে, সিম্বলিক কবিতাগুলো একেকটি 'ইমপ্রেশনিস্ট' ছবির মত—শিল্পীর একটি ছোট্ট ভাব ক্যানভাসের উপর নানা রঙ, আলো ও 'টোন' এ ছড়িয়ে পড়ে অথবা সুরের মত গড়িয়ে পড়ে।

Dhaka University Institutional Repository

মালার্মে আর ভার্লেনের কবিতাগুলোও ছিল সুরময়—ভার্লেনের কবিতা ছিল পাখির গানের মত আর মালার্মের প্রতীকী কবিতাগুলো ছিল অর্কেস্ট্রার মত (Symons, 1919: 4)।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকেই প্রতীকবাদী আন্দোলনের মতই চিত্রকল্পবাদী কাব্যধারার জন্ম নেয় ইংল্যাণ্ডে। এজরা পাউণ্ড (১৮৮৫-১৯৭২), হিলডা ডুলিটল (১৮৮৬-১৯৬১), জন গোল্ড ফ্লেচার (১৮৮৬-১৯৫০), রিচার্ড অ্যালডিংটন (১৮৯২-১৯৬২), এফ. এস. ফ্লিন্ট (১৮৮৫-১৯৬০), এমি লাওয়েল (১৮৭৪-১৯২৫) প্রমুখ কবিরা *Des Imagistes* (1914) শিরোনামে তাঁদের চিত্রকল্প-নির্ভর নতুন কাব্যান্দোলনের মেনিফেস্টো প্রকাশ করেন, যেখানে সাধারণ ভাষার স্পষ্টতা ও মিতব্যয়িতা, বিষয়বস্তু নির্বাচনের স্বাধীনতা, অলংকরণের আতিশয্য পরিহার করা, নতুন স্বাধীন ছন্দ (verse libra) প্রয়োগ এবং কবিতার সংক্ষিপ্ততা ও সংহতি বজায় রাখার সংকল্প প্রকাশ পায় (Jones, 1972: 18-19)। চিত্রকল্পবাদী কাব্যধারা আধুনিক কবিতার নান্দনিকতাকে বহু বিভাযুক্ত করে তোলে। এইসব আধুনিক কবিতাগুলোতে চিত্রকল্পই কবিতার শরীর ও আত্মা হয়ে ওঠে। কোনো বিমূর্ততা নয়, আবেগের আতিশয্য নয়, শব্দ-ভাষার অলঙ্করণ নয়, বিশেষণ প্রয়োগ নয়, সহজ-সরল ভাষায় কেবল একটি চিত্রকল্পকে কেন্দ্র করে গ্রিক কবিতার মত ছোট্ট, সুরেলা কবিতা রচনা করতে চেয়েছিলেন আধুনিক ইমেজিস্ট কবিরা। রোমান্টিক কবিতার মত চিত্রকল্প সেখানে অলংকাররূপে প্রযুক্ত হয় না বরং সম্পূর্ণ কবিতাটিই হয়ে ওঠে একটি চিত্রকল্প। কবিতা ও চিত্রকল্প সমার্থক হয়ে ওঠে তাঁদের কবিতায়। চিত্রকল্পই এই কবিতার শব্দ-ভাষা। ভাষা-ছন্দগত পরিমিতি সত্ত্বেও প্রত্যেকটি কবিতা স্বতঃস্ফূর্ত আবেগের সরল বহিঃপ্রকাশ। কারণ, চিত্রকল্প কবির সংবেদনার বাহন হয় আবার সংবেদনাই প্রসব করে চিত্রকল্প। ফলে, পুরো কবিতায় শব্দের ঐক্য নয় বরং অর্থ বা ভাবের ঐক্য তৈরি হয় যা একান্ত জৈবিক—কবির একটি বিশেষ 'মুড্'কে প্রকাশ করতে সক্ষম (Jones, 1972: 32)। যেমন বাঙালি কবি সমর সেনের নিম্নোক্ত কবিতায় কবির কামনা একটি বিষাক্ত সাপের চিত্রকল্পে সম্পূর্ণ কবিতাটিতে গুটিয়ে থাকে—

বিষাক্ত সাপের মতো আমার রক্তে
তোমাকে পাবার বাসনা।
আর মাঝে-মাঝে আকাশে হলুদ রঙের অদ্ভুত চাঁদ ওঠে।
চঞ্চল বসন্ত কাঁপে গাছের পাতায়,
আর অন্ধকারে লাল কাঁকরের পথ
পড়ে থাকে অলস স্বপ্নের মতো।
সমস্ত দিন, আর সমস্ত রাত্রি ভরে—
তোমাকে পাবার বাসনা বিষাক্ত সাপের মতো।
(সমর, ২০০৬: ২৭)

Dhaka University Institutional Repository

উপমা-উৎপ্রেক্ষা নয়, বিশেষণ প্রয়োগ নয়, কেবল একটি চিত্রকল্পকে কেন্দ্র করে সহজ ভাষায় কবি তাঁর মুহূর্তের ভাবের সুরেলা প্রকাশ ঘটান।

ফ্রান্সের প্রতীকবাদী আন্দোলনের উত্তরাধিকার নিয়ে দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে ১৯২০ থেকে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত ইউরোপের শিল্পজগতে বিস্তৃত হয়ে ওঠে আধুনিক পরাবাস্তবতাবাদী আন্দোলন। তবে, প্রতীকী ও পরাবাস্তব কবিতার মধ্যে জন্মসূত্রে গভীর নৈকট্য থাকলেও দু'য়ের প্রকাশ ভিন্নরূপ। ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষণ তত্ত্ব ও স্বপ্ন-ব্যাখ্যা আধুনিক কবিদের পরম এক অবলম্বন হয়ে নতুন বিষয় ও আঙ্গিকে এক অন্তরাশ্রয়ী সাহিত্য-প্রবণতার জন্ম দেয়। পরাবাস্তববাদী কবিরা অবচেতনলোকে ডুব দিয়ে মনের সেই প্রান্তে পৌঁছতে চান, যেখানে জীবন-মৃত্যু, কল্পনা-বাস্তব, অতীত-ভবিষ্যত, উচ্চ-নীচ, প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য বিষয়সমূহ লীন হয়ে থাকে এক আশ্চর্য বৈপরীত্যে। চেতনাপ্রবাহরীতি, পরাবাস্তবতা এবং বিমূর্ততা নানা কাঠামোয় প্রবল জনপ্রিয়তা অর্জন করে—কবিতা ছাড়াও কথাসাহিত্য, চিত্রকলা, নাটক, চলচ্চিত্র সর্বক্ষেত্রে। চিত্রকলার সাথে কবিতার নিবিষ্ট সংযোগ গড়ে ওঠে। পিকাসো (১৮৮১-১৯৭৩), মাতিস (১৮৬৯-১৯৫৪) , সালভাদর দালির (১৯০৪-১৯৮৯) পরাবাস্তব চিত্রকর্মসমূহ প্রভাবিত করে পল এলুয়ার (১৮৯৫-১৯৮৫), লুই আরাগোঁর (১৮৯৭-১৯৮২) কবিতায়। বাংলা কবিতায় জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪), শামসুর রাহমান (১৯২৯-২০০৬), আব্দুল মান্নান সৈয়দসহ (১৯৪৩-২০১০) আরো অনেক কবির কবিতায় নানা মাত্রায় পরাবাস্তবতার প্রতিফলন ঘটে। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে দ্বন্দ্বিক বস্তুবাদী ধারার উপযোগিতাপূর্ণ মনোভাবের সমান্তরালে পরাবাস্তবতার মত গহীন, চেতনালীন শিল্পধারা তুমুল জনপ্রিয়তা নিয়ে সংক্রমিত হয়েছে স্বকীয়তার গৌরবে।

বস্তুত, পরাবাস্তবতা মানব-মনের স্বাধীন কল্পনাত্মক প্রক্রিয়ার এক স্বীকৃত শিল্পভূমি—যুক্তি ও পারম্পর্যকে অস্বীকার করে অবচেতনলোকের মুক্তি ঘটিয়ে বাস্তবাতীত সত্যকে উদ্ঘাটনের রহস্যময় শিল্পজিজ্ঞাসা। সেখানে বিচিত্র, উদ্ভট, ভুতুড়ে বিষয়, স্বপ্ন বা স্বপ্নসদৃশ অনুষঙ্গ শিল্পের বিষয় হয়। কারণ, পরাবাস্তবতা ফ্রয়েড কথিত সেই মনোপ্রদেশের অবমুক্তিতে আগ্রহী, যেখানে মানুষের সমস্ত অভীপ্সা-জুগুপ্সা-গূঢ়ৈষা দ্বান্দ্বিকসূত্রে সমন্বিত থাকে। পরাবাস্তবতার পুরোধা আদ্রেঁ ব্রেতোঁ'র (১৮৯৬-১৯৭৩) ভাষায়—

> Everything tends to make us believe that there exists a certain point of the mind at which life and death, the real and the imagined, past and

Dhaka University Institutional Repository

> the future, the communicable and incommunicable, high and low cease to be perceived as contradictions. (Breton, 1969: 123)

পরাবাস্তবতা কবিতার শব্দ-ভাষাকে করে তোলে অন্তর্স্বভাবী, বিমূর্ত ও স্বয়ংক্রিয়। কবির অবচেতনা নানা খাপছাড়া চিত্রকল্প, গূঢ় প্রতীক, ভষার উল্লম্ফন কিংবা চিত্রকলার নানা কলাকৌশল কবিতাকে গভীর ও জটিল করে তোলে। পরাবাস্তবতা চেতন-অবচেতনার সংযোগসূত্রে জীবনকে শিল্পিত ও শিল্পকে আরো জীবনধর্মী ও অন্তরাশ্রয়ী করে তোলে—জন্ম দেয় নতুন আধুনিক স্বতঃস্ফূর্ত কাব্য-ভাষা (automatic writing)।

প্রতীকবাদী, চিত্রকল্পবাদী, পরাবাস্তবতাবাদী এইসব আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে জন্ম নেয় আধুনিক কবিতা। আধুনিক কবিরা দুরূহতাকে বরণ করেন তাঁদের কবিতায়। রবার্ট গ্রেভ বলেন, 'কবি কবিতা লিখবেন কেবল কবিদের জন্য'। এজরা পাউণ্ড ঘোষণা করেন যে আধুনিক কবি ত্রিশ জনের বেশি পাঠক প্রত্যাশা করতে পারেন না (Spender, 1965: 6)। পাঠকের সাথে কবির এমনকি কবিতার সাথে দূরান্বয় সাধিত হয় কবির। আধুনিক কবিতায় বস্তুজগৎ, সমকালের সংঘটণ এবং নৈর্ব্যক্তিক পরিপার্শ্বকে কবি তাঁর অন্তর্জগতে ধারণ করে তাকে ব্যক্তিক করে তোলেন—''A world of external impersonal forces must be sacrificially reinvented as the poet's inner personal world, so that, for his readers, the impersonal modern world may be personalized in poetry" (Spender, 1965: 52) । বস্তুবিশ্ব কবির অন্তর্বিশ্বে প্রবেশ করে নৈর্ব্যক্তিক (impersonal) থেকে ব্যক্তিক (personal) হয়ে ওঠে কিন্তু রোমান্টিক কবিতার মত সে ব্যক্তিক অনুভূতি বিশ্বজনীন বা অতীন্দ্রিয়তাপ্রাপ্ত হয় না। কারণ, আধুনিক কবি কবিতা লেখেন ব্যক্তিক অনুভূতি থেকে আর আধুনিক পাঠক সে কবিতার আস্বাদন করেনও একক ব্যক্তিরূপে। ভোলতেয়রীয় 'I' বা 'আমি'র প্রভাবে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ কবিতার মর্মে ঢুকে অপ্রতিরোধ্য হয়ে যায় (Spender, 1965: 72)। টি.এস.এলিয়ট কবির ব্যক্তি-বিশ্ব এবং তাঁর নতুন সৃষ্টি-বিশ্বকে একটি বৈজ্ঞানিক রাসায়নিক বিক্রিয়ার উপমায় ব্যক্ত করেছেন নিম্নরূপে—

> The analogy was that of the catalyst. When the two gases previously mentioned are mixed in the presence of a filament of platinum, they form sulphurous acid. This combination takes place only if the platinum is present; nevertheless the newly formed acid contains no trace of platinum. It may partly or exclusively operate upon the experience of the man himself; but, the more perfect the artist, the more completely separate in him will be the man who suffers and the

Dhaka University Institutional Repository

> mind which creates; the more perfectly will the mind digest and transmute the passions which are its material (Eliot, 1932: 18) ।

অর্থাৎ, কার্বন ও সালফার-ডাই-অক্সাইডের বিক্রিয়ায় কখনোই সালফিউরাস এসিড হতো না যদি অনুঘটক প্লাটিনামের উপস্থিতি না থাকতো। কিন্তু বিক্রিয়ান্তে প্লাটিনামটি থাকে অক্ষত অপরিবর্তিত ও নিরপেক্ষ। এলিয়টের ভাষায় কবির মন এই প্লাটিনামের টুকরো। অনুঘটকের মতই একজন কবি তাঁর আবেগ অনুভূতিকে নিরপেক্ষ অবস্থানে রেখে শিল্প নির্মাণ করেন। এলিয়ট কাব্য-বিক্রিয়ায় কবির উপস্থিতিকে অনুঘটকের ক্রিয়া বলেছেন আর বাঙালি আধুনিক কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত তাকে পাত্র-পাত্রীর মিলনে ঘটকের ভূমিকারূপে ব্যাখ্যা করেছেন (সুধীন্দ্রনাথ, ১৯৯৫: ২০)। বস্তু, কল্পনা ও প্রকাশের মধ্যে সংযোগহীনতা এবং এই ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা আধুনিক কবিতার মূল নন্দনসূত্র। এলিয়ট শিল্পীর নিরাসক্তির উপর অধিক গুরুত্বারোপ এবং সমধিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন তাঁর স্বতোৎসারিত আবেগ ও অনুভবের উপরে। তিনি সেই নিরাসক্তি থেকেই তাঁর কবিতায় এঁকেছিলেন আলফ্রেড প্রুফ্রকের অন্তর্বাস্তবতা। সেই দূরান্বয় থেকেই বিশ্বযুদ্ধের বাস্তবতায় মানুষের সামূহিক নিঃসহায়তা প্রতীকান্বিত হয় পোড়ো জমির প্রতীকে, *The Waste Land* (১৯২০) কাব্যে। বাংলা সাহিত্যের আধুনিক কবির মুখেও সেই সেই অবৈকল্যের কথাই উচ্চারিত হয়। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের ভাষায়—''প্রথম দফায় দরকার অবৈকল্য, দ্বিতীয় দফায় দরকার অবৈকল্য, তৃতীয় দফায় দরকার অবৈকল্য। বিংশ শতাব্দীর মূল মন্ত্র অবৈকল্য আর অকপটতা'' (সুধীন্দ্রনাথ, ১৯৯৫: ১৮)। আধুনিকতায় বিজ্ঞানের অবদান অসামান্য কিন্তু আধুনিক কবি সে অর্থে ইতিহাস বা বিজ্ঞান-সচেতন নন, বরং বৃহদার্থে বিশ্বজগত, পরিপার্শ্ব এবং ব্যক্তির ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের প্রতিফল সম্পর্কেই বেশি আগ্রহী। আধুনিক কবির উদ্দিষ্ট ব্যক্তির বিপন্নতা—সমাজ-প্রগতি, শ্রেণী-বৈষম্য কিংবা বিশ্বযুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি নয়। আধুনিক কবি শুধু অনুভব করেন ' বড় বড় নগরীর বুক ভরা ব্যথা' কিংবা 'পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ'। সমাজ-প্রতিবেশের ভেতর থেকেও কবির এই নৈর্ব্যক্তিক অবস্থানই আধুনিক কবিতায় বিষয় অপেক্ষা আঙ্গিককে প্রধান করে তোলে। ঐতিহ্যের সাথে সম্পর্ক আধুনিক কবিতার একটি বিশেষ প্রবণতা। তবে, ঐতিহ্যের একান্ত পরিগ্রহণ বা পুনরাবৃত্তি নয়, বরং ঐতিহ্যের অনুবৃত্তিকে নতুন উদ্ভবনায় আধুনিক সংকল্পে সঞ্জীবিত করাই ছিল আধুনিক কবিদের উদ্দেশ্য। মিথ এবং ঐতিহ্যকে নানা প্রতীক-রূপক-প্রতিরূপকে আধুনিক জীবনের সাথে অন্বিত করে নতুন ধরনের এক নান্দনিকতা প্রতিষ্ঠা করেন, এলিয়ট, ইয়েটস এবং সেই ধারায় বাঙালি আধুনিক কবি বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪) , বিষ্ণু দে (১৯০৯-১৯৮২) প্রমুখ। সেই সূত্রে আধুনিক কবিতায় নতুন আঙ্গিক ও বৈশিষ্ট্যের আমদানীও হয়। উত্তরাধুনিককালে ভাষা-প্রাধান্যের যুগে আধুনিক কবিদের মিথের

Dhaka University Institutional Repository

বিনির্মাণের ব্যাখ্যাটি সরলীকৃত হয় কারণ, চিহ্ন-চিহ্নায়ক-চিহ্নায়িতের সম্পর্কে মিথকে তাঁরা এক ধরনের বাচনরীতি ছাড়া আর কিছুই ভাবেননি (Barthes, 1977: 148)। নৈর্ব্যক্তিকতা থেকে ব্যক্তিকতা, জনসংশ্লিষ্টতা থেকে অন্তরাশ্রয়িতা ছিল আধুনিক কবিতার অন্যতম নান্দনিক লক্ষণ।

আধুনিক কবি প্রবলভাবে শব্দ-সচেতন। তাঁরা বাক্-রীতি ও কাব্য-রীতির সংমিশ্রণ, প্রচলিত কাব্যিক শব্দ বর্জন, মিতব্যয়ী শব্দ-প্রয়োগ এবং আভিধানিক কিংবা বিশেষণযোগে নতুন শব্দের প্রয়োগ ঘটান যা কখনো-কখনো দুর্বোধ্যতার অভিযোগ কুড়িয়েছে। ফলে, আধুনিক কবিতার আঙ্গিক প্রায়শই ভাস্কর্যধর্মী—প্রতীকবাদী কবিতা থেকে এমনকি আধুনিক চিত্রকল্পবাদী কবিতা, যেখানে গোটা কবিতাই হয়ে ওঠে একটি অনুপুঙ্খ চিত্রকল্প—সবক্ষেত্রেই কবিদের কাঠামো পরিকল্পনায় স্থাপত্যধর্মী মানসিকতা ছিল। আবার ভাষাকে প্রবহমান করে তোলার জন্য আধুনিক কবিরা মুক্তক, প্রবহমান অক্ষরবৃত্ত, গদ্য ছন্দ কিংবা গদ্য-পদ্যের সংমিশ্রণে স্বয়ংবহ ছন্দে (free verse) কবিতা রচনা করে কবিতায় একটি নতুন সুর সৃষ্টির অভিলাষীও ছিলেন।

আধুনিকতাবাদের সমকালেই অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর বিশের দশকে রাশিয়ায় প্রকট হয় কাঠামোবাদী সাহিত্য আন্দোলন, যা নান্দনিক বিশ্লেষণের আদর্শ বদলে দেয়। আঙ্গিকবাদীরা কবিতার আধেয়কে এড়িয়ে গিয়ে আধারকেই সর্বস্ব গণ্য করেন। তাঁদের মতে, আধার আধেয়র প্রকাশক নয়, বরং আধেয় ফর্ম বা কাঠামোর একটি অংশ মাত্র—একটি প্রেষণা বা একটি উপলক্ষ মাত্র। কাঠামোবাদীদের অব্যবহিত পূর্বে অবভাসবাদীদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল ঠিক বিপরীত। অবভাসবাদীরা বস্তুকে (object) গভীর আস্থা, নির্ভরতা ও মানসিক সংগঠন দ্বারা চেতনায় ধারণ করা এবং তার বিশ্বজনীন সত্তাকে চিন্তা করার উদ্দেশ্যে তাঁদের তত্ত্বের নামকরণ করেন অতীন্দ্রিয় অবভাসবাদ বা transcendental phenomenology (White, 1964: 104)। এমনকি কবির প্রত্যক্ষণজনিত যে চেতনা, অভিজ্ঞতা, তাঁর দেশ-কালের বহিঃপ্রকাশ 'টেক্সটে' যেভাবে প্রতিফলিত হয় অবভাসবাদীরা কাব্য-বিশ্লেষণে তারই অনুসারী। অর্থাৎ, 'অবভাসবাদ' হলো কোনো 'টেক্সটে'র নিষ্ক্রিয় পরিগ্রহণ মাত্র, এর মানস-সারাৎসারের বিশুদ্ধ লিপ্যন্তর মাত্র' (ঈগলটন, ২০০৪: ৬৫)। অবভাসবাদীরা ''প্রকৃত বস্তু (object)কে 'ব্র্যাকেটবন্দী' করেছিলেন সেটিকে জানার কাজে ব্যাপৃত হবার জন্য'' আর বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের কাঠামোবাদীরা ''বস্তুকে 'ব্র্যাকেটবন্দী' রেখে ঝুঁকে পড়লেন কীভাবে ঐ বস্তুকে প্রত্যক্ষণ করা হয়েছে তার উপর'' (ঈগলটন, ২০০৪: ৬৪)। এর আগে ফার্দিনান্দ দ্য সস্যুর (১৮৫৭-১৯১৩) signifier (ধ্বনি এবং শব্দ-ভাষা) এবং signified (অর্থ বা

Dhaka University Institutional Repository

ভাব) এর মধ্যে ঐক্য সম্পর্কে আস্থাবান ছিলেন। আঙ্গিকবাদী বিশ্লেষণের সময় থেকে কবিতার লক্ষ্য এবং তার নান্দনিক ব্যাখ্যার উদ্দিষ্ট হয় আঙ্গিক, বিশেষত ভাষা। কবিতার সংজ্ঞা নির্ভর করে কীভাবে পাঠক তাকে পাঠ করতে চায় তার উপর, লিখিত বস্তুটির প্রকৃতির উপর নয়। ফলে, কাঠামোবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে কালে-কালে কবিতার নান্দনিক মূল্যায়ন ভীষণ পরিবর্তনশীল হয়ে ওঠার মত। এই রীতিতে বৈষ্ণব পদাবলীকে পাঠক এক শতাব্দীতে ধর্মগান বলে মনে করতে পারেন, পরের শতাব্দীতে দর্শনরূপে, তার পরের শতাব্দীকে গীতিকবিতারূপে গন্য করতে পারে। ফলে, কবিতার স্থির কোনো সত্তা আর থাকে না কাঠামোবাদীদের বিচারে। ফলে, এ যাবৎকাল কবিতার যত রহস্য, মন্ময়তা, কবির মানস-জগতের নানা প্রবর্তনার ঠিকানা-রহস্য সবকিছু অমূলক হয়ে পড়ে। বিনির্মাণের আলোকে কবিতার প্রাণময় নির্বিশেষ সত্তাকে খণ্ড-খণ্ড প্রত্যয়ে শ্রেণীকরণ ও বিশ্লেষণের এক নতুন নান্দনিক বীক্ষার জন্ম হয় বিংশ শতাব্দীর সংক্রান্তি বেলায়। হাইডেগারের (১৮৮৯-১৯৭৬) ভাষা-সংক্রান্ত তত্ত্বও বিষয় (object) এবং বিষয়ী'র (subject) মধ্যে ব্যবধান রচনা করে। গেয়র্গ গাদামারের (১৯০০-২০০২) *Truth and* Method-এ টেক্সটের সাথে লেখকের সম্পর্ক প্রশ্নবিদ্ধ হয়। তাঁর মতে, একটি সাহিত্য রচনার অর্থ লেখকের অভিপ্রায়ের মধ্যেই ফুরিয়ে যায় না। এক সাংস্কৃতিক ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত থেকে অন্য সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিতে যাওয়ার সাথে-সাথে সাহিত্যকর্মের নতুন-নতুন অর্থ তৈরি হয় এবং ভাষা বিশ্লেষণের প্রকৃতিই তার নির্ণায়ক (ঈগলটন, ২০০৪: ৭৬-৭৯)। ফলে, এই কাঠামোবাদী, উত্তর-কাঠামোবাদীদের নানা চিন্তনের ধারাবাহিকতায় জন্ম নেয় উত্তরাধুনিক কবিতার নান্দনিক রূপ ও বিশ্লেষণ পদ্ধতি।

বিংশ শতাব্দীর সত্তরের দশক থেকে মিশেল ফুকো (১৯২৬-১৯৮৪) পৃথিবীর ইতিহাস থেকে মানুষের অন্তর্ধান ঘোষনা করেন (Foucault, 1970: 387)। আশির দশকে জাক দেরিদা (১৯৩০-২০০৪), জিল দ্যেল্যুজ (১৯২৫-১৯৯৫) এবং গাতারির (১৯৩০-১৯৯২) মানুষ ও প্রকৃতির এমনকি মানুষ ও কীট-পতঙ্গ-ইট-পাথরের অভিন্ন অবস্থান ও মর্যদার ধারণা আধুনিকতাবিরোধী উত্তর-মানবিক (post-human) দৃষ্টিভঙ্গির জন্ম দেয় এবং মানুষের উপর ভাষার আধিপত্যকে প্রতিষ্ঠা করে (Deleuze & Guattri, 198: 4-5))। জাঁ ফ্রাসোয়া লিওতারের (১৯২৪-১৯৯৮) জ্ঞান বিষয়ক তত্ত্ব আধুনিকদের 'মহা-আখ্যান' বা 'মেটান্যারেটিভ'কে অস্বীকার করে 'লোকাল ন্যারেটিভকে' স্বীকৃতি জানায়, যার ফলে, মার্কস-ফ্রয়েড প্রমুখ তাত্ত্বিক-দার্শনিকদের তত্ত্বের একচ্ছত্র গ্রহণযোগ্যতা সীমাবদ্ধ হয়ে যায় বরং ছোট-ছোট তত্ত্বের আলোকে 'টেক্সট'কে পাঠকের ইচ্ছে অনুযায়ী পাঠ এবং ব্যাখ্যার নতুন নতুন দৃষ্টিভঙ্গির জন্ম হয় (Lyotard, 1984: 60)। উত্তরাধুনিক তাত্ত্বিকগণ মনে

Dhaka University Institutional Repository

করেন আধুনিক যুগে পাঠক ছিল সবচেয়ে উপেক্ষিত। পোস্টমডার্ন নন্দন-ভাবনায় আধুনিক যুগের কবিতার কবি ও পাঠকের দূরত্বের বিষয়টি প্রবলভাবে সমালোচিত হয়। নান্দনিকতার গজদন্তমিনারে কবির ব্যক্তিকেন্দ্রিক ভাবনার নান্দনিক প্রকাশের বিরোধিতা করেন তাঁরা কারণ, তাতে পাঠকের অধিকার ক্ষুন্ন হয়। রোলাঁ বার্থ (১৯৫০-১৯৮০) কবিতার ভবিতব্যের যে রূপরেখা দেন, তাতে কবিতার প্রতি কবির একচ্ছত্র অধিকার বাতিল হয়ে যায়। লেখকের মৃত্যু ও পাঠকের জন্মের এই ঘোষণার মধ্য দিয়ে 'টেক্সটে'র সাথে কবির সকল সম্পর্ক ঘুচে যায় এবং 'যত পাঠক তত মত'—এই নন্দনতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা হয়—''we know that to give writing its future, it is necessary to overthrow the myth: The birth of the reader must be at the cost of the death of the Author " (Barthes, 1977, 148)। লেখক মৃত কারণ, বার্থের মতে, লেখক যা লেখেন তা ভাষা ছাড়া আর কিছুই না—''it is language which speaks, not the author" (Barthes, 1977, 143)। গোলকায়নের যুগে মানুষের চেতনা জগতে ব্যাপক পরিবর্তন সাধনের সাথে-সাথে নন্দনতত্ত্ব ও কাব্যের নান্দনিকতা উভয়েরই আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়। উত্তরাধুনিক কবিতা ভাষা ও ধারণার ক্ষেত্রে নির্ধারিত বা সুনির্দিষ্ট কোনো ফর্ম স্বীকার করে না। আধুনিক কবিতার সংহত বা বদ্ধ কাঠামোর বিপরীতে উত্তরাধুনিক কবিতা মুক্ত-আঙ্গিক ও বহুস্বরিক। উত্তরাধুনিক কবিতায় ফার্দিনান্দ দ্য সস্যুর কথিত কবিতার চিহ্নায়ক (signifier) ও চিহ্নায়িতের (signified) সম্পর্ক ঘুচে যায় অর্থাৎ বিষয় থেকে কবিতার ভাষা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় । ভাষিক গুরুত্বের কারণে কবিতার কাঠামো নানা ছোট-ছোট তত্ত্বে, দর্শনে ও দৃষ্টিভঙ্গিতে বহুবিকীর্ণ হয়ে ওঠে। জাক দেরিদার বিনির্মাণবাদ বা ডিকন্সট্রাকশন তত্ত্ব কবিতার ভাষাকে ভেঙে তার মধ্যে বিবিধ অর্থের অনুসন্ধান করতে শেখায়। উত্তরাধুনিক কালে জন্ম নেয় ভাষাকোবিদগণ (Language poet), যাঁরা মনে করেন কবিতার বিষয় ও দৃষ্টিভঙ্গি অপেক্ষা ভাষা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। তাঁরা শব্দ-ভাষার যথেচ্ছা খেলাকে কবিতার আদর্শ ভেবে 'ভাষা-কবিতা' (Language poetry) রচনায় উৎসাহী হন (Bob,1996: 16)। সুতরাং, সার্বিকভাবে পোস্টমডার্ন পর্বের কাব্যের নান্দনিক লক্ষণ হলো 'কলাকৈবল্যবাদ'।

বিভিন্ন কালে কবিতার নান্দনিকতার আদর্শ ও লক্ষ্য বিভিন্ন। প্রত্যেক কালের যুগ-মানসও কবিতার নান্দনিক বিবর্তনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বিভিন্ন যুগের কবিতার নান্দনিক বিশ্লেষণে কখনো স্বজ্ঞা-কল্পনা-ভাবের গুরুত্ব অধিক ছিল, কখনো প্রকাশের রূপটি ছিল জরুরি—কখনো উপযোগিতা মুখ্য ছিল, কখনো আনন্দবাদ, কখনো কলাকৈবল্যবাদ। মূলত ভাঙা-গড়া এবং বিনির্মাণই কবিতার আঙ্গিকের মূল স্বভাব। কবিতার 'স্টাইল' ঐতিহ্য ও বর্তমান, সমাজ-মানস ও সময়ের

Dhaka University Institutional Repository

প্রবণতাকে ধারণ করেই নতুনত্বের প্রতিষ্ঠায় উদ্বুদ্ধ থাকে। কবির অভিজ্ঞতা তাঁর নান্দনিক বোধের সাথে সমন্বয় সাধন পূর্বক একটি নতুন শৈলীতে আত্মপ্রকাশ করে। শিল্পিত প্রকাশ ব্যতীত সংবেদনা ও নান্দনিক বোধ অসার্থক হয়। তাই স্বজ্ঞা মাত্রেই শিল্প নয়; রূপের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। রূপ-নির্মাণ একটি স্বতঃস্ফূর্ত প্রক্রিয়া। রূপের আধার শব্দ-ভাষা। শব্দ-ভাষা পরিপূর্ণতা পায় তার নানা উপাদানে, প্রয়োগ-বৈচিত্র্যে, নানা প্রকৌশলে। রূপ বা প্রকাশই নান্দনিক অভিজ্ঞতার প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। রূপ বা শৈলী পাঠকের কাব্যাস্বাদনের প্রথম সোপান। রূপেরও রয়েছে ইতিহাস, ঐতিহ্য ও শিল্পতত্ত্ব। টি.এস.এলিয়ট, জীবনানন্দ দাশ উভয়েই স্বীকার করেন পুরনো কবিদের কাব্য-ঐতিহ্যের সাথে 'আধুনিক জগতের নব নব কাব্যবিকীরণে'র সংশ্লেষণ সূত্রই জন্ম নেয় নতুন কাব্যরূপ (জীবনানন্দ, ১৯৯৫: ১৯)। নান্দনিক বিশ্লেষণে শৈলীবিচার প্রধান কারণ, শৈলীর মধ্য দিয়েই কবিতার আত্মপ্রকাশ ঘটে। শৈলীই শিল্পীর স্বাক্ষর (signature)। কাব্যশৈলীর প্রধান অবলম্বন তার শব্দ-ভাষা। শব্দের সাথে শব্দ জুড়ে কবিতায় তৈরি হয় ধ্বনি, চিত্র, প্রতিমা। শব্দ-ভাষার আশ্রয়েই ভাষার অতিরিক্ত কোনো ব্যঞ্জনা কিংবা নতুন কালের কোনো অভিপ্রায় ব্যক্ত হয়। কবিকে হতে হয় সচেতন ও শব্দ-কুশলী। কবিকে ভাব প্রকাশের উপযোগী করে তাঁর শব্দ-ভাষাকে নির্মাণ করে নিতে হয়, যেন তা পূর্বজ কবিদের কবিতায় ব্যবহৃত শব্দ-ভাষাকে অতিক্রম করে যায় কবি সবসময় তাঁর কবিতার এমন ভাষা-মাধ্যম নির্মাণ করতে চান, যা তাঁর সময়ের মানুষের মুখের ভাষাকে প্রতিনিধিত্ব করে। কারণ, কাব্য-ভাষাই কবির সাথে পাঠকের সংযোগ-সাধক। যেহেতু মুখের ভাষা প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল, ফলে, কাব্য-ভাষাও রূপারিত হয় যুগে-যুগে। মুখের ভাষা থেকে কাব্য-ভাষার যতই দূরত্ব থাক কিংবা কবি যতই তাঁর কাব্য-ভাষাকে দুরূহ করে তোলেন—হোমার থেকে শুরু করে ওয়ার্ডসওয়ার্থ, রবীন্দ্রনাথ, এলিয়ট, জন অ্যাশবেরি (১৯২৭) প্রত্যেকের কাব্যভাষার অভিপ্রায়ই সমকালের মৌখিক ভাষার স্বাক্ষর চিহ্নিত। এভাবেই কালে-কালে কবিতায় কাব্য-ভাষা পুনর্জীবিত হয়।

অলংকার ভাষার প্রাণস্বরূপ—এই কথাটিও আপেক্ষিক। ভারতীয় অলংকারিকরা যে প্রয়োজনে বলেছিলেন 'কাব্যং গ্রাহ্যমং অলংকারা', সে প্রয়োজন অনেক আগেই ফুরিয়েছে। ধ্বনিপ্রধান অলংকারের যুগ শেষে ভাবপ্রধান অলংকারের উৎকর্ষ ছিল রোমান্টিক ও আধুনিক যুগে। আধুনিক কবির আপ্তবাক্য হয় 'উপমাই কবিতা'। প্রতীক, চিত্রকল্প, পরাবাস্তবতাবাদী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে মূলত আধুনিক কবিতায় রূপ ও কলাকৌশল অভিন্ন হয়ে ওঠে। আবার, উত্তরাধুনিক কালে অলংকার, মিথ সবই সরল ভাষার অংশে পরিণত হয়। অলংকার তখন ভাষা বৈ কিছু নয়। তারা সবাই

Dhaka University Institutional Repository

'চিহ্নায়কে'র অনুসারী। আধুনিক-উত্তরাধুনিক কালে কাব্যে অলংকরণের উৎসাহ যতই নিশ্চিহ্ন হবার উপক্রম হোক, চিত্রকল্প-প্রতীক-রূপক, ধ্বনি-অনুপ্রাস প্রভৃতির অপরিহার্যতা কবিতায় কখনো ফুরায় না। কারণ, ওই উপকরণগুলোর জন্যই কাব্য ভাবরূপ পায়—কবিতা তার নিজমূর্তি পরিগ্রহণ করে, যদিও কালে-কালে প্রসাধনের রূপ বদলায়—আড়ম্বর বাড়ে-কমে। সময়ের প্রয়োজনে পাল্টায় শব্দ-ভাষার অলংকার-রীতি ও তার মাত্রাচেতনা—বিবর্তিত হয় কবিতার স্তবক ও পঙ্‌ক্তি-বিন্যাস। একইভাবে, মৃত ছন্দকে পুনর্জীবিত করতে কালান্তরের কবিতায় জন্ম নেয় নতুন ছন্দ—সমপার্বিক থেকে হয় অসমপার্বিক, সমিল থেকে হয় অমিল, প্রবহমান, মুক্তক। গদ্য-পদ্যের মিশ্রণে স্বাধীন ছন্দের আশ্রয় থেকে কবিতা স্বচ্ছন্দ হয় গদ্যছন্দে।

কবিতার নান্দনিকতা একটি রহস্যময়, স্বতঃস্ফূর্ত প্রক্রিয়া। কেউ-কেউ সে রহস্যকে ঐশ্বরিক বা অলৌকিকও বলে থাকেন। কখনো কবির মনে একটি শব্দ কিংবা একটি খণ্ড-বাক্যের স্ফূরণ ক্রমে স্ফূটতর হতে-হতে কবিতার একটি চিত্রকল্প বা ভাবের জন্ম দেয়, কখনোবা একটি 'রিদম' বা ছন্দদোলা কোনো কবিতার জননসূত্র হতে পারে। কবি হতে পারেন বিপ্লবী অথবা নির্জনতাপ্রিয়। তাঁর কবিতার প্রবর্তনা হতে পারে সমকাল অথবা স্মৃতি—সে স্মৃতিও হতে পারে কবির বর্তমান থেকে বহু দূরবর্তী। সে সৃজন-প্রক্রিয়ায় কবি স্বয়ং সব সময় তাঁর অধীন থাকতে নাও পারেন। ফলে, কবির নান্দনিক অভিজ্ঞতার সংজ্ঞায়নও আপেক্ষিক। আবার কালে-কালে নান্দনিক অভিজ্ঞতার রূপরেখা কল্পনা করা হলেও প্রত্যেক কবির ক্ষেত্রে তাঁর কবিতার রূপ বা প্রকাশও অত্যাবশ্যকীয়রূপে ভিন্ন। তাই, কবিতার নান্দনিকতার কোনো স্বতঃসিদ্ধ বা চিরকালীন রূপ নেই। তবে, কবির সৃজনশীল চেতনা বস্তুজগতের নানা অভিজ্ঞতার সাক্ষী হয়ে, অগ্রজ কবিদের দ্বারা প্রাণিত হয়ে, সাম্প্রতিক কবিতার নানা কাব্য-লক্ষণকে আত্মীকৃত করে ও সমকালীন যুগ-মানসের সাথে সংশ্লিষ্ট থেকে ক্রমাগত গভীর সাধনা ও স্বাতিক্রমণের মধ্য দিয়ে তাঁর স্বজ্ঞা, অহংয়ের স্বাক্ষরকে মুদ্রিত করে দেন তাঁর কবিতার শব্দ-ভাষা-ছন্দে। কবিকে হতে হয় কাল-সচেতন, শব্দ-কুশলী ও প্রতিনিয়ত রূপভিসারী। কবি ব্যক্তিক বা নৈর্ব্যক্তিক হন, চেতনাচালিত বা অবচেতনবিহারী হন, প্রতিফলনপ্রিয় হন আর কলকৈবল্যবাদী হন—কবিতাকে কবিতা হওয়া বাঞ্ছণীয়। বাংলা কবিতায় আধুনিক ও উত্তরাধুনিক কবিদের মধ্যবর্তী সময়ের কবি শামসুর রাহমানের (১৯২৯-২০০৬) নান্দনিক অভিজ্ঞতার কাব্যিক প্রকাশ পায় তাঁর আত্মকথন ও কাব্য-সংক্রান্ত নানা কবিতায়—যেমন, 'কাব্যতত্ত্ব' শিরোনামের কবিতার নিম্নোক্ত পঙ্‌ক্তিমালা—

Dhaka University Institutional Repository

গনগনে চুল্লির আলোয় খইয়ের মতো কথা ফোটে
অন্তর্লোকে, রাশি রাশি। আর আমি
তাদের ছড়িয়ে দিই ঢেউয়ের ফেনায়, সপ্তর্ষিমণ্ডলে,
পাহাড়ের চূড়ায়, উইয়ের ঢিবিতে, যেখানে খুশি।
গাছের সতেজ পাতায়, রৌদ্র-লাগা, বৃষ্টি-মোছা দেয়ালে,
ঘরের উন্মুক্ত কপাটে, রুটির বাদামী গড়নে,
শুকনো ফলে, অলিন্দে চড়ুইয়ের বুকে গাঁথা সেসব কথা
নক্ষত্রের অভিযাত্রার মতো বিন্দুতে বিন্দুতে
কম্পমান, মুহূর্তের অধীশ্বর। সেই মুহূর্তে
মাতাল ছাড়া কী-বা আর হতে পারি আমি ?

রাত্রির পীড়নে উন্মথিত আমি নক্ষত্রের ঝড়ের মতো
শব্দপুঞ্জ থেকে ছিঁড়ে আনি কবিতার অবিশ্বাস্য শরীর
—সৌন্দর্যের মতো রহস্য-ঢাকা, নগ্ন আর উন্মীলিত।
(শামসুর, ২০০৪: ৬৫)

প্রকৃতপক্ষে, শামসুর রাহমানের কাব্যতত্ত্ব বিভিন্ন পর্বে বৈচিত্র্যময়। শামসুর রাহমান বাংলাদেশের পঞ্চাশের দশকের কবি—যদিও কবিতাকে 'চারিদিকে চক দিয়ে এঁকে' দশক-বন্দী করার বিপক্ষে তিনি এবং কবিতাকে আকাশের মত নিঃসীম ও বর্ণবিভাযুক্ত বলেই মনে করেন (শামসুর, ২০০৭: ২২৪)। অনেকাংশে ত্রিশোত্তর বাঙালি আধুনিক কবিদের উত্তরসূরী বলা যায় তাঁকে। আধুনিক কবিদের মতই প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের অগ্রজ কবিদের কাব্যে অনুপ্রাণিত, মিথ-প্রতীক-রূপক-চিত্রকল্পের প্রয়োগে শব্দের সচেতন স্থপতি, প্রকরণে বৈচিত্র্যাভিলাষী, ছন্দ-প্রয়োগে প্রাত্যহিক। কোনো-কোনো ক্ষেত্রে স্বকীয়তায় অতিক্রম করে গেছেন অগ্রজ আধুনিক কবিদের।

নাগরিক কবি শামসুর রাহমান দেশ-কাল-বিশ্ব নির্দেশিত পথে চলতে গিয়ে কখনো তাঁর ব্যক্তিক, অন্তর্চারী বিবিক্ততার বহিরাশ্রয় সন্ধান করেছেন অভিনব মিথ-প্রতীক-প্রতিরূপকে, কখনো অন্তর্বাস্তবতা-স্মৃতি-স্বপ্ন-অবচেতনের অন্তর্বয়নে কাব্যের পরাবাস্তব পৃথিবী গড়েছেন, কখনো অন্যায়ের প্রতিবাদ অনিবার্য জেনে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-আয়রনিতে ভাষাকে তীর্যকতর করেছেন—শ্লোগানকে শিল্পিত করেছেন। কবিতার শব্দ-ভাষা ও ছন্দকে তিনি তাঁর কাল ও প্রতিবেশের কণ্ঠস্বরের সাথে এমন নিখুঁতভাবে সমস্বরিক করে তোলেন, যে তা তাঁর নিজত্বকেও অতিক্রম করে যায়। শামসুর রাহমানের কবিতার নান্দনিকতায় তাঁর মনন, শ্রম ও শিল্পী-সত্তার সাক্ষর তীব্র। শামসুর রাহমান বহুপ্রজ অথচ পরিশীলনপ্রিয়, নান্দনিক বৈচিত্র্যে আস্থাবান অথচ স্বকীয়তায় ক্ষমাহীন—'শব্দে শহীদ' এক নিঃসঙ্গ কবি-পুরুষ।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি:

অতুলচন্দ্র গুপ্ত (২০০২) *কাব্যজিজ্ঞাসা*, বর্ণ বিচিত্রা, ঢাকা

ঈগলটন, টেরি (২০০৪) *টেরি ঈগলটন: সাহিত্যতত্ত্ব* [অনুবাদ. খোন্দকার আশরাফ হোসেন] নিউ এজ পাবলিকেশন, ঢাকা

জাহাঙ্গীর তারেক (১৯৮৮) *প্রতীকবাদী সাহিত্য*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

তন্ময় দত্ত [সম্পা] (১৯৬৩) *প্রসঙ্গ : জাঁ পোল সার্ত্র*, বিদ্যুৎসাহী প্রকাশ, কলকাতা

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (১৩৫৩) *আধুনিক য়ুরোপীয় দর্শন*, বিশ্বভারতী, কলকাতা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৮০) *রবীন্দ্র-রচনাবলী* (ত্রয়োবিংশ খণ্ড), বিশ্বভারতী, কলকাতা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯৭৪) *রবীন্দ্র-রচনাবলী* (সপ্তবিংশ খণ্ড), বিশ্বভারতী, কলকাতা

বুদ্ধদেব বসু (১৯৮১) *বোদলেয়ার : তাঁর কবিতা*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

শামসুর রাহমান (২০০৪) *শামসুর রাহমান রচনাবলী-১*, ঐতিহ্য, ঢাকা

শামসুর রাহমান (২০০৭) *কালের ধুলোয় লেখা*, অন্যপ্রকাশ, ঢাকা

সমর সেন (২০০৬) *কয়েকটি কবিতা*, [সব্যসাচী দেব সম্পা.] অনুষ্টুপ, কলকাতা

সাঈদ-উর-রহমান (১৯৮৫) [সংকলন ও অনুবাদ] *মার্কস ও মার্কসবাদীদের সাহিত্যচিন্তা*, একাডেমিক পাবলিশার্স, ঢাকা

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯৯৫) *সুধীন্দ্রনাথ দত্তের প্রবন্ধসংগ্রহ*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

Doglas Ainslie [trans.] (1965) *Benedetto Croce, Aesthetic: As Science of Expression and General Linguistic*, The Noonday Press, U.S.A.

Breton Andre (1969), *Menifestoes of Surrealism*, translated by Richard Seaver and Helen R. Lane, University of Michigan Press, U.S.A

Eysteinsson Astradur & Liska Vivian [ed.] (2007) *Modernism vol.1*, John Benjamins publishing co., U.S.A.

Beiser Frederick (2009) *Diotima's Children*, Oxford University Press, London

Bob Perelman (1996) *The Marginalization of Poetry: Language Writing and Literary History*, Prinston University Press, U.K.

Bosanquet Bernard, [trans.] (1886) *The Introduction to Hegel's Philsophy of Fine Art*, kegan poul Trench & co, London

Bosanquet Bernard (1919) *Croce's Aesthetic*, The British Academy, London

Dr. S. Sen & others (1994) *Preface to the Lyrical Ballads*, Unique Publishers, New Delhi

Eagleton Terry (2007) *How to Read a Poem*, Blackwell Publishing, U.S.A

Eliot T. S. (1932) *Selected Essays*, Faber and Faber Limited, London

Gilles Deleuze and Felix Guattari (1983) *Anti-Oedipus*, [trans. Robert Hurley, Mark Seem, and Helen R. Lane] University of Minnesota Press, U.S.A

Jones Peter (1972) *Imagist Poetry*, Penguin Books Ltd., U.S.A

Dhaka University Institutional Repository

Khadye K. M. (1922) *Benedetto Croce's Aesthetic Applied to Literary Criticism*, The Aryabhushan Press, India

Lyotard, Jean-Francois (1984) *The Postmodern Condition: A Report on Knowledge*, [trans. Geoff Bennington and Brian Massumi], Manchester University Press, U.K

Foucault Michel (1970), *The Order of Things : An Archaeology of the Human Sciences*, Routledge, London

Roland Barthes (1991) *Image Music Text*, [trans. Stephen Heath] Fontana Press, London

Ronald Barthes (1991) *Mythologies*, [trans. Annette Lavers] The Noonday Press, New York

Spender Stephen (1965) *The Struggle of The Modern*, Methuen & Co Ltd, London

Shelly Persy Bysshe (1904) *A Defence of Poetry*, The Bobbs-Merrill Company, IndianPolis

Symons Aurthur (1919) *Symbolist Movement in Literature*, E.P. Dutton & Co., New York

White Morton (1964) *The Age of Analysis: 20th Century Philosophers*, The New American Library, U.S.A.

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায় : প্রথম পরিচ্ছেদ
মিথ-প্রতীক-চিত্রকল্প-রূপক-প্রতিরূপক : চেতনার অন্তর্বয়ন

আত্মময় বিষাদচেতনা থেকে জনচৈতন্যের সাথে অভিযোজন এবং উৎস থেকে শুরু করে নিজস্ব নান্দনিক প্রত্যয় অর্জনের উন্মেষ-পর্বরূপে শামসুর রাহমানের (১৯২৯-২০০৬) প্রথম পর্যায়ের কাব্যগুলো বৈচিত্র্যময়, নিরীক্ষাধর্মী ও রূপান্তরশীল। *প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে* (১৯৬০), *রৌদ্র করোটিতে* (১৯৬৩), *বিধ্বস্ত নীলিমা* (১৯৬৭) এবং *নিরালোকে দিব্যরথে* (১৯৬৮) কাব্যসমূহে কবি তাঁর আত্মভুক রোমান্টিক চৈতন্য কিংবা নাগরিক জীবনের বিচিত্র প্রত্যক্ষণ, অভিজ্ঞতা ও অভিজ্ঞানকে প্রতিস্থাপিত করেন মিথ-প্রতীক-চিত্রকল্প-রূপক-প্রতিরূপকের নানা নান্দনিক বৈচিত্র্যে। *প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে* কাব্যে কবি প্রধানত মিথ ও প্রতীকে ব্যক্ত করেন তাঁর আত্মগত বিবরবাসী চৈতন্যকে। *রৌদ্র করোটিতে*'তে বস্তুজাগতিক অভিজ্ঞতার প্রখর সূর্যালোকস্নাত কবি পরিপার্শ্বের টুকরো-টুকরো দৃশ্য ও জীবনের বিচিত্র কোলাজকে নানা বহিরাশ্রয়ে ছড়িয়ে দিয়ে হয়ে ওঠেন নৈর্ব্যক্তিক ও আত্মপ্রকাশে নিঃসংকোচ। *বিধ্বস্ত নীলিমায়* কবি রূপক-প্রতীক-চিত্রকল্পে এবং ভাষার ব্যঙ্গ ও আয়রনিতে নতুন শিল্প-প্রতীতি নিয়ে শিল্পের 'বাগান' গড়ার সংকল্প প্রকাশ করেন। *নিরালোকে দিব্যরথে* কাব্যে সমন্বিত হয় পূর্বের তিনটি কাব্যে কবির অর্জিত দার্শনিক প্রজ্ঞা ও নান্দনিক অভিজ্ঞতা। ব্যক্তিগত বিপন্নতা থেকে বস্তুজগতের সাথে একাত্মতা এবং পরের পর্বে বৃহত্তর দৈশিক চেতনায় যাত্রার পূর্বসূত্ররূপে এই পর্যায়ের কাব্যে কবির চৈতন্যের রূপান্তর ও কাব্যের আঙ্গিকগত বিবর্তন সমান্তর ও পরিপূরক। বস্তুত, এই রূপান্তরের মধ্য দিয়ে প্রথম পর্বেই শামসুর রাহমানের কাব্য নিজত্বে উত্তীর্ণ হয়—আবিষ্কার করে নেয় জগৎ ও জীবনের সাথে শব্দ-ভাষা ও ছন্দের যোগাযোগ। সেই সূত্রে, ষাটের দশকে বাংলা কবিতায় সংযোজিত হয় রাহমানীয় কাব্যরীতি। শামসুর রাহমানের কাব্যের উন্মেষ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার এই পর্বটিতে তাঁর কাব্যের নান্দনিক অনুশীলন ও প্রকাশবৈচিত্র্যের স্বরূপ এই পরিচ্ছেদের উপজীব্য।

বাংলা কবিতায় শামসুর রাহমানের আবির্ভাব 'ল্যাজারসে'র পুনর্জীবনপ্রাপ্তির যন্ত্রণাময় অভিজ্ঞতার সাথে অবিচ্ছেদ্য—

> মনে হয় আমি যেন সেই লোকশ্রুত ল্যাজারস
> তিন দিন ছিলাম কবরে, মৃত-পুনরুজ্জীবনের
> মায়াস্পর্শে আবার এসেছি ফিরে পৃথিবীর রোদে
> ('প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে', *প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে*)

প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে কাব্যে কবির জীবন্মৃত চেতনার বিষাদিত বহিরাশ্রয়রূপে 'ল্যাজারসে'র মিথটি এতই শক্তিশালী যে, কেবল প্রথম কবিতায় তার উল্লেখ থাকলেও অলিখিতভাবে সম্পূর্ণ কাব্যের অদ্বিতীয় মিথ-প্রতিরূপকরূপে প্রতীয়মান করা যায় তাকে। শামসুর রাহমান তাঁর আগন্তুক চেতনার সংস্থাপনে গ্রহণ করেছেন *বাইবেল* এর 'ল্যাজারসে'র মিথ। কিন্তু, পুরাণে 'ল্যাজারসে'র পুনর্জীবনপ্রাপ্তির কাহিনী অলৌকিক ও খ্রিস্টীয় মাহাত্ম্য প্রকাশক। পুরাণের এই অলৌকিকতা শামসুর রাহমানের উদ্দিষ্ট নয়, বরং পুনরুজ্জীবনের পর পুরনো পৃথিবীতে প্রত্যাগত ল্যাজারসের যে নতুন যন্ত্রণাময় চেতনা, তাই অধুনা কবির আগন্তুক মানসের সম্পূরক, যা *বাইবেলে* বিধৃত নেই। এই ল্যাজারসের বেদনা কবি-কল্পিত এবং নিজের অব্যক্ত বেদনাকে সেই বেদনার সমান্তর করে তোলার কৃতিত্বও কবির।

কাব্য রচনার শুরুতেই শামসুর রাহমান যে জীবন্মৃতের বোধে স্পৃষ্ট, তা এক আগন্তুক মানসিকতা। একজন 'আউটসাইডারে'র কাছে পৃথিবী আরামপ্রদ কোনো স্থান নয়। সে তার চারপাশে অনুভব করে প্রবল হৈ-চৈ। তার চোখে সমাজ-সংসার, ধর্মবিশ্বাস, সভ্যতা ও মানুষের সকল কর্ম অসংলগ্ন, যুক্তিহীন, ক্লান্তিকর ও পুনরাবৃত্তির নামান্তর। ফলে, 'আউটসাইডার' সমাজের মধ্যে বাস করেও সমাজ-বিচ্ছিন্ন, নিঃসঙ্গ—তার জগৎ যন্ত্রণাময় অথচ সে সর্বদাই এক নতুন সত্য উন্মোচনে সক্রিয় থাকে। সে জগৎকে প্রত্যক্ষ করে গূঢ় ও গভীরভাবে—তার চেতন-অবচেতন, প্রজ্ঞা-স্বজ্ঞা, শরীর-মন ও শিল্পিতা দিয়ে অনুভব করতে চায় পৃথিবীর বাস্তব সত্যকে[১] (Wilson, 1963: 12-13)। শামসুর রাহমান কাব্যরচনার শুরুতেই প্রভাবিত হয়েছিলেন কলিন উইলসন রচিত একটি ঐতিহাসিক গ্রন্থ *দি আউটসাইডার* দ্বারা (শামসুর, ১৯৯১: ১১৫), যেখানে লেখক ফ্রান্স কাফ্কা, আলব্যের কাম্যু, জাঁ পল সার্তে, টি.এস.এলিয়ট, আর্নেস্ট হোমিংওয়ে, ফ্রেডরিক নিট্সে প্রমুখের রচনাকর্ম সমালোচনা করতে বিখ্যাত 'আউটসাইডার' তত্ত্ব উপস্থাপন করেন। উনবিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশের দশক থেকে এই নতুন অস্তিত্ববাদী ধারণা সাহিত্যে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে। কাব্য রচনার প্রথম পর্যায়েই শামসুর রাহমানের অন্তর্জগৎও মৃত্যুময় ও যন্ত্রনাদীর্ণ হয়ে উঠেছিল এই আগন্তুক মানসিকতায়। আর বাথেনের পথে-পথে 'ভাস্করের অসম্পূর্ণ মূর্তির মত' ঘুরে ফেরা ল্যাজারসের মরণাতীত বিষাক্ত অনুভবই সঞ্চারিত হয় নতুন পৃথিবীতে অভিযোজনে অপারগ আগন্তুক কবির চেতনায়—

উল্লোল নগরে কত বিলোল উৎসব ; কিন্তু তবু পারি না
মেলাতে আপনাকে প্রমোদের মোহময়
বিচিত্র বিকট স্বর্গে। বিষাক্ত ফুলের মতো কত।
তন্ময় রহস্য জ্বলে ওঠে আজও দু'চোখে আমার।
('প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে', *প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে*)

সমাজের ভেতর থেকেও কবি একজন 'আউটসাইডারে'র মত পৃথিবীকে নিরীক্ষণ করেন। ফলে, কবির কাছে চেনা পৃথিবীর রূপ-রঙ-রস, শ্রম-প্রজ্ঞা-প্রেম সব বিবর্ণ, বিস্বাদ, তমসাচ্ছন্ন মনে হয়—লোকালয়কে নরক আর জনগণকে বিকারগ্রস্ত নরকাত্মাদের মত মনে হয়। এক পাণ্ডুর বোধে কবি সকল সময় আক্রান্ত—মৃত্যুর অধিক এক ভীষণ যন্ত্রণাময় চেতনার অধিকৃত, যা জীবনানন্দীয় বিপন্নতা আর বোদলেয়ারীয় বিবমিষাকে ছাড়িয়ে যায়। কবি বলেন—'এ দৃশ্যের বোধ যাকে পায় সে কি মৃত্যু নয় তবে, / মৃত্যু নয়, মরণের অন্য মানে আছে ('প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে', *প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে*)। কবি আগন্তুক মানসে অনুভব করেন, তাঁর শিল্পাভিসারী সত্তার অন্তরায় হয়ে আসে কৃষ্ণকায় লৌহচঞ্চুর কোনো বিকট পাখি কিংবা হিংস্র নেকড়ের পাল, অথবা 'অনেক বেনামী প্রেত' কিংবা ধারালো দন্তে হৃদয় বিদ্ধ করা কুকুরের দল। কবির আনন্দময় বেঁচে থাকার এবং রোমান্টিক চেতনার প্রতিপক্ষরূপে ওইসব বিচিত্র প্রাণীর প্রতীক বারবার ব্যবহৃত হয় মূলত বিভিন্নরূপে, একই অর্থে। কবির কাছে এরাই নরকসদৃশ পৃথিবীর রোমশ পশুর দল। কবির ভাষায় এরা বিকারগ্রস্ত নিন্দুক, কুটচক্রী 'ক্রিটিকের দল'—

মাঝে মাঝে কৃষ্ণকায় বিরাট পাখির লৌহচঞ্চু
মাংস ছিঁড়ে নিতে আসে—আমি তাকে পারিনা ফেরাতে।
('প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে', *প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে*)

কিংবা,

যদিও আমার দরজার কোণে অনেক বেনামি
প্রেত ঠোঁট চাটে সন্ধ্যায়, তবু শান্ত রুপালি স্বর্গ-শিশিরে স্নান করি আমি।
('রুপালি স্নান', *প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে*)

বস্তুত, কবির 'রুপালি স্নান' শিরোনামের কবিতাটির প্রকাশকে কেন্দ্র করে কিছু অন্তরায় কবিকে সাময়িকভাবে বিদ্ধ করে। একটি দৈশিক সংবাদপত্রের সাহিত্য-পাতায় ছাপানোর জন্য প্রেরিত 'রুপালি-স্নান' স্থানে-স্থানে লাল কালিতে লাঞ্ছিত হওয়াতে অসন্তুষ্ট হন কবি। পরে কবিতাটি সানন্দে ছাপেন বুদ্ধদেব বসু তাঁর 'কবিতা' পত্রিকায়। তরুণ কবির অহং ও স্বপ্ন-জগৎকে এই ঘটনা কিছুদিনের জন্য হলেও দুঃস্বপ্নে নিরুদ্ধ করে রেখেছিল (শামসুর, ২০০৭: ৯৮)। এছাড়া বিচ্ছিন্ন ঘটনায় সমকালীন কিছু লেখকের বৈরী আচরণ ও বিরোধী মানসিতার শিকার হয়েছিলেন কবি (শামসুর,

২০০৭: ৯৮)। এমন আরো অনেক প্রতিকূলতাই হয়ত 'বেনামী প্রেত' কিংবা 'হিংস্র নেকড়ে'র প্রতীকে কবির পৃথিবীকে নারকীয় করে তোলে—

বারবার আত্মতৃপ্ত এই অন্ধকূপের গভীরে।
নেকড়ের মতো সব মানুষের দঙ্গল এড়িয়ে,
মাংসের মূঢ়তা ছেড়ে নৈঃসঙ্গে সম্পন্ন হয়ে চলি;
('অপাঙ্‌ক্তেয়', *প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে*)

কবির প্রিয় পৃথিবীকে এরাই নরক সদৃশ করে তোলে আর কবি হয়ে যান নিঃসঙ্গ, উন্মুল, আত্মভুক অস্তিত্বের বিবরবাসী এক আগন্তুক। কিন্তু, শেষ পর্যন্ত রুপালি স্নানের স্বপ্ন তাঁকে সেই অন্ধকূপ থেকে বেরিয়ে আসতে প্রেরণা যোগায়। ফলে, যে অসম্পূর্ণ ও অপ্রতিভ চেতনায় আরেক আগন্তুক, এলিয়টের 'প্রুফ্রক' বলে ওঠে—'' I am Lazarus, come from the dead,/ come back to tell you all'' (Eliot, 1936: 6), সে চেতনায় উদ্‌ভ্রান্ত নন ল্যাজারসরূপী শামসুর রাহমান। কারণ, এই ল্যাজারস সত্তা-সন্ধানী; প্রুফ্রকের মত ফাঁপা মানব নন। এ ল্যাজারস প্রথম থেকেই সত্তায় 'অন্তহীন আশ্চর্য বিষাদ' নিয়ে ঘুরে বেড়ান ছন্দে ও মিলে কথা বানাবার গভীর বাসনায়। আগন্তুক ভাবনার সাথে-সাথে জীবনানন্দীয় এক সম্মোহন ঘিরে রয় কবিকে এ সময়—'হাজার-হাজার বছরের ঢের পুরোনো প্রেমের কবিতার রোদে পিঠ দিয়ে বসে' কবি তারা-ভরা আকাশকে ডেকে আনেন হৃদয়ের কাছে (রুপালি স্নান, *প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে*)। আগন্তুক মানসের বিতৃষ্ণা আর রুপালি স্নানের তৃষ্ণা একইসাথে মিশে থাকে কবির সত্তায়। ফলে, ভীষণ অন্তর্মুখিনতা আচ্ছন্ন করে রাখে কবিকে যতক্ষণ না পর্যন্ত তিনি জীবন ও জনতার সাথে চেতনার ঐক্যসূত্রকে আবিষ্কার করতে সক্ষম হবেন। দ্বিতীয় কাব্য *রৌদ্র করোটিতে*'তে কবি মুক্ত হবেন তাঁর এ পর্বের চেতনার দ্বৈত স্বভাব থেকে।

কবির উন্মুল সত্তার প্রকাশ যেমন ঘটে 'ল্যাজারসে'র মিথে, তেমনি তাঁর নান্দনিক তৃষ্ণার প্রকাশ ঘটে 'অ্যাপোলো'র মিথে। বীণাধারী, কোঁকড়ানো চুলের গ্রিক সূর্যদেবতা অ্যাপোলো নান্দনিক সত্তার প্রতীক। কবি তাঁর চারপাশে দেখা অপহৃত-হৃদয়, প্রেমগানহীন, 'প্রেতচ্ছায়ানাট্য'ঘেরা ক্লীব সমাজে শিল্পের সোনালি-রূপালি সুরের ধারাকে প্রবাহিত করতে আহ্বান করেন 'অ্যাপোলো'কে—

অ্যাপোলো শুনছ ? নামল এখানে যাদের ধূসর সন্ধ্যা,
পোষ এসে ডাক দিয়েছে তাদের শূন্য ভাঁড়ারে
ঠোঁটে তুলে নিতে ইঁদুরের মতো মৃত্যু!
ধূ-ধূ প্রান্তরে আনাগোনা করে প্রাচীর প্রাচীন ছায়ারা

ম্লান ঘোড়াদের আর্ত চোখের বিষন্ন রোদে
খুঁজব কি বলো মধ্যযুগের ক্লান্তি?
নেমেসিস-হাসি কেঁপেছে আবার, প্রাণ ঝরে ফের জীবনের মানচিত্রে,
অ্যাপোলো! অ্যাপোলো! প্রবাল ঠোঁটের, চেতনা-প্রসূত—
সোনালি রুপালি মেয়েরা এখানে আসবে কি?
('অ্যাপোলোর জন্যে', *প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে*)

'ধূসর সন্ধ্যা, 'শূন্য ভাঁড়ার', ইঁদুরের মত মৃত্যু', 'ম্লান ঘোড়াদের আর্ত চোখের বিষন্ন রোদ' প্রভৃতি অনুষঙ্গ দিয়ে পুরনো কবিদের হৃত-যৌবন নান্দনিকতার প্রসঙ্গ তুলেছেন কবি এবং সোনালি-রূপালি সুরের মূর্ছনায় নতুনভাবে শিল্পের প্রান্তরকে নন্দিত করতে 'অ্যাপোলো'কে মর্ত্যে আহ্বান করেন কবি।

প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে কাব্যে একদিকে যন্ত্রণাময় চৈতন্য, অপরদিকে স্বপ্নাভিলাষী সত্তা নিয়ে কবির নান্দনিক স্বভাবের দ্বৈততা সঞ্চারিত হয় তাঁর প্রতীকায়নেও। আহত পশুর অনুভবে ছেঁড়াখোঁড়া, গুহায়িত চৈতন্য নিয়ে কবি 'দ্বৈপায়নে'র মত স্বেচ্ছাবন্দী হন কাদায়, কৃমিতে প্রোথিত পশুর দঙ্গলে। কবি তাঁর বিবরবাসী চৈতন্যের প্রতীকায়নে ব্যবহার করেন 'অন্ধকূপ', 'নির্জন দূর্গ', 'মর্মর প্রাসাদ' কিংবা গভীর কুটিল কোনো 'খাদ'—যেখানে পুঞ্জীভূত পাঁকে মানুষের আশা-স্বপ্ন-কামনা, সুন্দর-অসুন্দর সমস্ত কিছুই আবর্তিত হয়ে-হয়ে লুপ্ত হতে বাধ্য। কিন্তু, আশ্চর্য বিষয় হলো—কবি তাঁর কল্পনায় সেই খাদকেই করে তোলেন আলোকিত, মোহময়, গুঞ্জরিত। কখনো রঞ্জিত পাঁকের মাঝে উচ্চকিত হয় কোকিলের সুর আর নোংরা নর্দমার মাঝেই কবি খুঁজে পান 'প্রজ্জ্বলিত দুর্লভ মানিক'—

দুর্গন্ধের সুতীব্র পীড়নে রাত্রিদিন বিভীষিকা
সমপরিমাণে; ক্রমাগত কেবলি জড়াই পাঁকে।
নঃশ্বাসে নরক ফোঁসে, আমার অধীর আত্মা সেও
গরলের বিন্দু হয়ে ঝরে সারাক্ষণ, আর দেখি
আকাশে নক্ষত্র-গুচ্ছ, আমি শুধু মরালের মতো
অন্তিম গানের ধ্যানে প্রজ্জ্বলিত, গুঞ্জরিত খাদ।।
('খাদ', *প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে*)

বোদলেয়ারের মতই কদর্য-নোংরা-নর্দমা আর ক্ষতের মধ্যে কবি খুঁজে ফেরেন শিল্পিত সৌন্দর্যকে। বস্তুপৃথিবীর সমস্ত যন্ত্রণার উপশম খোঁজেন কবি এই শিল্পিত উদ্ভাসনে। এক অভূতপূর্ব নান্দনিক স্বভাবে কবির কাব্যে যেভাবে বস্তুলোক পরিণত হয় প্রজ্জ্বলিত নরকে, ঠিক বিপরীতভাবে কবির নান্দনিক সত্তার ক্রিয়াশীলতায় সে নরক রূপান্তরিত হয় স্বর্গে। এই রূপান্তর-রহস্যই শামসুর রাহমানের প্রথম কাব্যের 'টেকনিকে'র অনন্য আস্বাদ। এ কারণেই মিথ-ব্যবহারে কবি যেমন

দ্বৈতস্বভাবী, প্রতীক চিত্রণেও তেমনি দ্বিমাত্রিক। এই কৌশলেই কবি কুৎসিতকে সৌন্দর্যে রূপান্তরিত করেন। আপাদমস্তক কাদায়-কৃমিতে প্রোথিত হয়েও কবি শেষ পর্যন্ত উন্নীত হন সুন্দর, স্বাধীন অস্তিত্বে—কবির ঘৃণ্য প্রোজ্জ্বল ক্ষত থেকে জ্বলে ওঠে শিল্পের অক্ষয় আয়ুধ—

> জানি ঘৃণ্য প্রোজ্জ্বল আমার ক্ষত, তবু নিমেষেই
> অক্ষয় ধনুক জ্বলে সবার উদ্বাহু আকাঙ্ক্ষায়।
> ('ক্ষত ও ধনুক', *প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে*)

ফলে, *প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে*'র কবিতায় ব্যবহৃত বিপ্রতীপ-স্বভাবী প্রতীকগুলো প্রায়শই কবির সত্তার অনন্য সমন্বিত একটি রূপে নির্মিত, যা প্রতীকী গাঢ়তা বা গূঢ়তাকে কিছুটা ক্ষুন্ন করলেও কবির নান্দনিক অভিপ্রায়কে তৃপ্ত করে। 'ক্ষত' ও 'ধনুকে'র দ্বৈত অথচ সমন্বিত প্রতীকে কবির সত্তার দু'টি রূপ প্রতীকান্বিত হয়—প্রথমটি আগন্তুক কবির যন্ত্রণাদীর্ণ চেতনার প্রতীক, দ্বিতীয়টি সেই পঙ্ক ও ক্ষত থেকে জন্ম নেয়া শিল্পের শাশ্বত সুন্দরের প্রতীক। একইভাবে, যদিও সমুদ্রের ব্যবধি নেই, চারিদিকে গোষ্পদ আর এঁদো ডোবা—যদিও পাহাড়ের স্থান নিয়েছে উঁই ঢিপি, কোকিলের গানের পরিবর্তে প্রতিনিয়ত শোনা যায় 'বায়সের গণ্ডগোল', ফণিমনসায় কণ্টকিত হয় সাধের শিল্প-বাগান আর চারিদিকে দুঃস্বপ্নের, প্রেতের আনাগোনা—তবু, প্রবালে আর হাঙরে দ্বন্দ্বময় কবির মন জেগে রয় 'আশার মৃণালে জীবনের স্বর্ণকমল জ্বালাতে ('গোষ্পদ ও মন', *প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে*)। একই নন্দন-চেতনা থেকে আস্তাবলের অন্ধকার, নোংরা নর্দমা, থ্যাঁতলানো ইঁদুর, ক্ষতগ্রস্ত বেতো ঘোড়া, অবদমিত-কাম মাতালের দল কিংবা কয়েকটি জোচ্চর অবলীলায় শামসুর রাহমানের কবিতার স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যায়—জাদুমন্ত্রেই আস্তাবল পরিণত হয় অপরূপ সরোবরে আর পরাবাস্তবতায় সওয়ার হয়ে 'বেতো ঘোড়া'টা নিঃসংকোচে উড়ে চলে আকাশে।

প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে কাব্যে 'সেই ঘোড়াটা' কবিতাটি একটি উল্লেখযোগ্য কবিতা, যেখানে প্রথম বারের মত শামসুর রাহমানের নান্দনিক স্বকীয়তাকে স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা যায়। এই কবিতার দুইটি অংশ শামসুর রাহমানের নন্দন-স্বভাবের সুনির্দিষ্ট দুটি বৈশিষ্ট্যে আলাদা। প্রথম অংশে কবি জড়ো করেন পুরনো ঢাকার আধা-সামন্ত ম্রিয়মান জীবনের নানা চিত্র ও চরিত্র, যাদের বিস্তৃত রূপায়ণ ঘটবে কবির পরবর্তী কাব্য *রৌদ্র করোটিতে*'তে। আর, কবি-কল্পনা ও শিল্পের যে অপূর্ব জৈব-রসায়নে কবিতাটির শেষ অংশ পূর্ণতা পায়, তাতেও শামসুর রাহমানের পরবর্তীকালের কাব্য-শৈলীর অনুলক্ষণ প্রকাশ পায়। 'সেই ঘোড়াটা' কবিতায় আশ্রমের ফিকে অন্ধকারে একটি আফিমখোর বেতো ঘোড়া, তার ক্ষত নিসৃত মদিরা পানকারী 'তিনজন মাছি, বিলীয়মান স্বপ্ন-স্মৃতির প্রতীক

থ্যাঁতলানো ইঁদুর, আকাশের পারিজাতের মত চাঁদ, চাঁদের আলোয় খড়ের শয্যায় নিদ্রিত অবিকল কাঠের নকশার মত নিঃসন্তান বিপত্নীক সহিস, পূর্ব-পুরুষের 'স্মৃতিবিষে' আচ্ছন্ন তিনজন অবদমিত-কাম তাড়ি গেলা মাতাল—এই সব চিত্র মূলত পুরনো ঢাকার নাগরিক জীবনের নানা প্রতীকী দৃশ্যের কোলাজ। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে আস্তাবলের এই ক্ষত, ক্লেদ, নোংরা, বিকৃতি আর শূন্যতার কোলাজ রচনাই কবির উদ্দেশ্য—মনে পড়ে যায় বোদলেয়ারের 'একটি শব' কবিতা, কিন্তু, বোদলেয়ারের কবিতায় শবের বিকৃতি অন্য এক দার্শনিকতায় রূপ নেয়—পাশে থাকা প্রেমিকার কৃমি-কীটে ভরা শব কল্পনায়। শামসুর রাহমানের কবিতাটি কিন্তু বিষাদ আর বিকৃতির সৌন্দর্য সন্ধানেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং এক পরাবাস্তব 'ফ্যান্টাসি'তে 'সেই ঘোড়াটা' কবিতাটি অন্য দিকে মোড় নেয, যা বোদলেয়ার থেকে পৃথক করে দেয় কবিকে। কবির শব্দ-কল্পনার জাদুস্পর্শে আস্তাবলের নোংরা, অন্ধকার, শূন্যতা আর আফিমখোর বেতো ঘোড়াটার রূপান্তর ঘটে যায়—

আস্তাবলের সেই বেতো ঘোড়াটা নিমেষে
তন্দ্রার ঘোর কাটিয়ে উঠল, আশ্চর্য এক ফুল হয়ে
জন্ম নিল তার ইচ্ছা, শিরায় শিরায়
সঞ্চারিত হ'ল সে ফুলের সৌরভ

চকিতে নোংরা নর্দমা হয়ে ওঠে অপরূপ সরোবর,
খড় কুটো, ছেঁড়া ন্যাকড়া, থ্যাঁতলানো ইঁদুর, ফুলের তোড়া মণিরত্ন হয়ে
ঝলসে ওঠে ওর চোখে, আর সে নিজে উড়ে গেল
মেঘপুঞ্জে, নক্ষত্রগুচ্ছে, শূন্যের নীলিমায়।
('সেই ঘোড়াটা' , *প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে*)

কবি প্রতীকবাদী কবিদের মত বিস্তৃত প্রতীকায়ন কৌশলে একধরনের 'ইল্যুশন' বা বিভ্রম তৈরি করেন আর দৃশ্যপট আশ্চর্যভাবে রূপান্তরিত হতে থাকে। আস্তাবলের নর্দমা পরিণত হয় অপরূপ সরোবরে, থ্যাঁতলানো ইঁদুর রূপান্তরিত হয় ফুলের তোড়া আর মণিরত্নে এবং বেতো ঘোড়াটা তার অবলুপ্ত কান্তি ফিরে পেয়ে উড়ে যায় নক্ষত্রপুঞ্জে। কবিতায় একটির পর একটি 'ইমেজ' সৃষ্টির মধ্য দিয়ে দৃশ্যপট পাল্টে যেতে থাকে, যতক্ষণ না পর্যন্ত দৃশ্যমান জগৎ একটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নতুন বাস্তবতায় আবৃত না হয়। এক আশ্চর্য ফুল হয়ে জন্ম নেয় বেতো ঘোড়াটার ইচ্ছা এবং সে ফুলের সৌরভ সঞ্চারিত হয় তার শিরায়-শিরায়। কবি শব্দ ও ধ্বনিকে রূপান্তরিত করেন বর্ণ ও গন্ধে আর নিরেট ও নিশ্চলের মধ্যে চালিত করেন স্বপ্ন ও ইন্দ্রজাল। এইভাবে বস্তু-সত্তাকে তিনি উন্নীত করেন ইন্দ্রিয়ময় সত্তায়—কবিতার জগৎ স্বয়ংক্রিয় হয়ে ওঠে। এই প্রক্রিয়া ততক্ষণ চলতে থাকে, যতক্ষণ না পরিপূর্ণ রূপান্তরটি সাধিত হয়। পাঠক অভিমন্ত্রিত হয় আর কবির কাছে প্রত্যক্ষ জগৎ সুন্দর হয়ে ওঠে। তাঁর ভয় বা যন্ত্রণা বিমোক্ষণে রূপান্তরিত হয় এবং এক নান্দনিক অনুভূতির আলোয় কবি চরিতার্থতা অর্জন

করেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যায়ের প্রতীকবাদী কবিদের কবিতায় এমনি রূপান্তর লক্ষ করা যেত—বিশেষত র‍্যাঁবো'র কবিতায়। 'সিনাসথেসিয়া'র[২] প্রয়োগে কবিতায় ইন্দ্রিয়গত রূপান্তর বর্ণকে সুরে বা সুরকে বর্ণে রূপান্তর করা, একটির পর একটি দৃশ্যকল্পে চেতনাকে সচল করে তোলা, বস্তুজগতের রূপান্তর সাধন প্রভৃতি লক্ষণে শামসুর রাহমানের এই কবিতায় প্রতীকবাদী কবিতার কৌশল লক্ষ করা যায়, যার মধ্যে কবির পরাবাস্তব প্রতীতি দ্রবীভূত হয়ে মিশে থাকে। আর কে না জানে প্রতীকবাদী কবিদের প্রশ্রয়েই কবিতায় প্রথম পরাবাস্তবতার অভিষেক ঘটে।

প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে কাব্যে কবি যে আত্মগত 'নার্সিসাস' চেতনার অধীন, বস্তুত, তা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাজাত নয়। তখনো তিনি 'বেতো ঘোড়াটি'র মত খোঁয়ারিতে আচ্ছন্ন, অহং-সম্পন্ন কিংবা কখনো স্বপ্নবান। যে 'নরকে' তাঁর বাস, সেই নরকের নাড়ি-নক্ষত্র সম্পর্কে তিনি তখনো অজ্ঞাত। ফলে, তিনি অভিযোজন-বিমুখ, অন্তর্লোকচারী। কিন্তু অনতিকাল পরেই অভিজ্ঞতাসূত্রে যখন কবি এই নগরেরই একজন হয়ে ওঠেন কিংবা নাগরিক জীবনের ব্যস্ততা ও কোলহল যখন কবির আত্মতার ধ্যান ভেঙে দেয়, তখন সেই কৃত্রিম কল্পনালোক নিস্প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে। কবি তাঁর আগন্তুক-সত্তার নির্মোক ছিন্ন করে *রৌদ্র করোটিতে*'তে প্রত্যক্ষ জগতের সাথে অন্তর্জগতের সমন্বয় সাধনে সমর্থ হন। *প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে* কাব্যে 'ল্যাজারস'রূপী কবির নানা বিচ্ছিন্নতার যন্ত্রণা ও নিঃসঙ্গতা *রৌদ্র করোটিতে*'তে সূর্যরশ্মির মত ছড়িয়ে পড়ে বহু রেখায়—তাঁর একক বিপন্নতা বহু ছোট-ছোট বহিরাশ্রয়ে সংক্রামিত হয়ে কবির চৈতন্যকে যেমন লঘুভার, তেমনি বৈচিত্র্যপূর্ণ করে তোলে। নগরীর পরিপার্শ্ব ও তার বিভিন্ন 'অবজেক্ট'-এর মধ্যে নিজের ঘনীভূত বিচ্ছিন্নতাকে ছড়িয়ে দিয়ে কবি জীবন ও জগতের সাথে একাত্ম হন। জীবনের কুৎসিত ও সুন্দরকে তিনি 'আংটি'র মত ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে লক্ষ করেন—কবিতায় জীবনের সেই রূপকে প্রকাশ করেন খণ্ড-খণ্ডরূপে, বিচিত্র কোলাজে, বহু ছোট-ছোট চরিত্রের চেতন-অবচেতনসূত্রে—নতুন আবিষ্কৃত এক নান্দনিক পরিকাঠামোয়। *রৌদ্র করোটিতে*'র প্রথম কবিতা, 'দুঃখে'র মতই তিনি ছড়িয়ে দেন নিজেকে বহু অনুষঙ্গে, জীবনের বিচিত্র মাত্রায়। পরিণত কবি মন থেকে মুছে ফেলে দেন ছোট-খাটো পাপবোধ। ফলে, যে নগরীতে একদিন 'ল্যাজারসে'র মত বিপন্ন, বিবর্ণ ও মূক হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন, সেই নগরীর একান্ত আপন জন হয়ে ওঠেন তিনি। বহির্জগত ও ব্যক্তি কবির মধ্যে এক তিক্ত-মধুর সৃজনশীল সখ্য গড়ে ওঠে এবং মিথ-প্রতীকের গূঢ় নান্দনিকতা ত্যাগ করে তিনি কবিতার নতুন আঙ্গিকে হয়ে ওঠেন বহুমুখী—কবিতার 'সাবজেক্টিভিটি' প্রায় সম্পূর্ণই পরিহার করেন। বহ্নিমান শহরের অলিতে-গলিতে-পার্কে-এভিন্যুয়ে সমস্ত ইন্দ্রিয়কে মেলে দিয়ে কবি প্রত্যক্ষণ করেন বিচিত্র

দৃশ্য ও চরিত্র। ফলে, জীবনমুখী প্রেষণা, সৃজনশীল প্রত্যক্ষণ এবং অন্তর্দর্শনসূত্রে তিনি চলমান জীবনের অনতিরঞ্জিত বাস্তবতাকে ছাড়াই উপস্থাপন করেন কবিতায়—এমনকি কখনো-কখনো পরিসংখ্যানাকারে ব্যক্ত করেন তথ্য—এ পাড়ায় ১৭ টি উজবুক, ৫ জন বোবা/ সাতটি মাতাল আর তিনজন কালা বেঁচে বর্তে/ আছে আজো দুর্দশার নাকের তলায় ('খুপরির গান', *রৌদ্র করোটিতে*)। *রৌদ্র করোটিতে*'তে কবির জগৎ হয়ে ওঠে নগরীর বিচিত্র শব্দ ও দৃশ্যময়—বাস-মোটরের হর্ন, চুলের কলপ বা টনিকের ক্যানভাসিং, ঊর্ধ্বশ্বাস ট্রাফিক, রাত্রির ফুটপাত, পার্কের জীবনের বৈচিত্র্যে তাঁর মস্তিষ্ক হয়ে ওঠে বহ্নিমান শহরের অদ্বিতীয় প্রতিরূপক—

> আমার মাথাটা যেন বহ্নিমান একটি শহর
> যেথানে মানুষ, যান, বিজ্ঞাপন, রেডিয়োর গান,
> ভিখিরির চ্যাঁচামেচি, বেশ্যার বেহায়া অনুরাগ,
> কানাঘুষো, নামহীন মৃত শিশু আবর্তিত শুধু।
> ('স্বগত ভাষণ', *রৌদ্র করোটিতে*)

প্রতিদিন দেখা নগর ঢাকার বিচিত্র জীবনের ধারণা থেকেই জন্ম নেয় শামসুর রাহমানের এ পর্বের কবিতার 'স্টাইল'। এমনকি সেই জীবনের মধ্য থেকেই জন্ম নেয় তাঁর কবিতার শব্দ-ভাষা ও প্রকাশভঙ্গি। প্রকৃতপক্ষে, শামসুর রাহমান বাংলা কবিতায় একজন নাগরিক কবিরূপেই আত্মপ্রকাশ করতে চেয়েছেন। ''পূর্ববাংলার সাম্প্রতিক কবিতা'' শিরোনামে লেখা কবির একটি প্রবন্ধে চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকে তাঁর সমকালীন কবিদের কাব্য সমালোচনা প্রসঙ্গে শহরকেন্দ্রিক বাংলা কবিতার অপ্রতুলতার কথা উল্লেখ করেছিলেন সে সময় এবং গ্রামকেন্দ্রিক পূর্ববাংলায় পল্লী-জীবনকেন্দ্রিক কবিতার পাশাপাশি নাগরিক কবিতার অপরিহার্যতার দাবি জানিয়েছিলেন—

> স্বীকার করছি, এ দেশের মানুষ প্রধাণতঃ পল্লীকেন্দ্রিক সাহিত্য তৈরী করবে, কিন্তু তাই বলে শহরকে আমরা আসর থেকে নির্বাসিত করবো না। আর কোনো সাহিত্যিক যদি শহরকে কেন্দ্র করে সৎ সাহিত্য তৈরী করেন তাহরে তাঁকে 'শহুরে' বলে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেবার দুর্মতি হওয়া উচিত নয় কোনোমতেই। শহরকে আমরা নির্বাসিত করতে পারি না, কেননা আমাদের বর্তমান জীবনে শহর কিছু কম প্রভাবশালী নয়। ধরতে গেরে শহরই আধুনিক জীবনের প্রাণকেন্দ্র হয়ে পড়ছে। এ কথা খুবই সত্যি শহরে রয়েছে নোংরামি, কুশ্রীতা, হিংসা, লালসা আর কালো ধোঁয়া—কিন্তু তাই বলে শহরকে আমরা ঘৃণা করে দূরে সরিয়ে রাখতে পারি না, তারও একটা স্বতন্ত্র সত্তা রয়েছে, সৌন্দর্য রয়ে গেছে (শামসুর, ১৯৯১: ২৭৫)।

শামসুর রাহমানের কাছে নগর মানে ক্রমবর্ধমান ঢাকা—শৈশবে দেখা মাহুতটুলী, পুরানা-পল্টন, আর্মনীটোলার পুরনো নগরের ক্ষয়িষ্ণু জীবন থেকে নতুন পুঁজির বিকাশে উর্ধ্বমুখী নব্য ঢাকার ব্যস্ত জীবনে পদার্পণের চালচিত্র। শামসুর রাহমান নগর ঢাকার এই সামাজিক পরিবর্তনের অন্যতম সাক্ষী।

উদীয়মান এই শহরের গর্ভ থেকে জায়মান এক প্রাণ শামসুর রাহমান। শহর আর কবি সমান বয়সী বলে এর আলো-অন্ধকার, স্মৃতি-বর্তমান, জন্ম ও বিকাশের ইতিহাস নখদর্পণে ছিল তাঁর। *রৌদ্র করোটিতে*'তে কবি তাঁর সেই চেনা জগতের সাথে সুর মেলান—সে জীবনের দৈনন্দিন হাল-চালকে ছন্দায়িত করেন।

রৌদ্র করোটিতে'তে কবি আর আগন্তুক নন, বরং তাঁর চোখ খুঁজে বেড়ায় শহরের অলিতে-গলিতে ইতঃস্তত ভ্রাম্যমাণ সব আগন্তুক চরিত্রদের। ডিলান টমাসের (১৯১৪-১৯৫৩) কাব্য-জগতের মতই রাহমানের *রৌদ্র করোটিতে* হয়ে ওঠে চেনা-অচেনা বিচিত্র চরিত্রের আস্তানা—শতচ্ছিন্ন তালি-মারা কোট গায়ে গলির রহস্যময় বুড়োটা, বাউণ্ডুলে ময়লা ভিখিরি, লম্পট, জোচ্চর, গণ্ডমূর্খ, ভণ্ড ফকির, অর্ধ্বনগ্ন ভস্মমাখা উন্মাদিনী বেহেড মাতাল—যাদের এমনকি চরিত্র হওয়ার যোগ্যতা নেই, তারাই হয়ে ওঠে রাহমানের কবিতার জীবন্ত 'অবজেক্ট'। নাগরিক প্রতিবেশ, পুঁজিবাদী অর্থনীতি, শ্রেণীবৈষম্যের সমাজে যারা নিঃসঙ্গ ও উন্মূল হতে বাধ্য, অবদমিত-কাম—যারা জীবনের স্বাদ 'টক' জেনে কল্পলোকবিহারী, স্মৃতির সম্পন্নতা আর বর্তমানের বৈরিতার মধ্যে যাওয়া-আসা যাদের—যারা বাস করে একই সাথে বাস্তব ও অধিবাস্তব জগতে, তাদের অন্তর্লোক-বহির্লোক, চেতনাস্রোত, স্বপ্ন ও বিভ্রমের (delusion) ইন্দ্রজাল শামসুর রাহমানের কবিতার উপজীব্য হয়ে ওঠে।

'পার্কের নিঃসঙ্গ খঞ্জ' কবিতা রোঁয়া ওঠা কুকুরের সাহচর্যে আর দুষ্টু বালকদের দৌরাত্ম্যে অস্থির যে খঞ্জ জোৎস্নার করোটিতে সুতীব্র মদিরা পান করে রাত্রির নির্জনতায় ভাবে 'নুলোর বউয়ে'র কথা, যাকে সে পাবে না কোনোদিন, সেই অবদমিত-কাম খঞ্জের অন্ধ চেতনা স্রোতকে শব্দ-ভাষায় মূর্ত করেন কবি—

একতাল শূন্যতায় ভাবে
বেহেশতের হুরি যায় কশাই চামার
ছুতোর কামার আর
মুটে মজুরের ঘরে আর দরবেশের গুহায়
বাদশার হারেমে সুন্দরী বাদী যদি
বিলাসের কামনার খাদ্য হয় সোহাগ জোগায়
বিলোল অধরে
গড়ায় ক'ফোঁটা পানি ক্ষুধিত পাষাণে
অথবা নুলোর বউ কাঁদে ভাদ্রের দুপুরে
তবে যে লোকটা হেঁটে যায়
বিকেলের মোলায়েম রোদে
তার কীবা এসে যায়"
('পার্কের নিঃসঙ্গ খঞ্জ', *রৌদ্র করোটিতে*)

মূলত, ডিলান টমাসের 'The Hunchback in the Park' কবিতার খঞ্জকেই শামসুর রাহমান প্রত্যক্ষ করেন পুরনো ঢাকার পার্কের কোনো নিঃসঙ্গ খঞ্জের মধ্যে। ডিলান টমাসের খঞ্জও ঠিক একইভাবে দুষ্ট বালকদের দৌরাত্ম্য পেরিয়ে রাতের নির্জনতায় কুকুরের সাথে একই 'ক্যানেলে' শুয়ে কাদা-মাটি দিয়ে গড়ে তোলে কোনো নিখুঁত-শরীর নারী—

Made all day untill bell time
A woman figure without fault
Straight as a young elm
Straight and tall from his crooked bones
That she might stand in the night
After the locks and chains
(Thomas, 1972: 105)

ডিলান টমাস তাঁর 'I see the boys of summer' কবিতায় যেমন এঁকেছেন গ্রীষ্মের বালকদের (Thomas, 1972: 105), কিংবা 'Find meat on Bones' কবিতায় শুষ্কস্তন মাতাদের বুভুক্ষু সন্তানদের যেমন দেখেছেন উচ্ছিষ্ট হাড়ের ভেতর পরম নিষ্ঠায় মাংস খুঁজতে, তেমনি শামসুর রাহমান তাঁর কবিতায় এনেছেন বুভুক্ষের পরিমেল খুঁজে ফেরা তিনটি বালককে ('তিনটি বালক, *রৌদ্র করোটিতে*)। *রৌদ্র করোটিতে*'তে এই চরিত্রপ্রধান কবিতাগুলোতে চরিত্রের 'মুড্' পরিবর্তনের সাথে সাথে কবিতা সামনের দিকে অগ্রসর হয়। চরিত্রের মনোজাগতিক ভাবান্তর, সংলাপ, চেতনাপ্রবাহ কিংবা স্বগত-কথনের সূত্রে স্তবকে-স্তবকে কবি বুনে চলেন কবিতা। ফলে, কবিতায় ছদ্ম-নাটকীয়তার আস্বাদ পাওয়া যায়, সেই সাথে এক ধরনের রোমান্টিক বিষাদ ও তীব্র 'আয়রনি' তৈরি হয়। চরিত্রের অবচেতনাসূত্রে কবিতায় কখনো জেগে ওঠে কোনো বিভ্রম। যেমন 'তিনটি বালক' কবিতায় খোলা আকাশের নীচে ফুঁটো কাঁথা গায়ে দিয়ে শুয়ে থাকা বালকদের স্বপ্নকে বিভ্রমের মত জাগিয়ে তোলেন কবি উদ্ভাসন প্রক্রিয়ায় একটি স্মৃতি-সঞ্চারিত চিত্রকল্পে (Ivocative Image)—

ফুটোভরা কাঁথার তলায় শুয়ে তারাময় খোলা
আকাশের নিচে কোনোদিন
হয়তো অলক্ষ্যে হয় স্বর্গের শিকার।

মাঝে-মাঝে স্বপ্ন দেখে : ম্লান কুয়াশায়
এক ঝাঁক ঘুঘু নামে পূর্বপুরুষের
সম্পন্ন ভিটায়।
('তিনটি বালক', *রৌদ্র করোটিতে*)

চরিত্রের চেতন-অবচেতনকে কবি এক আশ্চর্য কৌশলে মূর্ত করেন এই কবিতাগুলোতে। মূলত একটি কেন্দ্রীয় Image †ক বিস্তৃত করে তোলেন এবং একসময় সম্পূর্ণ হয় প্রতিমাটি—'নেশার খোয়ারি' কেটে গেলে পৃথিবীকে যেমন মনে হয় 'নির্বোধের হাসির মত'। যেমন 'পার্কের নিঃসঙ্গ খঞ্জ' কবিতায় খঞ্জের অবচেতনাকে জাগ্রত করতে শুরুতেই কবি ভণিতা করেন একটি চিত্রকল্প দিয়ে—

যেন সে দুর্মর কাপালিক
চন্দ্রমার করোটিতে আকণ্ঠ করবে পান সুতীব্র মদিরা

সে মদিরা পান করে খঞ্জ শোনে স্বপ্নালু পৃথিবীর ধ্বনি ঝরে পড়ার শব্দ—'হরিণের কানের মতন', 'উচ্ছল মাছের রূপালি আঁশের মতন'। তারপর একটি চিত্রকল্প দিয়ে কবি খঞ্জের স্মৃতিকে জাগ্রত করেন—'আর স্মৃতিগুলো একপাল কুকুরের মত / খিঁচিয়ে ধারালো দাঁত মনের পিছনে করে তাড়া'। বস্তুত, পূর্বপুরুষের 'স্মৃতিবিষে' আচ্ছন্ন *রৌদ্র করোটি*তের প্রায় প্রত্যেকটি আগন্তুক চরিত্র। কবির অন্তর্দর্শনসূত্রে এটি তাঁর চরিত্রগুলোর একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য। অতঃপর কবি একটি বিভ্রম সৃষ্টির মাধ্যমে সেই খঞ্জের মগ্নচেতনার অবদমিত কামনাকে ব্যক্ত করেন 'বেহেশতের হুর', 'বাদশার হারেমের সুন্দরী বাঁদি' আর 'নুলোর বউ'য়ের অনুষঙ্গে। *রৌদ্র* করোটি'র আগন্তুক চরিত্রগুলো কম-বেশি অবদমিতরূপে কামুক—টি. এস. এলিয়টের বিখ্যাত 'আলফ্রেড প্রুফ্রকে'র মত। সুতরাং, এটিও চরিত্রায়ণের একটি কৌশল। তারপর একটু থেমে খঞ্জের চেতনাস্রোতকে অনিয়মিত করে কবি তার বাহ্যিক পরিপার্শ্বকে চিত্রিত করেন—মাতাল, ভিখিরি, লম্পট, জোচ্চরে সরব রাত্রের পার্কের দৃশ্যায়ন ঘটান। এরপর বিপরীতধর্মী একটি রোমান্টিক রূপকল্প আঁকেন কবি—'রজনীগন্ধ্যার ডালে কাগজের মত চাঁদ বোনে / স্বপ্নের রূপালি পাড়'। বস্তুত, এটি রাহমানের কবিতার একটি পরিচিত 'টেক্‌নিক', যা দিয়ে তিনি 'খেঁকি কুকুর' আর 'পূর্ণিমা' কিংবা 'রজনীগন্ধ্যা' ও 'চিমনীর ধোঁয়া'কে, অর্থাৎ ক্লেদ আর সৌন্দর্যকে জীবনের অবিচ্ছেদ্য উপাদান করে তোলেন। নাগরিক জীবনের অম্ল-মধুরতাকে কবি এভাবেই সমন্বিত করেন। তারপর একটি বিপরীত-স্বভাবী উৎপ্রেক্ষা খঞ্জের রোমান্টিকতাকে তছনছ করে দেয় প্রবল অনাস্থায়—রাহমানের কাব্যে যে অলংকারটি বারংবার ব্যবহৃত হয়—'একটি কর্কশ পাখি / আত্মাকে ঠুকরে বলে তোমার বাগান নেই ব'লে / রক্তিম গোলাপ আসবেনা'। এভাবে কবি খঞ্জের জীবনের নিঃসীম শূন্যতার অবধারিত বাস্তবতার ইঙ্গিত করেন, যা কবিতায় জন্ম দেয় অনমনীয় এক 'আয়রনি'। নুলোর বউটা খঞ্জের চেতনায় একবার উঁকি দিয়ে চলে গেলে কবি খঞ্জকে নিয়ে আসেন বস্তুলোকে—আবারো 'রোঁয়া ওঠা কুকুরের সাহচর্যে', 'গ্রীষ্মের গোধূলিতে', 'বিষাদের ঘরে' অন্তহীন নিঃঙ্গতায় এবং সেই সাথে কেন্দ্রীয় 'ইমেজটি'ও

পরিপূর্ণ ও সমাপ্ত হয়। এইভাবে কবি একটির পর একটি চিত্রকল্পে, চেতনাপ্রবাহে, নাটকীয়তায় কেন্দ্রীয় ইমেজটিকে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিমারূপে দাঁড় করান। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, একটি দু'টি চিত্রকল্পে সীমাবদ্ধ নয় রাহমানের এই চরিত্র-নির্ভর 'ইমেজ' কবিতাগুলো। কারণ, কবির অনুপুঙ্খ বা 'ডিটেইল' বর্ণনার ঝোঁক থাকে, তবে, অসাধারণ মাত্রাচেতনায় তিনি কবিতার আদি-অন্ত্যকে একটি সম্পূর্ণ প্রতিমায় মূর্ত করে তোলেন। কিন্তু ওগুলো ঠিক বিংশ শতাব্দীর চিত্রকল্পবাদী কবিদের (Imagist Poet) চিত্রকল্প-নির্ভর কবিতার মত নয়। চিত্রকল্পবাদী কবিদের কবিতায় তীব্র, তীক্ষ্ণরূপে স্ফূলিঙ্গের মত একটি চিত্রকল্প চমকিত হয়ে উঠত। অনেকক্ষেত্রেই একটি মাত্র মোক্ষম চিত্রকল্পই সংক্ষিপ্ত একেকটি কবিতার উপজীব্য ছিলো। ওইরূপ ঋজু, স্বচ্ছ, লিরিক ও সংহত চিত্রকাল্পিক কবিতায় চেতনাকে দীর্ঘায়িত করার কোনো উদ্দেশ্য থাকতো না কবির। সংক্ষিপ্ততাই 'ইমেজিস্ট' কবিদের মূল লক্ষ্য ছিল। এজরা পাউণ্ড কবিতায় বর্ণনাকে পরিহার করতে বলেছিলেন—

Don't be descriptive; remember that the painter can decribe a landscape much better than you can, and that he has to know a deal more about it. (Pound, 1966: 323) কিন্তু, শামসুর রাহমান *রৌদ্র করেটিতে*'তে সে নির্দেশ অগ্রাহ্য করেন, কারণ এজরা পাউন্ডদের Image কবিতার মত ঘন পিনদ্ধ, চিত্রকল্প-প্রাণ কবিতা তিনি রচনা করতে চাননি 'রৌদ্র করেটিতে'তে বরং উপমা-চিত্রকল্পকে তিনি সচেতনভাবে ভেঙে দিয়ে ভাষাকে বর্ণনাত্মক করে তুলেতে চান। আধুনিক কবিতার সচেতন শব্দ-বিন্যাস ও ভাস্কর্যধর্মী কাঠামো থেকে বেরিয়ে শব্দ-ভাষার স্বাধীনতাকে আবিষ্কারই শামসুর রাহমানের কবিতার সবচেয়ে বড় স্বাতন্ত্র্য। তিনি বিভিন্নভাবে সে কাজটি করেছেন তাঁর বিভিন্ন পর্বের কবিতায়। শামসুর রাহমানের চরিত্র-প্রধান কবিতাগুলোতে একটি কেন্দ্রীয় Image পরিকাঠামো থাকলেও তা ঐ Image কবিতার ঠিক বিপরীত-স্বভাবী। কারণ, রাহমানের এই কবিতাগুলো মূলত 'ন্যারেটিভ', মুক্তপ্রান্ত, চেতনাস্রোতে দীর্ঘ ও নমনীয়, নাটকীয় বৈশিষ্টরূপে সংলাপ-স্বগতকথন, চেতনার উল্লম্ফন প্রকাশে juxtaposition প্রভৃতির ব্যবহারে তা দীর্ঘ ও বর্ণনাধর্মী।

নাগরিক জীবনের বিচিত্র দৃশ্যের প্রত্যক্ষণই *রৌদ্র করোটিতে*'তে কবির প্রথম প্রবর্তনা। জীবনকে দেখার বাস্তবসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি কবির চালিকাশক্তি এবং প্রাত্যহিক জীবনের গভীরে যে ছোট-ছোট 'আয়রনি' লুকিয়ে থাকে অথবা সে 'আয়রনি'র ভেতর যে সত্য চাপা পড়ে থাকে, সেগুলোকেই উদ্‌ঘাটন করেন কবি এবং তার প্রকাশে দৈনন্দিন জীবনের শব্দ-ভাষা ও সংলাপকেই ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে ব্যবহার করেন। যেমন 'খেলনার দোকানের সামনে ভিখিরি' কবিতায় যে হাড্ডিসার নোংরা ভিখিরিটি

দোকানির প্রচণ্ড তিরস্কারে লাঞ্ছিত হয়ে টলতে-টলতে চলে যায় উদ্দেশ্যহীন গন্তব্যে, তার নিপতিত, ধ্বস্ত ও স্রস্ত চেতনাকে কবি প্রকাশ করেন নাটকীয়তায়, সংলাপে, স্বগত-কথনে, টুকরো টুকরো কোলাজে, চেতনাপ্রবাহের উল্লম্ফনে—

দূর হ এখান থেকে হা-ভাতে ভিখিরি কোথাকার
আস্তাকুঁড়ে বেছে নে, আস্তানা, নোংরা খুঁটে খা-গে'—
দোকানি খেঁকিয়ে ওঠে। খেলনা ফেলনা নয় জানি,
এখন এখান থেকে, আল্লা, যাব কোন জাহান্নামে।
খেলনা ফেলনা নয়। ফলের বাজার, পুতুলের
স্থির চোখ-পিরের মাজার, হৈ চৈ মানুষের ভিড়,
গাঁয়ের নদীর তীর গুঞ্জরিত বাউলের স্বরে...
গেরস্তপাড়ায় বেশ্যাবৃত্তি, ভালুক বাজায় ব্যান্ড,
খেলনা ফেলনা নয়... বাজনা বাজে, ফলের বাজার,
ফ্রক পরা ফুটফুটে মেয়েটির একটি দু'আনি
হাতের চেটোয় নাচে, কাঁচের আড়ালে দুই যোদ্ধা,
সেপাই রাঙায় চোখ, ভদ্দর পাড়ায় বাজনা বাজে,
'আস্তাকুঁড়ে বেছে নে আস্তানা', খেলনা ফেলনা নয়....
('খেলনার দোকানের সামনে ভিখিরি', *রৌদ্র করোটিতে*)

দোকানির তিরস্কারে লাঞ্ছিত ভিখিরির উদভ্রান্ত চেতনাকে প্রকাশ করতে টুকরো-টুকরো বাক্য ও বাক্যাংশের 'মন্তাজ' নির্মাণ করেন কবি। বাক্যের ছোট-ছোট উল্লম্ফন চরিত্রের ভাবের আনুগত্যে ঐকিক হয়ে ওঠে। ওই স্মৃতি-স্ফূরিত, স্থান-কাল-নির্বিশেষ, যৌক্তিক পারম্পর্য-বিঘ্নিত ভিখিরির চেতন-অবচেতনের ভাবগুলোকে এলোমেলো, পরস্পর সংযোগহীন বাক্য টুকরোর সমন্বয়েই যথাযথভাবে প্রকাশ করা সম্ভব। বিচিত্র শব্দ-ধ্বনির তালগোল পাকানো বিশৃঙ্খলার মধ্যেও দোকানির তিরস্কার ও ভিখিরির উদ্বাস্তু চেতনার পীড়াদায়ক বাক্যানুষঙ্গ—'খেলনা ফ্যালনা নয়', 'খেলনা ফেলনা নয় জানি'—বারবার উচ্চারণের মধ্য দিয়ে নাটকীয় 'আয়রনি' যেমন উত্তুঙ্গ হয়ে ওঠে, তেমনি কবিতায় সঞ্চারিত হয় একটি অন্তর্নিহিত ছন্দস্পন্দন। দিনানুদৈনক জীবনের এইসব অনাবিষ্কৃত 'আয়রনি'গুলোকে উদ্‌ঘাটন এবং প্রান্তিক চরিত্রগুলোর প্রেক্ষণ থেকে সেগুলোর বিচিত্র উপস্থাপনই কবির উদ্দিষ্ট।

শামসুর রাহমান নানা চরিত্রের চেতনাপ্রবাহকে বাক্য-বাক্যাংশের উল্লম্ফন, চিত্রকল্প এবং চরিত্রানুগ শব্দ-ভাষার প্রয়োগে যৌক্তিক শৃঙ্খলায়, বাস্তবোচিতভাবে শিল্পিত করেন। কল্পনার সাথে বুদ্ধিবৃত্তির সম্পর্কে বস্তুজাগতিক আচরণ, অভ্যাস ও চরিত্রের 'অ্যানাটমি'কে প্রায় উপন্যাসোচিতভাবে উন্মোচিত করেন। ফলে, *রৌদ্র করোটিতে*'তে শব্দ-ভাষায় কুহক বা কল্পনার অতিরঞ্জন নেই। বস্তুত,

শামসুর রাহমানের এ কাব্যে বিপর্যস্ত চেতনা নিয়ে 'কাফকার নায়কের' মতই ইতঃস্তত ঘুরে বেড়ায় চরিত্রগুলো, পার্কে, রাজপথে, রুটির দোকানের সামনে কিংবা রকবাজ সন্তদের আড্ডায়। 'শনাক্ত পত্র' কবিতায় শামসুর রাহমান টি.এস.এলিয়টের আলফ্রেড প্রুফ্রকের মত অবদমিত- কাম তিনজন বেকার যুবককে জড়ো করেন, যারা জীবনের 'সূর্যোদয় কখনো দ্যাখেনি বলে' সূর্যাস্তের কাছে ধরনা দেয় প্রতিদিন—জ্বলন্ত সিগারেটে টান দিয়ে অস্তগামী সূর্যের দিকে তাকিয়ে যারা একইরকমভাবে তাদের প্রত্যেকের সার্থকতাহীন জীবনকে উপস্থাপন করে—

'আমার জীবনে সুখ নেই' প্রথম যুবক বলে।
'আমার জীবনে সুখ নেই', বাতাসে দ্বিতীয় স্বর।
নকশা আঁকে হিজিবিজি। চিন্তার কপাটে পড়ে খিল।
'আমার জীবনে সুখ নেই', বলে তৃতীয় কথক।
('শনাক্তপত্র', *রৌদ্র করোটিতে*)

উদ্ধৃতাংশে 'আমার জীবনে সুখ নেই' সংলাপের পুনঃপুনরাবৃত্তি ঐ তিন যুবকের জীবনের আশা ও স্বপ্নহীনতার গভীর অবসাদময়তার শব্দভাষা শোনায়। প্রায় অ্যবসার্ডিটির কাছাকাছি উপনীত তিন যুবক জীবনের অর্থহীনতায় নিমজ্জিত। বিলীয়মান সূর্যাস্তের লালিমার মতই ম্লান থেকে ম্লানতর হয়ে যায় তাদের অবদমিত সত্তায় সঞ্চিত উত্তাপের স্মৃতিও—প্রথমে 'মোটরে দেখা মহিলার ঠোঁটে'র মত তীব্র রক্তিম, অতঃপর ম্লানতর 'রাশেদা ভাবির ঠোঁট এবং সব-শেষে 'উত্তপ্ত সন্ধ্যার গণিকা'র মলিন ঠোঁট কল্পনার সাথে-সাথে। এরপর কবি এক আশ্চর্য শৈলীতে ভাষাকে সম্পূর্ণ যান্ত্রিক করে তোলেন তাঁদের অর্থহীন বেঁচে থাকাকে শব্দায়িত করতে—

প্রথম যুবক দ্যাখে দ্বিতীয়ের চোখে
নেই তার নিজের চোখের মনি, তৃতীয়ের চোখে
সেখানে কাঁপছে মৃদু। দ্বিতীয় কথক দ্যাখে তার
নিজের থ্যাবড়া নাক নিয়েছে প্রথমজন কেড়ে।
হোক না কার্বন কপি পরস্পর, কী-বা আসে যায়
রকবাজ সন্তদের ভিড়ে, ওহে, কী-বা আসে যায়...
প্রাণপণ হেঁকে বলো শূন্যতায় কী-বা আসে যায়!
('শনাক্ত পত্র' , *রৌদ্র করোটিতে*)

এভাবেই কবি ভাষাকে চেতনার অনুরূপ করে তোলেন—শব্দ-ভাষাই জীবনের 'অ্যাবসার্ডিটি' প্রকাশে সমর্থ হয়। চরিত্র-প্রধান এই কবিতাগুলোতে শামসুর রাহমান বয়ানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রেক্ষণ বা দৃষ্টিভঙ্গি ব্যবহার করেছেন। 'পার্কের নিঃসঙ্গ খঞ্জ', 'তিনটি বালক', 'শনাক্তপত্র' কবিতাগুলোতে মূলত কবির সর্বজ্ঞ প্রেক্ষণবিন্দু আরোপিত হলেও 'খেলনার দোকানের সামনে ভিখিরি' কবিতায় ভিখিরির দৃষ্টিকোণ আর কবির প্রেক্ষণ অভিন্ন। কবি ব্যবহার করেন দ্বৈত দৃষ্টিকোণ বা double vision—

উপন্যাসের ক্ষত্রে যাকে বলা হয় স্বাধীন অপ্রত্যক্ষ বয়ানরীতি (free inderect discourse)। দ্বৈত প্রেক্ষণে কবি তাঁর অন্তর্স্বভাবকে সঞ্চালিত করেন প্রথম পুরুষের বক্তব্যে—আলফ্রেড প্রুফ্রকের চেতনায় অনুপ্রবিষ্ট হন টি.এস. এলিয়ট যেমন[৩]—

ডেপুটি হাকিম নই, নই ভবঘুরে কবি;
পথের গোলাম আমি, বুঝেছ হে অলীক হুকুমে
চৈত্ররাতে ফুটপাতে শুই। ঠ্যাং দু'টি একতারা
হয়ে বাজে তারাপুঞ্জে, মর্মরিত স্বপ্নের মহলে
বাউলের কথামৃত স্বপ্নে হয় আমের বউল।
('খেলনার দোকানের সামনে ভিখিরি', *রৌদ্র করোটিতে*)

স্পষ্টতই বোঝা যায়, ভিখিরির বাস্তব জীবনে কবি মিশিয়েছেন কবিত্ব আর কবির জীবনে বাস্তবতা যুগিয়েছে ভিখিরির জীবন এবং দুই জনের ভাবনা ও প্রেক্ষণে তা তৈরি করে গভীর মর্মতলের সাদৃশ্য। মূলত 'রৌদ্র করোটিতে'তে কবির চেতনা ও অভিজ্ঞতার সাথে সাধারণ মানুষের চেতন-অবচেতনলোক অভিন্ন নান্দনিক স্পন্দনে এক হয়ে মিশে থাকে। সমকালের আর্থ সামাজিক-রাজনৈতিক বিষয়ও সংরক্ষিত থাকে কবির চেতনায়। কবি নানা বিচ্ছিন্ন 'টেকনিকে' সেইসব ভাব ও অভিব্যক্তিকে প্রকাশ করেন। বস্তুত, *রৌদ্র করোটিতে*'তে কবির চেতনা ও জনগনের চেতনা দ্বিতল ভবনের মত এক হয়ে জুড়ে থাকে। কবি স্পর্শ করেন সমাজের নিম্নতল থেকে উপরিতল পর্যন্ত। কবি আকাশকে উপমায়িত করেন রাজমিস্ত্রির ছানিপড়া চোখের সাথে, রক্ষিতার যৌবনকে তুলনা করেন কুঞ্চিত মলিন কাপড়ের সাথে আর রাজপথে মোটরের সারির উপমান উৎস হয় গাছের ডালে বসে থাকা পাখির ঝাঁক (যদি ইচ্ছে হয়, *রৌদ্র করোটিতে*)। এভাবেই কবি স্পর্শ করেন 'এভিন্যুয়ের মধ্যরাত্রির স্তব্ধতা' থেকে 'কলোনির জীবন মথিত ঐক্যতান' পর্যন্ত। কবি নিত্যই অভিনব কৌশলে আবিষ্কার করেন নাগরিক জীবনে পূর্ণিমার চাঁদ আর খেঁকি কুকুর, চিমনির ধোঁয়া ও রজনীগন্ধ্যার সম্পর্ক রহস্য। মুদ্রার মত জনাকীর্ণ এই নগরীতে কবি নিজেই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিনিধি হয়ে অনুভব করেছেন—'একটি প্রখর পাখি ঠুকরে ফেলে দেয় অবিরত পোকা খাওয়া মূল্যবোধ'। স্বপ্ন ও মৃতকল্প জীবনের বৈচিত্র্য কবি খণ্ড-খণ্ড চিত্রে, ছোট ছোট বাক্যাংশে, সংলাপে, কমায়-সেমিকোলনে জোড়া দিয়ে দিয়ে প্রকাশ করেন—নির্মাণ করেন ছুঁচোর কেত্তন'ভরা জীবনের বিচিত্র কোলাজ—

যদি মুখ আদপেই খুলি বলবো কি এপ্রিলের
উত্তপ্ত হাওয়ায় ঘেমে ঘেমে রোজ হচ্ছি নাজেহাল,
ব্লাউজ পিসটা চমৎকার... তোমাকে মানাবে ভালো
পরো যদি খয়েরি শাড়ির সঙ্গে অথবা হানিফ
করেছে সেঞ্চুরি ফের, দালাইলামার আত্মজীবনীতে কত

ঘটনার সমাহার ; বলব কি চলো যাই কফি খাই
হাল ফ্যাসনের কিছু বই পড়া চাই
নইলে লাফাবে তুমি এঁদো ডোবা, কুয়োর ভেতরে।
('ছুঁচোর কেত্তন', *রৌদ্র করোটিতে*)

বৈচিত্র্যপূর্ণ এমনকি বিপরীতার্থক শব্দ পাশাপাশি বসিয়ে শব্দের উল্লম্ফনে মধ্যবিত্ত জীবন-বাস্তবতার কূটাভাস প্রকাশ করেন কবি। অভ্যাসবিদ্ধ নাগরিক জীবনের গতি ও ছন্দকে প্রকাশের জন্য কবি শব্দের পর শব্দ জুড়ে যে নতুন 'টেকনিক'টি ব্যবহার করেন, সেই রীতিটিই কবিতার ভাবকে প্রকাশ করে। সে ক্ষেত্রে শব্দ-ভাষার কৌশলই ভাবের সংগঠণে মূল ভূমিকা পালন করে। নাগরিক জীবনের ঊর্ধ্বশ্বাস ব্যস্ততা ও হঠাৎ থমকে যাওয়া, গতি ও ক্লান্তি, আশা ও নৈরাশ্যের জটিল মনস্তাত্ত্বিক রূপটি কবি প্রকাশ করেন শব্দ-ভাষার কূটাভাসে—

শয্যাত্যাগ, প্রাতরাশ, বাস, ছ'ঘন্টার কাজ, আড্ডা,
খাদ্য, প্রেম, ঘুম, জাগরণ; সোমবার এবং মঙ্গলবার
বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি আর রবিবার একই
বৃত্তে আবর্তিত আর আকাশ তো মস্ত একটা গর্ত—
সেখানে ঢুকব নেংটি ইঁদুরের মতো। থরথর
হৃদয়ে প্রতীক্ষা করি, স্বপ্ন দেখি আগামীকালের
সারাক্ষণ, অনেক আগামীকল্য উজিয়ে দেখেছি
তবু থাকে আরেক আগামী কাল। সহসা আয়নায়
নিজের ছায়াকে দেখি একদিন—উত্তীর্ণ তিরিশ।
('আত্মহত্যার আগে', *রৌদ্র করোটিতে*)

উদ্ধৃতাংশের শুরুতে কবিতায় যে গতি সঞ্চারিত হয়, শেষ উল্লম্ফনকৃত বাক্যটি—'সহসা আয়নায় নিজের ছায়াকে দেখি একদিন—উত্তীর্ণ তিরিশ''—সে গতিকে থামিয়ে দিয়ে আপাতভাবে যতি পতন ঘটায় এবং জীবনকে এক অমোঘ বাস্তবতার মুখোমুখি করে তোলে। এভাবেই চলমান জীবনের মধ্যেই গভীর 'প্যারাডক্সে'র উপলব্ধিকে জাগিয়ে তোলেন কবি। কোনো প্রতিষ্ঠিত জীবন-দর্শন থেকে কবি তা করেন না বরং দৈনন্দিন জীবনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার শব্দ-ভাষাকেই কৌশলে সাজিয়ে এই আপাতবিরোধী জীবনের ভাষা-চিত্র অঙ্কন করেন। শামসুর রাহমানের *রৌদ্র করোটিতে*'তে এভাবেই ভাব শব্দের অনুযাত্রী হয়ে ওঠে—শব্দই কবিতার ভাব নির্মাণ করে। প্রথাগত কবিতায়, এমনকি রাহমানের প্রথম কাব্যে কবির প্রস্তুতকৃত ভাবকে শব্দমালা সাজিয়ে উপস্থাপন করেছেন কবি—শব্দ সেখানে ভাবনার অনুগত হয়েছে বলেই প্রাত্যহিক জীবনে ব্যবহৃত নৈমিত্তিক শব্দের সাথে তার ভেদ ছিল—কবির শব্দ ছিল সুনির্বাচিত, বহুলাংশে কাব্যিক কিন্তু *রৌদ্র করোটিতে*'তে মূলত শব্দই কবিতার ভাবকে নির্মাণ করে বলে বহির্জগত অর্থাৎ, কবির নগর ঢাকার জীবন আর কবিতার মধ্যে যোগাযোগের প্রধান দায়িত্বও নেয় শব্দই। ফলে, *রৌদ্র করোটিতে*'র শব্দ কবিতার দূরান্বয়কে লাঘব

করে—কাব্যিক শব্দ-ভাষার ধার ধারে না এবং অলংকারময়তাকেও অগ্রাহ্য করে। শামসুর রাহমানের শব্দ-ব্যবহারের এই জড়তামুক্তি অগ্রজ আধুনিক কবিদের শব্দপ্রয়োগের অতি সচেতনতার সাথে সুস্পষ্ট প্রভেদ তৈরি করে। *রৌদ্র করোটিতে*'তে কেবল নাগরিক জীবনের প্রাত্যহিক ভাষাই (ordinery speech) নয়, তার কথনভঙ্গিটিকে পর্যন্ত কবি প্রয়োগ করেন কাব্যে। সামাজিক শব্দ-ভাষার প্রয়োগে ভাবকে প্রসারিত করার এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় ভাষার naturalisation, কারণ, এ পদ্ধতিতে কবিতার ভাষা সমস্ত জড়তা ও কৃত্রিমতা পরিহার করে স্বভাবী হয়ে ওঠে—কবিত্বকে গৌণ করে প্রাত্যহিক ও প্রায়োগিক হয়ে ওঠে। মূলত এও এক নতুন ধরনের, সময়োচিত কবিত্ব—

> This critical process I shall call Ônaturalisation' an attempt to reduce the strangeness of poetic organisation by making it intelligible, by making the Artifice appear natural. (Riley, 1992: 223)

ভাষার এ স্বাভাবিকীকরণ মূলত বহুজটিল, নানা স্তরিক, ছদ্মবেশী, প্রসাধিত, বাহারী ঠাটের নাগরিক জীবনের যথার্থ শব্দ-ভাষা। *রৌদ্র করোটিতে*'তে কবিতার প্রচলিত কাঠামোকল্পকে ভেঙে দিয়ে উপমা-চিত্রকল্পকে কবি খুলে খুলে দেখিয়েছেন এবং সেগুলোকে কোনো ব্যঞ্জনার মহিমা দান করার পরিবর্তে সাধারণভাবে উপস্থাপন করেছেন—কবিতা যেন এমন কোনো 'ম্যাকানিজম', যা খণ্ড-খণ্ড অংশ জুড়ে পূর্ণতা পায়। নিম্নোক্ত দৃষ্টান্তে দু'টি চিত্রকল্প দ্রবীভূত হয়ে যায় কবির বর্ণনায়—

> চেয়ে দ্যাখে প্রায়-নেভা
> আকাশে সূর্যের স্টোভ—সূর্যাস্তের রং দেখে তার
> মনে পড়ে হঠাৎ মোটরে দেখা মহিলার ঠোঁট।
> ('শনাক্ত পত্র', *রৌদ্র করোটিতে)*

উদ্ধৃতাংশে সূর্যের নিভন্ত রঙ অনায়াসে উপমিত হতে পারতো 'স্টোভে'র সাথে কিংবা সূর্যাস্তের রঙ তুলনীয় হতে পারতো 'মোটরে দেখা মহিলার ঠোঁটে'র সাথে—হয়েছেও তাই কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে নয়। *রৌদ্র করোটিতে* থেকেই সচেতনভাবে কবি উপমা-চিত্রকল্পকে ভেঙে দিয়ে ভাষায় সেগুলোকে সাধারণীকরণ করেন—কবিতার অলংকার সম্ভাবনাকে নস্যাৎ করেন। মৌল চিত্রকল্পকে ভেঙে দিয়ে শব্দ-ভাষায় মিশিয়ে দেয়ার এই প্রবণতা ত্রিশোত্তর কবিতার স্থাপত্যধর্মী ভাষা থেকে তাঁর ভাষাকে পৃথক করে দেয়। এই লক্ষণটিই তাঁর পরবর্তীকালের কবিতায় ব্যপকভাবে 'ইমেজারি' সৃষ্টির প্রবণতা তৈরি করে। একইভাবে, *রৌদ্র করোটিতে*'তে শব্দের ব্যঞ্জনাময় দুরধিগম্য সত্তাকে উপেক্ষা করে কেবল বাচ্যার্থকেই অবলম্বন করেছেন—যেন বর্ণনাই কবিত্ব—কবিতা রচনা যেন একটি বাহ্যদেশীয় বিষয়—জীবন যেমন চলে কবিতাও যেন ঠিক অনুরূপ ছন্দে চলে। *রৌদ্র করোটিতে*'তে তাই শামসুর

রাহমানের ভাষা প্রধানত নির্মেদ, সাবলীল, প্রত্যক্ষ ও অপ্রতিসারী। কবি প্রত্যক্ষ জগতের সত্য-মিথ্যাকে যেভাবে পর্যবেক্ষণ করেন, সেইসব দিনানুদৈনিক চিত্রকে ব্যাখ্যা করেন এবং মস্তিষ্কে সেগুলোর সমগ্রতা সাধন করেন, অবিকল সেইভাবেই কবিতায় প্রকাশ করেন Ordinery Speech এ। তবে, ভাষা সাধারণ এবং প্রকাশভঙ্গি অনাড়ম্বর বলে সেগুলো যন্ত্রচালিত কবিতা নয়। শব্দ-ভাষাকে তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে আটপৌরে করে তোলেন—ছেঁটে দেন চিত্রকল্প-উপমা-উৎপ্রেক্ষা। যে সব 'কংক্রিট' উপমা বা উৎপ্রেক্ষা ব্যবহার করেন, সেগুলোও যেন বাচ্যার্থের অতিরিক্ত কোনো অনুভব না যোগায়, সে বিষয়ে সতর্ক থাকেন কবি। যেমন—

ক. দাড়ি না-কামানো
মুখের মতন দিন সত্য—সত্য সবি।
('ছুঁচোর কেত্তন', *রৌদ্র করোটিতে*)

খ. সহানুভূতির মতো সবুজ সবজির প্রয়োজনে দর কষে,
রুটির মতোই জীবনকে ধ্রুব জানে
('যখন রবীন্দ্রনাথ', *রৌদ্র করোটিতে*)

গ. অলক্ষ্যে গড়িয়ে পড়ে মাছের ঝোলের মতো জোৎস্না
('আত্মহত্যার আগে', *রৌদ্র করোটিতে*)

ঘ. দেখতে চায়
বয়স্কের তোবড়ানো গালের মতন অতীতের
ধ্বসে কয়েকটি ক্লান্ত নর্তকী ঘুঙুর নিয়ে করে
নাড়াচাড়া
('রৌদ্র করোটিতে', *রৌদ্র করোটিতে*)

চিত্রকল্পগুলোতে রহস্যের আবরণ নেই; ধূ-ধূ প্রান্তরের মত প্রকাশ্য। উপমাগুলো জীবনেরই অনুরূপ—কোনো বাড়তি অলংকরণের উদ্যোগ নেই কবির। মূলত, সব কালেই কবিদের মূল লক্ষ্য থাকে তাঁদের কবিতার শব্দ-ভাষার সাথে সমকালীন জন-মানসের সমন্বিত ভাষার গভীর ঐক্য সাধন। কিন্তু, বাংলা কবিতায় ত্রিশোত্তর পর্বে জনতার ভাষার সাথে কবির ভাষার যে দূরান্বয় সাধিত হয়, শামসুর রাহমান সেই দেয়ালটিকে অপসারণ করেন এবং কেবল সমাজ-মানসের সাথে তাঁর কবিতার শব্দ-ভাষার যোগাযোগ সাধনই করেন না, বরং সেই ভাষার স্বতঃস্ফূর্ত ছন্দবোধকেও কবিতার অন্তর্ভুক্ত করেন। কবিতার কিছু কৌশল, শব্দ-ভাষার কিছু অলংকার এবং মূলত প্রবহমান অক্ষরবৃত্ত ছন্দকে অবলম্বন করলেও নগর ঢাকার দিনানুদৈনিক জীবনের ওই শব্দ-ভাষা ও ছন্দই সাবলীলভাবে নির্মাণ করে কবির শব্দ-ভাষার এই নতুন চেতনাকে, প্রকাশের নতুন ধরনকে, যা বাংলা কবিতায় একান্ত রাহমানীয় বলে মেনে নিতে আর কোনো দ্বিধা থাকে না। কবি যখন সরাসরি ক্রিয়াপদ ব্যবহার করে

একজন নাগরিক মধ্যবিত্তের কথনভঙ্গিতে বলে ওঠেন—জানি এই ভিড় ঠেলে, ঢিলে-ঢালা শস্তা সুট প'রে / রাস্তার দাম্ভিক শত বিজ্ঞাপন প'ড়ে, পুঁইশাক / ডাঁটার চচ্চড়ি,/ নিরীহ মাছের ঝোলে ডুবিয়ে জীবন/ থাকব, বাঁচব আমি দিনের চিৎকারে/ রাত্রির করুণ স্তব্ধতায় (অস্তিত্বের তন্ময় দেয়ালে, *রৌদ্র করোটিতে*), তখন সমাজ-মানসের সাথে তাঁর কবিতার ভাষা-জগতের কোনো দেয়াল থাকে না আর। এই বিশেষ রীতিই রাহমানীয় কবিতার স্বাতন্ত্র্যের মূল রহস্য।

রৌদ্র করোটিতে'তে শামসুর রাহমান সামাজিক জীবনের ভাষা ব্যবহার করে যেমন নাগরিক জীবনের উপরিতল ও সমাজ-মানসকে চিত্রিত করেন, তেমনি জটিল, সম্প্রকাশ-স্বভাবী কিছু চিত্রকল্পে দুঃস্বপ্ন-তাড়িত আধুনিক ব্যক্তি-চেতনার রূপায়ণ ঘটান। আধুনিক মানুষের অবচেতনার উল্লম্ফনকে কবি প্রকাশ করেন দুঃস্বপ্নের অনুভূতির মতই টুকরো টুকরো বাক্য জোড়া দিয়ে কিউবিক পদ্ধতিতে—কবি তার নাম দেন 'খুপরির গান'—

বমির নোংরায় ভাসে মেঝে, রুটির বাদামি টুকরো
চড়ুই পালালো নিয়ে। তাকান না কখনো বাইরে...
ঘরে জানালা নেই...হলুদ যেসাস বিদ্ধ কড়িকাঠে...
রৌদ্র ঝলসিত কাক ওড়ে মত্ত রক্তে কাঠফাটা
আত্মার প্রান্তরে। সারারাত

অনিদ্রা দুঃস্বপ্ন আর
ছারপোকা, ছিদ্রান্বেষী ইঁদুরের উৎপাত উজিয়ে
ময়লা চাদর ছেড়ে উঠি ফের মাথাব্যাথা নিয়ে।
('খুপরির গান', *রৌদ্র করোটিতে*)

কবির অবচেতনের শব্দ-ভাষায় অন্যান্য অনুষঙ্গের সাথে এলেমেলোভাবে জুড়ে থাকে কালো কাক উড়ে আসা ভ্যানঘগের হলুদ গম ক্ষেত, সূর্যমুখী কিংবা জীর্ণ বুটজুতোর চিত্র, অথবা তাঁর বন্ধু গ্যাঁগার আঁকা ক্রুশবিদ্ধ হলুদ যেসাসের ছবি। চিত্রকলা শামসুর রাহমানের কবিতার পরিচিত অনুষঙ্গ। বিভিন্ন পর্যায়ের কাব্যে বারবার নানাভাবে তিনি বিভিন্ন চিত্রকলার উল্লিখন ব্যবহার করেন। কারণ, কবির মগ্ন চেতনায় সঞ্চিত থাকে 'গলির অন্ধ বেহালাবাদক', ব্যাকের সুস্থির মাছ, সেঁজার আপেল' (আত্ম প্রতিকৃতি, *রৌদ্র করোটিতে*)। হিংস্র সব চিত্রকল্প কবিকে প্রহার করে তন্দ্রার ভেতর। শুভ্রতাকে ছিঁড়ে ফেলে কবির দুঃস্বপ্নে পাখা ঝাপটায় ঢাউস বাদুড়। সূর্য অপসৃত হয়ে মিলিয়ে যায় অন্ধকারে। *রৌদ্র করোটিতে*'তে কবি তাঁর দুঃস্বপ্নকে মুক্ত করেন জটিল দুর্বোধ্য, অতিপ্রাকৃত, অতীন্দ্রিয় চিত্রকল্পে—অধুনা উত্তরাধুনিক কবিরা যেমন 'হাইপাররিয়ালিটি'তে[৪] বাস্তবের অতিরেক ঘটান তাঁদের কবিতায়—

ডানপিটে সূর্যটাও সহসা উধাও অন্ধকার
বনে ; নিশাচর চাঁদের প্রসন্ন মুখে পাখা
ঝাপটায় ঢাউস বাদুড়, ছিঁড়ে ফেলে শুভ্রতাকে।

কখনো দেখবো স্বপ্ন—কয়েকটি জলদস্যু যেন
অবলীলাক্রমেকাটা মুণ্ডুর চামড়া নিচ্ছে তুলে
অব্যর্থ ছোরার হিংস্রতায়, গড়ায় মদের পিপে
রক্তিমবালিতে আর বর্বর উল্লাসে চতুর্দিকে
কম্পিত পাতার মতো শব্দের ধমকে। কখনোবা
হঠাৎ দেখব জেগে শুয়ে আছি হাত-পা ছড়ানো
বিকেলের সাথে নামহীন কবরের হলদে ঘাসে,
দেখব অঢেল রৌদ্র ঝলসে উঠে ঝরায় চুম্বন
ওষ্ঠহীন করোটিতে।

('রৌদ্র করোটিতে', *রৌদ্র করোটিতে*)

রৌদ্র করোটিতে'তে শামসুর রাহমান একদিকে 'মর্ডানিস্ট' কবিদের ভাষার সচেতন অলংকরণ, স্থাপত্যধর্মিতা, কৃত্রিম দুরূহতা, জনসংযোগবিচ্ছিন্ন আত্মময় অহংচেতনার বৈশিষ্ট্যগুলো সচেতনভাবে এড়িয়ে গেছেন এবং সামাজিক জীবনের অভিজ্ঞানকে ধারণ করে কবিতাকে করে তুলেছেন যথাসম্ভব 'অবজেক্টিভ', অপরদিকে নিজের চেতন-অবচেতনের দুরূহ, জটিল চিত্রমালাকে ব্যক্ত করতে কখনো-কখনো অবলম্বন করেছেন অসম্ভব-চিত্রকল্পের কল্পিত জগৎ সৃষ্টির স্বাধীনতাকেও।

রৌদ্র করোটিতে'র আরেকটি অসাধারণ কবিতা, যেখানে কবি প্রতীকবাদী কবিদের মত সুরকে সৌরভের ন্যায় ছড়িয়ে দেন নাগরিক ব্যস্ততায়, ক্লেদে-ক্লিন্নতায়-স্নিগ্ধতায়, জড় ও জীবে, এমনকি 'কুষ্ঠরোগীর ক্ষতের পিছল রসে'। 'দুপুরে মাউথ অর্গান' কবিতায় এক উন্মত্ত বালকের মাউথ অর্গানের সুর ছড়িয়ে যায় নগরীর দালানে, এভিন্যুয়ের ফুটপাতে, ব্যস্ত রাস্তায়, সাধারণ মানুষের মগজের কোষে-কোষে। ট্রাফিক চমকে তাকায়, গাড়িগুলো হরিণের মত থেমে উৎকীর্ণ হয়, বালকটিও উধাও হয় কিন্তু মাউথ অর্গানের সুর ঝঙ্কৃত হয় বাতাসে। সে সুর ছড়িয়ে পড়ে 'ত্রিতল দালানে', 'রং মাখা ক্লান্ত ঠোঁটে', নিঃশেষিত ফলের ঝুড়িতে, 'বিট পুলিশের নিষ্প্রাণ শাদায়', 'মোটরের মসৃণ শরীরে', ব্যাংকের দেয়ালে, পরিত্যক্ত বাদামের খোসায়, পকেটমারের ক্ষিপ্র আঙ্গুলে, গুণ্ডার টেড়িতে, ফেরিওয়ালার কণ্ঠে এবং অবশেষে 'কুষ্ঠ রোগীর ক্ষতের পিছল রসে'। সুর যেন আশ্বাস হয়ে সঞ্চারিত হয় এইসব সজীব, নির্জীব কিংবা যন্ত্রচালিত অনুষঙ্গে—

কুষ্ঠরোগী দ্যাখে তারও ক্ষতের পিছল রসে ঝরে
মত্ত বালকের অর্গানের সুর : ভাবে এই সুর
পারে না গড়াতে তার গলিত শরীরে ভাঁজে ভাঁজে

আবার নতুন মাংস শিল্পের অলীক রসায়নে?
হতে কি পারে না তার বিনষ্ট শরীর ওই দূর
আকাশের পাখিদের মতো ফের সহজ সুন্দর?
('দুপুরে মাউথ অর্গান', *রৌদ্র করোটিতে*)

শামসুর রাহমান মুক্তক মাত্রবৃত্ত, প্রবহমান অক্ষরবৃত্ত ছাড়াও 'রৌদ্র করোটিতে'তে সমমাত্রিক পর্বের ছন্দে কিছু কবিতা লিখেছেন। সমিল মাত্রাবৃত্ত ছন্দে ছড়ার মত এই কবিতাগুলোতে কবি চারপাশের নানা অসঙ্গতিকে রূপান্বিত করেছেন লঘু মাত্রায়। রূপক, প্রতীক, ব্যাজস্তুতিতে কবিতাগুলোর ভাষা ব্যঙ্গপ্রবণ ও আয়রনি-প্রবল। যেমন:

ভালুকের কড়া দাপটে ঈগল
ক্ষুব্ধ চিত্তে ঝাপটায় ডানা,
সামনে সামনে কোলাকুলি তাই
বিমূঢ় সিংহ খাচ্ছে বিষম।
('নরমুণ্ডের নৃত্যে', *রৌদ্র করোটিতে)*

এইসব অসঙ্গতির ভেতর নিজের জৈবিক আনুগত্য ও দাসত্ব নিয়ে বেঁচে থাকা মধ্যবিত্ত কবি 'মেষে'র প্রতিরূপকে নিজেই নিজেকে উপহাস করেন 'মেষতন্ত্র' কবিতায়। চারপাশের অসঙ্গতিকে রূপক, প্রতীক, ব্যাজস্তুতি, ব্যঙ্গ, আয়রনি দিয়ে উপস্থাপনের এই স্বভাবটি কবির অব্যবহিত পরের কাব্যে আরো গভীর ও প্রকটরূপে উপস্থাপিত হয় রূপক ও প্রতীকায়নের নানা নিরীক্ষায়।

রৌদ্র করোটিতে থেকে *বিধ্বস্ত নীলিমা* কাব্য প্রকাশের কালগত ব্যবধান চার বছর। ১৯৬৭ সালে প্রকাশিত হয় *বিধ্বস্ত নীলিমা*। ষাটের দশকের এক ক্রান্তিকালে কবি রচনা করেন এই কাব্যের কবিতাগুলো। কবি নিজেই বলেন—'পিকাসোর গার্নিকা ম্যুরাল মনে পড়ে—/ ক্রুদ্ধ সেই ঘোড়াটার আর্তনাদ যেন আমাদের কাল' (বামনের দেশে, *বিধ্বস্ত নীলিমা*)। প্রকৃতই ষাটের দশক সব মিলে এক সংক্রান্তির কাল। বিশ্বব্যাপী গুরুত্বপূর্ণ সব মতবাদের ভাঙন, পুঁজিবাদের উত্থান, নানা রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক নৈরাজ্য, কবিতার ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য আধুনিক কবিদের প্রস্থান ও বিশৃঙ্খল সময়ের জতুগৃহে জন্ম নেয়া অন্ধ-স্বাধীনতায় বিশ্বাসী 'বীট' ও 'অ্যাংরি' কবিদের নতুন কাব্য জিজ্ঞাসা, পশ্চিমবঙ্গে এই 'বিট' কবিদেরই আদর্শের উত্তরসুরী 'হাংরি জেনারেশনে'র জন্ম এবং একই ধারায় বাংলাদেশে 'স্যাড জেনারেশনের' উত্থান এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পূর্ববঙ্গে আইয়ুবী স্বৈরশাসনের প্রতাপ প্রভৃতি ঘটনায় ষাটের দশক প্রকৃতই এক উত্তাল সময়-খণ্ড। 'বিট', 'অ্যাংরি' ও 'হাংরি' কবিদের মত ষাটের দশকের বাংলাদেশী 'স্যাড কবিরাও নৈরাজ্য, হতাশা, অবক্ষয় ও যৌনতাকে তঁদের কবি-জীবনের আদর্শরূপে

গণ্য করেন—অগ্রজ কবিদের অস্বীকার করে, কবিতার প্রচলিত প্রথাকে ভেঙে লাগামহীন পঙ্‌ক্তি রচনায় উদ্বুদ্ধ হন (জুলফিকার, ২০১৩: ১৯১)। কবি এক নতুন বাস্তবতার সাক্ষী হন—'পরিবর্তনের ঘোড়া'কে তিনি ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে যেতে দেখে প্রমাদ গোনেন। প্রতিনিয়ত শিল্প-নিষ্ঠা ও শিল্পের কল্যাণ কামনা বুকে নিয়ে কবি কালরূপী ক্ষুধার্ত 'ব্যাঘ্রে'র বিশাল গ্রাসে সবকিছু বিলীন হতে দেখে কবি আর্তনাদ করেন—মহত্ত্ব, কল্যাণ, সুন্দরকে চোখের সামনে বিনষ্ট হতে দেখে আক্ষেপ করেন—

অন্ধকার জীবনের বাগানে নিগ্রোর মতো শুধু
আর্তনাদ ক'রে ওঠে, মহত্ত্ব পিছল নর্দমায়
ভেসে যায়, সৌন্দর্য কবরে পচে, সত্য অবিরাম
উদ্ভ্রান্ত ভিখিরি হয়ে ঘোরে মনীষার মন্বন্তরে।
('ঘৃণায় নয়', *বিধ্বস্ত নীলিমা*)

বিশ্বব্যাপী কবিতার এই পালাবদলকে কবি সে সময় সংশয়ের চোখে দেখেছিলেন, যদিও সত্তরের দশকে দৈশিক প্রেরণায় সাড়া দিয়ে কবি নিজেই প্রভাবিত হয়েছিলেন ষাটের দশকের লিভারপুল কবিদের কবিতা দ্বারা। কিন্তু সমস্ত প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধ, দর্শন ও নান্দনিকতার এমন আকস্মিক পতনে কবি হতবিহ্বল হয়ে যান। কবি নিজে অমরত্বে বিশ্বাসী নন এবং অগ্রজ কবিদের কাব্যে একান্ত নিষ্ঠাবান নন। কবি জানেন যে তিনি নিজেও সময়ের চোয়ালে বিদ্ধ এক প্রাণ। তিনি স্বীকার করেন যে, অক্লান্ত শ্রমে, প্রজ্ঞায় তাঁর অগ্রজেরা কবিতার যে সুরম্য প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন, তার খিলান, গম্বুজে আর সিংহ-দরজায় আজ শ্যাওলা জমেছে আর তাঁদের বিধ্বস্ত ভাঁড়ার ঘর আরশোলা ও ইঁদুর উপদ্রুত। কবি নিজেও আর তাঁদের 'বাতিল পুরাণে' আস্থাবান নন বলে সশ্রদ্ধ চিত্তে ক্ষমাপ্রার্থী। কিন্তু নতুন কালে নতুন কবিদের চোখে কবি কোনো স্থির, নতুন শিল্প-প্রত্যয় না দেখে ভীষণ উৎকণ্ঠিত হন। কবি রূপক-প্রতীকে কালের সেই অস্থির সন্ধিক্ষণকে চিত্রিত করেন—

আরও গাঢ় অন্ধকার ভিজিয়ে শরীর পেঁচা, কাক
অথবা বাদুড় আসে শুন্য কক্ষে বিশাল প্রাসাদে
উত্তরাধিকারী খোঁজে, কিন্তু কিছুতেই কোনোখানে
মানবের কণ্ঠস্বর হয় না ধ্বনিত। অলিন্দের
অন্ধকারে ওড়ে শুধু কয়েকটি দারুণ অস্থির
চামচিকে। লেপটে থাকে দুর্বোধ্য আতঙ্ক স্তব্ধতায়।
('পুরাণ', *বিধ্বস্ত নীলিমা*)

এখানে উত্তরাধিকারীদের খোঁজে উড়ে আসা পেঁচা, কাক, বাদুড় অগ্রজ আধুনিক কবিদের প্রতীক এবং আতঙ্কগ্রস্ত 'দারুণ অস্থির চামচিকে'গুলো তাদের দ্বিধাগ্রস্ত, ক্ষীণকায় অনুজদের প্রতীক। এভাবেই কবি পরিত্যক্ত প্রাসাদের প্রতিরূপকে উপস্থাপন করেন শিল্পের অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যত। শামসুর রাহমান

যদিও জীবন ভাবনা ও কবিতার নান্দনিকতায় রূপান্তরশীল ও ক্রমাগ্রসর এবং সমকালের বৈশ্বিক ও দৈশিক নান্দনিকতার প্রতি সূক্ষ্ম ধাপ সম্পর্কে সর্বদাই সচেতন, তবু পুরনো কাল ও পুরনো নান্দনিকতার প্রতি সহানুভূতি ও কৃতজ্ঞতা বরাবরই বিভিন্নভাবে প্রকাশ পায় তাঁর কাব্যে। ত্রিকালকে বিন্দুবদ্ধ করে নতুনত্বের উপলব্ধিই শামসুর রাহমানের নান্দনিক প্রত্যয়। সময় ও শিল্পের পরিকল্পনাকে তিনি একটি শক্ত ভিতের উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিস্থাপন করতে চান। তিনি লঘুমতি নন, শ্লথ চলায় বিশ্বাসী নন—হঠাৎ মুগ্ধ হয়ে কোনো সহজ সিধ্বান্তে না এসে ধীরে-সুস্থে গড়তে চান শিল্পের নতুন বাগান। 'কিমাকার জন্তুর কঙ্কালে'র মত পড়ে থাকা অতীত ও তার কীর্তি এবং অপচয়ের অবশেষকে বুকে নিয়ে হাজার হাজার ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দকে পেছনে ফেলে কবি ও তাঁর কতিপয় সহযাত্রী বন্ধুরা প্রচণ্ড নিষ্ঠায় শিল্পের এক নতুন বাগান গড়ার স্বপ্ন দেখেন। চেতনপুরের সে বাগান কবির স্বপ্নে রূপকমণ্ডিত—

> আমাদের রমণী মুখে ফুলের স্তবকগুলি
> মেলুক আরক্ত ডানা, আমাদের শিশুর মুখে
> দয়ালু বাতাস দিক চুমু ঘন ঘন' ফুল বাগানের ডাল
> মাতাল কবিকে দিক কবিতার পঙ্‌ক্তি উপহার।
>
> এবং সেসব ডালে বিষ পিঁপড়েরা কখনো সদলবলে
> বাঁধতে না পারে যেন বাসা;
> ('সম্পাদক সমীপেষু', *বিধ্বস্ত নীলিমা*)

প্রতিরূপকের মাধ্যমেই কবি একটি নতুন ভুবন সৃষ্টি করতে পারেন। 'অপোগণ্ড পোকা'দের হাত থেকে অবশিষ্ট রূপকগুলো রক্ষা করার ইচ্ছায়, বাছা উপমা-প্রতীক-চিত্রকল্প নিয়ে, সাধের বাগানকে 'বিষ পিঁপড়া'র উৎপাত থেকে বাঁচাতে কবি ও তাঁর সহযাত্রী বন্ধুরা যেন তিনটি টগবগে প্রত্যয়ী ঘোড়ার প্রতীকে শক্তি ও সাহস নিয়ে ছুটে যেতে চায় নান্দনিকতার নতুন তীর্থে, ত্রিকালকে শিল্পে বিন্দুবদ্ধ করতে।

বাংলা কবিতায় 'রাহমানের চিড়িয়াখানা'য় অন্যান্য প্রাণীর সাথে বিচিত্র সব ঘোড়া নানা প্রতীতিতে বিচরণ করে (আশরাফ, ১৯৯৪: ৪৯) । *বিধ্বস্ত নীলিমা*'য় 'ঘোড়ার প্রতীক বারবার বিভিন্ন অনুষঙ্গে এমনকি বিপরীত অনুষঙ্গে ব্যবহার করেন কবি। শামসুর রাহমানের কল্পনায় কবিতাজগৎ নানা রকম ঘোড়ার ক্ষুরধ্বনিতে সরব। 'কোনো অশ্বারোহী' কবিতায় কবি পুরনো কবিদের ট্রাজেডিকে প্রতীকান্বিত করেন ডুয়েলের কালের অশ্বারোহীদের কালাবসানের মধ্য দিয়ে। কবি বলেন 'ডুয়েলে'র দিন শেষে আজ এই নতুন কালে সেই সব অশ্বারোহী, যাঁরা একদিন জবরজং বর্ম পরে, তলোয়ার

উঁচিয়ে ড্রাগনের পেছনে ধাওয়া করেছে প্রবল বীরত্বে, সেই সব কবিদের কাল আজ অবসিত ('কোনো অশ্বারোহীকে', *বিধ্বস্ত নীলিমা*)। 'জনৈক সহিসের ছেলে বলেছে' কবিতায় অশ্বগতপ্রাণ সহিস পিতার প্রতীকে কবি বিগত কালের হৃত-ঐশ্বর্য আর মুমূর্ষু স্বপ্ন-সাধ বুকে নিয়ে মৃতকল্পরূপে বেঁচে থাকা পূর্বসূরীকেই প্রতীকান্বিত করেছেন আর আকাশে 'ঘোড়ার নালে'র মত চাঁদ উঠতে দেখে সেই অতীতের প্রতি দয়ার্দ্র অথচ করুণায় অপারগ 'সহিসের ছেলে'র প্রতীকে কবি নিজেই হয়ে ওঠেন সমকালের প্রতিনিধি—

কখনো মুমূর্ষু পিতা ঘোড়ার উজ্জ্বল পিঠ ভেবে
সস্নেহে বুলোন হাত অততির বিস্মৃত শরীরে।
মাঝে-মাঝে গভীর রাত্তিরে
দেখেন অদ্ভুত স্বপ্ন : কে এক কৃষ্ণাঙ্গ ঘোড়া উড়িয়ে কেশর
পেরিয়ে সুদূর
আগুন রঙের মাঠ তাকে নিতে আসে।

অথচ আমার স্বপ্নে রহস্যজনক ঘোড়া নয়,
কতিপয় চিমনি, টালি, ছাদ, যন্ত্রপাতি, ফ্যাক্টরির
ধোঁয়ার আড়ালে ওড়া পায়রার ঝাঁক
('জনৈক সহিসের ছেলে বলেছে', *বিধ্বস্ত নীলিমা)*

স্পষ্টতই বোঝা যায়, যে ভূতকালকে কবি ঘোড়ার প্রতীকে উপস্থাপন করেন। কবির শৈশব স্মৃতির অনপনেয় অনুষঙ্গ—পুরনো ঢাকার রুগ্ন ঘোড়া ও সহিস বারবার তাঁর কবিতায় ফিরে আসে মূলত প্রস্থানপর সময়ের প্রতীকরূপে। আখতারুজ্জামান ইলিয়াস যথার্থই বলেছেন—'' আস্তাবলের হাড়জিরজিরে ঘোড়া ও ঘোড়ার সহিস শামসুর রাহমানের কবিতায় আসে সময়ের বদলের কথা বলতে। আর স্মৃতির শহর-এ এসে দেখি যে সাতরওজার সেই ঘোড়াগুলো এবং তাদের সঙ্গী হাড্ডিসার লোকটি হয়ে উঠেছে হিরো (আখতারুজ্জামান, ২০০২: ৭)। প্রকৃতই সেই ঘোড়াগাড়ি, ঘোড়ার আস্তাবল, সহিস, সেই সন্ধ্যার বাতিওয়ালা, পানি সরবরাহকারী ভিস্তি, পিঠেওয়ালা বুড়িসহ কবির স্মৃতির শহর জাগরূক থাকে কবির চৈতন্যে। নগরায়ন-উন্মুখ নতুন ঢাকার জীবনের সাথে সেই জীবনের বিচ্ছেদ ঘটে গেলে কবিও সেই মিল-ফ্যাক্টরি ভরা নতুন শহরের বাসিন্দা হয়ে যান কিন্তু বারবার স্মৃতি-বিহ্বল হয়ে তাকান ফেলে আসা সময়ের পানে। মার্কসবাদী সমালোচক ফরহাদ মাজহার শামসুর রাহমানের এই চেতনাকে বলেন, 'মধ্যবিত্তের ক্ষয়িষ্ণু রোমান্টিক চেতনা'—যা সামন্ত সময়ের প্রতি করুণায় আর্দ্র, আবার পুঁজিতান্ত্রিক বিকাশের প্রতি বিরূপ (ফরহাদ, ১৯৯১: ৩৯৫)। প্রকৃতপক্ষেই এই সংক্রান্তির দ্বৈরথ শামসুর রাহমানের প্রথম পর্বের কাব্যগুলোতে বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়—এই বোধ স্মৃতিকাতরতার মত লীন হয়ে মিশে থাকে কবির চৈতন্যে। শামসুর

রাহমানের কাব্যে ঘোড়া কেবল বিগত কালের প্রতীক নয়। *বিধ্বস্ত নীলিমা'য়* বিচিত্র প্রতীতিতে ঘোরা-ফেরা করে আরো অনেক ঘোড়া। *প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে* কাব্যে আস্তাবলের বেতো ঘোড়াটা অবলুপ্ত কান্তি ফিরে পেয়ে কবির মত নিঃশঙ্ক হয়ে উঠেছিল, আর এ কাব্যে কবি অতীতের কবিদের, বর্তমানে সমাগত কবিদের এবং নিজেকেও প্রকাশ করেন ঘোড়া বা অশ্বারোহীর প্রতীকে। *বিধ্বস্ত নীলিমা'য়* কবি 'তিনটি সাদা ঘোড়া'র প্রতীকে তিন জন দুর্জয় কবিকে চিহ্নিত করেন, যাঁরা মগজ খাটিয়ে, বুকের পাঁজর খুঁটে উপমা-প্রতীক আর চিত্রকল্পে, ভাষার নতুনত্বে শিল্পকে শুদ্ধতা দেবার বাসনা পোষণ করে হৃদয়ে। এই সাদা ঘোড়াদের প্রতীকে চিহ্নিত হয় কবি ও তাঁর সহযাত্রী বন্ধুদ্বয়। চারিদিকে যখন অবক্ষয়-বিলাসী কবিরা কবিতার নীলিম প্রান্তরকে বিধ্বস্ত করতে ব্যস্ত, তখন এই 'সাদা ঘোড়ার' দল শক্তি, সাহস ও ধৈর্যে ধ্বস্ত নীলিমার বুকে শিল্পের সাঁকো নির্মাণে তৎপর। মাত্রাবৃত্ত ছন্দে সেই নীলিমা-প্রিয় ঘোড়াদের ক্ষুরের নিঃস্বন শোনা যায়—

তিনটি সাদা ঘোড়া বাতাসে দেয় লাফ
বন্য কেশরের জ্বলছে বিদ্যুৎ।
চোখের কোণে কাঁপে তীব্র নরলোক,
তিনটি সাদা ঘোড়া বাতাসে দেয় লাফ।

...

তিনটি ঘোড়া বুঝি সাহস হৃদয়ের,
ত্রিকাল কেশরের শিখায় জাগ্রত।
শূন্য পিঠে ভাসে মুকুট উজ্জ্বল,
তিনটি শাদা ঘোড়া বাতাসে দেয় লাফ।
('তিনটি ঘোড়া', *বিধ্বস্ত নীলিমা*)

কবির নীলিমালোকের স্বপ্নচারী সত্তা ও সমকালের অস্থির-প্রগলভ কবিদের সত্তা—এই দুই বিপরীত স্বভাবী শিল্পজীবীই ঘোড়ার প্রতীকে মূর্ত হয়। *বিধ্বস্ত নীলিমা'*য় কিছু অন্ধ, বধির, নির্বিবেকী ও মত্ত ঘোড়াকে উপস্থাপন করেন, যারা চৈতন্যের নবনাট্যকে পণ্ড করে দেয়, যাদের খুরের ঘায়ে 'নীলিমার সাঁকো' গুঁড়ো হয় মুহুর্তে মুহূর্তে। এদেরকেই কবি বলেছেন 'বাকসর্বস্বের দল—/ হাঁটু মুড়ে বেপরোয়া দুরাশার মহান চত্বরে রাত্রিকে করছে পান ক্রমাগত চাঁদের গেলাসে'। এই সব নৈরাশ্য-বিলাসী অথচ বেপরোয়া কবিদের কবি কিছু অন্ধ, বধির ঘোড়ার প্রতীকে চিত্রিত করেন—

কী ভ্রান্তি বিলাসে দেখি ধাতুর প্রাসাদে কযেকটি
অন্ধ ঘোড়া রাত্রিদিন ঘোরে এক অর্থহীনতায় :
তাদের আরোহী নেই, মালিকানা জানা নেই কারো
ত্রিধাতু নিমিত সেই প্রাসাদের। অন্ধ ও বধির
ঘোড়াগুরি নক্ষত্র বমন করে, লেজের দাপটে
তাড়িয়ে বেড়ায় খোঁজা ক্রীতদাসী

সর্বক্ষণ একই বৃত্তে। অবিবেকী সুরে স্তূপীকৃত শব হ'ল
ছিন্নভিন্ন, চতুর্দিক নক্ষত্র, বিষ্ঠায় মতিচ্ছন্ন একাকার।
('বন্ধুদের প্রতি', *বিধ্বস্ত নীলিমা*)

পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে যে, পশ্চিমবঙ্গের 'হাংরি' কবিদের অনুকরণে গঠিত পূর্ববঙ্গের 'স্যাড' প্রজন্ম নৈরাশ্য, নঞর্থকতা, বিকার, ব্যাধি ও যৌনতাকে জীবনের ধর্ম বলে প্রচার করে বাংলা কবিতায় ভাঙনের সুর তুলেছিলেন ষাটের দশকে। 'স্যাড' কবিরা 'হাংরি' কবিদের মতই তাঁদের ইশতেহার প্রচার করেন ইংরেজি ভাষায়, ১৯৬৪ সালে। ষাটের দশকে 'স্যাড' প্রজন্মের কবিদের নতুন চেতনার মুখপত্র ছিল 'স্বাক্ষর' ও 'কণ্ঠস্বর' নামের দু'টি পত্রিকা। 'কণ্ঠস্বরে'র সম্পাদকীয়তে আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ যে নতুন ঘোষণা প্রদান করেন, তা 'স্যাড' কবিদেরই কণ্ঠস্বর—

> যারা সাহিত্যের সনিষ্ঠ প্রেমিক, যারা শিল্পে উন্মোচিত, সৎ, অকপট, রক্তাক্ত, শব্দতাড়িত, যন্ত্রণাকাতর, যারা উন্মাদ, অপচয়ী, বিকারগ্রস্ত, অসন্তুষ্ট, বিবরবাসী; যারা তরুণ, প্রতিভাবান, অপ্রতিষ্ঠিত, শ্রদ্ধাশীল, অনুপ্রাণিত, যারা পঙ্গু, অহংকারী, যৌনতাস্পৃষ্ট, 'কণ্ঠস্বর' তাদেরই পত্রিকা।' (অসীম, ২০১৩: ১৩৫)

পাকিস্তানী স্বৈরশাসক আইয়্যুব খানের শাসনামলে দেশের রাজনৈতিক সংকটে স্বাধীকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের প্রতি উদ্বুদ্ধ না হয়ে 'স্যাড' কবিদের এই অবক্ষয়-প্রিয় কলাকৈবল্যবাদী কবিতার ধারা স্বভাবতই বিরূপ মন্তব্যের স্বীকার হয়েছিল সে সময়। স্পষ্টতই শামসুর রাহমান সমর্থন করেন নি বাংলা কবিতার চেষ্টাকৃত বিপন্ন এই প্রজন্মকে। কবির কাছে এরাই বাংলা কবিতার 'নষ্ট বাগানের ভ্রষ্ট পাখি'। উপর্যুক্ত উদ্ধৃতাংশে মতিচ্ছন্ন, দিগভ্রান্ত ঘোড়াগুলো এই দুঃখ-বিলাসী কবিদেরই প্রতীক। কেবল অন্ধ বধির এই ঘোড়াগুলিই নয় 'হরিণ এবং খচ্চরের সঙ্গমে' কবি তাঁর চারপাশে জন্ম নিতে দ্যাখেন অদ্ভুত বেখাপ্পা সব জন্তুসমূহকে ('বন্ধুদের প্রতি', *বিধ্বস্ত নীলিমা*)। 'বামনের দেশে' কবিতায় কবি প্রতিরূপকায়ণের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের সমকালীন কবিতা-জগতের নানা বৈপরীত্য, বিশৃঙ্খলা ও সংঘট্টকে চিত্রিত করেন। কল্পিত সেই বামনের দেশে যেমন রয়েছে কিছু শুদ্ধাচারী বামন, তেমনি রয়েছে প্রগলভ, অস্থিরমতি বামনের দল। শুদ্ধাচারী বামনদের প্রেক্ষণ থেকে সেই নষ্ট সময়কে রূপকান্বিত করেন কবি। শুদ্ধাচারী বামনেরা তাদের কীর্তিমান অগ্রজ কবিদের শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে তাদের প্রস্থানকে কালের নির্বন্ধ বলে মেনে নেয় এবং এখন কালান্তরে পূর্বজ বামনদের সেই কীর্তিগাথাকে যে-সব নতুন বামনের দল নোংরা করে চলেছে, তাদের ধিক্কার জানায়। জীবনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে যারা 'কবরখানার গান' গেয়ে নিজেরাই ছায়া হয়ে যায় তাদের উদ্দেশ্যে উষ্মা প্রকাশ করে শুদ্ধাচারী বামনেরা বলে—

এ শহরে চতুর্দিকে ভিড়, চতুর্দিকে
বামনেরা জটলা পাকায়

এবং চাঁদের নখ উপড়ে আনবে ভেবে তারা
গুটিয়ে জোব্বার হাতা এলাহি রগড় ক'রে শেষে
থুতু ছুঁড়ে দেয় আকাশের মুখে।
('বামনের দেশে', বিধ্বস্ত নীলিমা)

এই বামনের দেশে শুদ্ধাচারী বামনেরা ওই সব ভ্রষ্ট বামনদের মত লঘুমতি নয়। তাঁরা পূর্বজ বামন কবিদের মহিমার প্রতি আস্থা রেখেও নতুন শব্দ-কল্পনায় কবিতার নতুন ধারা গড়তে চায়। তারা 'অলৌকিক মন্ত্রের মায়ায়' কবরের ধূলিকে বানাতে চায় 'নক্ষত্রের ফেনা'। শেষ পর্যন্ত জীবনের স্তবে আন্দোলিত সেই স্বপ্নবান বামনেরা 'প্রাজ্ঞ পদাবলী, প্রতীকের উচ্চারণ, রূপাভাসে' বিধ্বস্ত নীলিমাকে মেরামত করার জন্য মরিয়া হয়। স্পষ্টতই বোঝা যায় যে, কবি একটি প্রতিরূপকে মুড়তে চেয়েছেন তাঁর সময়ের সংকটকে। কবি রূপকায়ণে আগ্রহী, কারণ রূপক ও প্রতিরূপকের মাধ্যমে আপাত বৈসাদৃশ্যপূর্ণ অনুষঙ্গে অনুভূতি, সংবেদনা ও বীতরাগকে প্রতিস্থাপন করা যায়। দৃশ্যমান জগতের এক অনন্য রূপান্তর কৌশল এই রূপকায়ণ। রূপক উপমার বিপরীত বৈশিষ্ট্যযুক্ত—উপমা যেখানে দু'টি বিষয়ের তুলনাসূত্রে ভাবের সংযোগ সাধন করে, রূপক সেখানে দুটি বিষয়ের অভেদসূত্রে ভাবের ঐক্য সাধন করে। দ্ব্যার্থক বলে, রূপকের বাহ্যার্থ আর নিহিতার্থ ভিন্ন। তাই রূপক ব্যবহারে কবিতা হয় অন্তরাশ্রয়ী, সংবেদী। মূলত, 'রূপক' কবির তৈরি একটি সুন্দর বিভ্রম—কবি চেতনায় একধরনের ছদ্মাবরণ সৃষ্টি করে বাস্তব এবং কল্পনার মধ্যে অভেদ সম্পর্ক স্থাপন করেন। পাঠক এ ভেদকে মেনে নেয়। 'বিধ্বস্ত নীলিমা'য় কবি অধিকতর সমকাল-সংলগ্ন। কবিতার অন্তঃপুরে প্রবেশের অভিলাষে কবি একদিকে সমকালের নানা অসঙ্গতিকে উপস্থাপনের জন্য অবলম্বন করেন প্রতীক, রূপক, প্রতিরূপকের ছদ্মাবরণ , অন্য দিকে বিপন্ন জীবন ও শিল্পের শুশ্রূষার অন্তর্গত তাগিদে নানা অসঙ্গতির প্রতি হয়ে ওঠেন সরাসরি ব্যঙ্গপ্রবণ। একদিকে কবি তাঁর রক্তাক্ত, উৎপীড়িত চেতনাকে শ্রীযুক্ত বিষণ্ন পরিমলে'র চৌকাঠে মুখ থুবড়ে পড়া রাজহাঁস-চেতনার সাথে প্রতীকান্বিত করেন ('অপচয়ের স্মৃতি', *বিধ্বস্ত নীলিমা*) কিংবা বিগত কালের মুখ থুবড়ে থাকা অসহায় অন্তরাত্মার পরাভব বোঝাতে চৌকাঠে মুখ থুবড়ে থাকা স্কুটার-দলিত নিঃসাড় হাঁসগুলোকে কবির পিতামহের মৃত-স্বপ্নের প্রতীক করে তোলেন ('তিনটি হাঁস এবং পিতামহ', *বিধ্বস্ত নীলিমা*), অন্যদিকে প্রবল ব্যঙ্গে সরাসরি বিদ্ধ করেন সম্প্রতি পণ্য হয়ে ওঠা প্রিয় কবিতা-কল্পনালতাকে—

আপাতত অসহ্য তোমার চটকসর্বস্ব মুখ—এতকাল একই অঙ্গরাগ
দেখে ঘেন্না ধরে গেছে। যখন ঝুলন্ত বারান্দায়
বাড়াও মুখ আর হৃদয়-দুযার খুলে
উঁকি মারো জনপথে, কিংবা নিশীথ টেবিলে রেখে
অলংকার, বিবর্ণ দস্তানা তুমি শস্তা হোটেলের
কামরায় ভাসমান প্রমোদ হিল্লোলে, অনেকটা

বুক-পেট দেখিয়ে দুপুরে অ্যাভিনিউ ঘুরে ঘুরে

যখন উত্তাল ঢেউ তুলে হাঁটো নিতম্ব দুলিয়ে
লজ্জা কি পাও না তুমি ?
('বাংলা কবিতার প্রতি', *বিধ্বস্ত নীলিমা*)

বিধ্বস্ত নীলিমা'য় এভাবে কবি অন্তর্বাস্তবতা ও বহির্বাস্তবতা, ভূতকাল ও নতুনকালের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করেন কখনো রূপক-প্রতীকের পরোক্ষ নান্দনিকতায়, কখনো ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের প্রত্যক্ষতায়। এছাড়া, কবি 'উলটো পালটা চিত্রকল্পে' মেলে দেন পাখা। সময়ের অস্থিরতাকে রূপ দিতে কবি প্রয়োগ করেন জটিল বিমূর্ত সব চিত্রকল্প। কবি উপমা-চিত্রকল্পগুলোকে ভেঙে দেন এবং বর্ণনার মত করে তাঁর শব্দ-ভাষা ও কল্পনার চিত্রণ ঘটান—

বিচিত্র হিংসুক ভিড় শিল্পকে প্রচণ্ড লাথি মেরে,
তীব্র কোলাহল ক'রে বোধগুলি আস্তাকুঁড়ে ছুঁড়ে
ফেলে দিল, যেন ছেঁড়া হলুদ কাগজ। ক্রমাগত
সময় তাড়িত তারা, ঘোরে ঘূর্ণিপথে, বাঁশিগুলি
তাদের রোমশ হাতে গুঁড়ো হয়, চতুর্দিকে শুধু
বেজে ওঠে ক্যনাস্তারা। জীবন দু'হাতে ঢাকে কান।
('কমা সেমিকোলনের ভিড়ে', *বিধ্বস্ত নীলিমা*)

কবি মূর্ত চিত্রকল্পের পরিবর্তে এখানে ব্যবহার করেন বিমূর্ত চিত্রকল্প (ইমেজারি)। *বিধ্বস্ত নীলিমা*'র শব্দ-ভাষা *রৌদ্র করোটিতে*'র চেয়েও আরো অন্তরাশ্রয়ী অথচ সাবলীল হয়ে ওঠে এর চিত্রকল্পায়নের এই বিশেষ স্বভাবে। রোমান্টিক ও আধুনিক কবিরা মূর্ত বাস্তবতাকে প্রকাশ করতে কবিতার অলংকার হিসেবে যেভাবে চিত্রকল্পের প্রয়োগ ঘটাতেন, 'ইমেজারির'র চিত্রণ তার থেকে বেশ বৈচিত্র্যময়। পূর্বে কবিতায় চিত্রকল্প শোভা পেত স্বচ্ছ, সংহত এবং সুনির্দিষ্টরূপে । অপরদিকে 'ইমেজারি' কবিতার শব্দভাষায় মিশে থাকে ব্যবহারিক অস্তিত্বে, স্বাভাবিকভাবে, ছড়িয়ে। শব্দ-ভাষাকে আলংকারিক না করে কল্পনাত্মক, হৃদয়গ্রাহী ও স্বতঃস্ফূর্ত করে তোলার এ এক অপূর্ব কৌশল। মূলত 'ইমেজারি' হলো কবির আত্মিক উদ্ভাসন ও উপলব্ধির চিত্ররূপ (Eagleton, 2007 : 140-141)। আধুনিক কবিতায় চিত্রকল্প মিশে থাকে শব্দের অস্তিত্বে। *বিধ্বস্ত নীলিমা*'র 'ইমেজারি'গুলোতে শব্দ ও বাক্যের ভেতর জড়িয়ে থাকে উপমা ও ছোট ছোট চিত্রকল্পের দ্রবণ:

ক. দ্যাখো
সারাক্ষণ কারা যেন সুন্দর পাখির ঝাঁক প্রত্যহ দু'বেলা
পোড়াচ্ছে ফার্নেসে ব'লে এ- জীবন ভাঙা হাঁটু গেড়ে
বসে গৃহকোণে আর মাথা রাখে স্বপ্নহীন ক্ষুধিত দেয়ালে।
('কমা সেমিকোলনের ভিড়ে', *বিধ্বস্ত নীলিমা)*

খ. পত্রের মার্জিন-ঘেষা পুনশ্চের মতো সংকুচিত, ক্ষণজন্মা
শিল্পীরা জলের দরে বিকোয় বাজারে, প্রগতির চাকা দেখি
অবিরত পাঁকে আটকে যায় : স্নেহ, প্রীতি,ভালোবাসা, উদারতা,
করুণা নামক কিছু বিখ্যাত বিষয় আগাগোড়া শোকাবহ
বিশাল কাফনে মুড়ে লোকগুলো মহানন্দে বগল বাজায়,
ঘৃণাকে আনন্দ ভেবে শান্তিকে তর্জমা করে হিংসার কাঁটায়।
('একজন পাইলট', *বিধ্বস্ত নীলিমা*)

গ. ছিঁড়ে-খুঁড়ে খাব ব'লে দৈত্য-দানো চক্রান্তের টানে
তেড়ে আসে পৌর পথে। সম্মিলিত নেকড়ে হায়েনা
রক্তমাখা কাপড়ের গন্ধ শুঁকে শুঁকে চক্রাকারে
ঘোরে, আমি নিরুপায়। ইতিমধ্যে আমার শরীর
ছিন্নভিন্ন গণ্ডারের বৈরিতায়।
('সেই কণ্ঠস্বর', *বিধ্বস্ত নীলিমা)*

এভাবে কখনো বিমূর্ত চিত্রকল্পে, কখনো মূর্ত চিত্রকল্পে, কখনো প্রতীকাত্মক চিত্রকল্পে, কখনো অযৌক্তিক চিত্রকল্পে (poetic artifice) কবি সময়ের হিংস্রতা ও তাঁর অন্তর্গত বিপন্নতাকে মূর্ত করে তোলেন। ভাবের আতিশয্য বোঝাতে কবি ব্যবহার করেন সংখ্যাবাচক শব্দের অমূলক অতিরঞ্জন বা 'hyperbole'—যেমন, কয়েকশো কোকিল, বহু লক্ষ প্রজাপতি ইত্যাদি। কবির ভাষায়—

সবসুদ্ধ কয়েকশো, তারও বেশি সুকণ্ঠ কোকিল
হত্যা ক'রে, বহু লক্ষ প্রজাপতি ছিঁড়ে, পাপিয়াকে
সোৎসাহে নির্বংশ ক'রে লোকটা সদর্পে হেঁটে গেল
রোমশ ছত্রিশ ইঞ্চি ঠুকে ঠুকে। সময়ের ছাদ ধ্বসে
যেতে চায়, দেখলাম ভূতগ্রস্ত নগ্নতায়।
('প্রতীতি আসেনি', *বিধ্বস্ত নীলিমা*)

সমকালের সংঘট্টকে চিত্রিত করতে কবি এ কবিতায় ব্যবহার করেন 'হাইপারবোল'। মূলত 'হাইপারবোল' হলো tropes বা রূপকাদির একটি বিশেষ উপাদান, যা কবি নানা উদ্দেশ্যে কবিতায় প্রয়োগ করে থাকেন (Burkhardt and Nerlich, 2010: 388-389)। 'হাইপারবোল' বর্তমানে উত্তরাধুনিক কবিতায় বহুল প্রচলিত।

শামসুর রাহমানের প্রথম পর্যায়ের কাব্যের মধ্যে বিধ্বস্ত নীলিমা'য় কবি সবচেয়ে বেশি সমকাল-সংলগ্ন, রক্তাক্ত, অভিজ্ঞ। কবি এ কাব্যে তাঁর চেতনাকে ইচ্ছে মত আড়াল করেন রূপক-প্রতীকে, আবার ইচ্ছে হলে সরাসরি প্রতিপক্ষকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দেন ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ। এভাবেই কবি জীবন ও শিল্পের মধ্যে খুঁজে নেন অভিযোজনের অন্তর্সূত্র।

বস্তুতই কবির ''ত্রিলোক, মনোবিশ্ব-প্রতিবেশ পৃথিবী-সমকাল সম্মিলিত হয় চতুর্থ কাব্যগ্রন্থ *নিরালোকে দিব্যরথে* এর কবিতাগুচ্ছে''(হুমায়ুন, ২০০৪: ৭১)। পূর্বের তিনটি কাব্যে কবি ভীষণভাবে সমকাল-সংশ্লিষ্ট থাকায় ইতিহাস ও অতীতের সাথে তাঁর যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হয়েছিল, *নিরালোকে দিব্যরথে* তা আর লক্ষ করা যায় না বরং কবি এক সমন্বিত চৈতন্যে অতীত ও বর্তমানকে, স্মৃতি ও বাস্তবকে, ব্যক্তি ও পরিপার্শ্ব, জীবন ও সমাজকে বিন্দুবদ্ধ করেন—একটি বৃহৎ সময়চেতনার অংশ হিশেবেও কবি তাঁকে ও তাঁর সময়কে চিনে নেন।

আমি হই বর্তমান, আমি হই আদিকাল। যদিও পরিনা
বাঘছাল, তুকতাক ফুঁকি না মন্তর, চাপারং
হাওয়াই পার্টের অন্তরালে হৃদয় একান্ত ঝাঁ ঝাঁ,
দৃষ্টি চাননিমার পর। তোমরা গকুলে আছ আর
আমি তো জলহস্তীর পাকে প'ড়ে অপটু সাঁতারে
গংগিমার কাছে যেতে চাই।
('আমি হই বর্তমান', *নিরালোকে দিব্যরথে*)

এভাবেই, *প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে*'র কবির রক্তাক্ত অন্তর্লোক, *রৌদ্রকরোটিতে*'র সামাজিক জীবনাভিজ্ঞতা এবং বিধ্বস্ত নীলিমায় কবির সমকালবিদ্ধতার যন্ত্রণা *নিরালোকে দিব্যরথে* সমন্বিত হয় মিশ্র 'ফর্মে'। পূর্বের কাব্যগুলোর বিচ্ছিন্ন নান্দনিকতাগুলোই বিচূর্নীভূত হয়ে ছড়িয়ে থাকে *নিরালোকে দিব্যরথে*'র নানা কবিতায়। চতুর্থ কাব্যে কবি তাঁর অতীত-বর্তমান, স্মৃতি ও বাস্তব, অভিজ্ঞতা ও অভিযোজনের সামর্থ্যকে সমন্বিত করেন। মূলত বেশ কিছুদূর এসে কবি সামনে ও পেছনে তাঁকিয়ে তাঁর অভিজ্ঞতার সংশ্লেষণ খোঁজেন। ফলে স্বভাবতই, পূর্বের কবিতার ভাব ও 'স্টাইল' নানাভাবে পুনরাবৃত্ত হয়েছে এ কাব্যে। কিন্তু এও সত্য যে, এ কাব্যে কবি কিছু নতুন 'টেকনিকে'র সংযোগ ঘটান, যা পূর্ববর্তী কাব্যসমূহে অনুপস্থিত। *নিরালোকে দিব্যরথে* এলিয়ট-কথিত কবির 'নৈর্ব্যক্তিক দূরত্ব' অনুসরণ করেন কবি, যা আগের কাব্যগুলোতে লক্ষ করা যায় না। এলিয়ট বলেছিলেন—'Poetry is not a turning loose of emotion, but an escape from emotion; It is not expression of personality, but an escape from personality (Eliot, 1976: 21)। এই নৈর্ব্যক্তিকতা রক্ষায় *নিরালোকে দিব্যরথে* কবি তাঁর 'ভিসন' বা প্রেক্ষণবিন্দুকে চালিত করে দেন কিছু কল্পিত চরিত্রের দৃষ্টিভঙ্গিতে। কবি ঐসব চরিত্রের চোখ দিয়ে বস্তু জগৎকে প্রত্যক্ষ করেন। একজন সাইকেল আরোহী, নিজস্ব সংবাদদাতা দেবদূতগণ কিংবা ময়নামতীর মূর্তিরা কবির পক্ষে বস্তুজগৎ প্রত্যক্ষ করে এবং তাদের অভিপ্রায় ব্যক্ত করে। কবি অদৃশ্য থেকে চরিত্রের মুখ

দিয়ে তাঁর কথা বলিয়ে নেন। শামসুর রাহমান এই পরোক্ষ পদ্ধতি নিরালোকে দিব্যরথে'র কিছু কবিতায় প্রয়োগ করেছেন।

'কোনো সাইকেলচারীর উপাখ্যানে' কবি একজন সাধারণ সাইকেলচারী মানুষের স্মৃতিতে প্রবিষ্ট হয়ে পরোক্ষভাবে তাঁরই অতীত-বর্তমানকে সমন্বিত করেন। যদিও উত্তম পুরুষেই রচিত কবিতাটি, তবু, সাইকেলটি কবির নগর-ভ্রমণের বাহন। দ্বিচক্রযানের দিব্যরথে চড়ে কবিরূপী সেই সাইকেল আরোহী ঘুরে আসেন তাঁর স্মৃতির শৈশব, পিতামহ-পিতার জীবনের উত্তাপ স্পর্শ করে, চেনা নগরীর পথে-পথে। তারপর কোনো জোৎস্নারাতে 'হাতুড়ে স্বাপ্নিকে'র মত সে তার সাইকেল নিয়ে পরাবাস্তব প্রতীতিতে উড়ে চলে নীলিমালোকে—

> নিজেকে বুঝি না ঠিক, তাই
> কখনো শহীদ ভাবি জীবনের, কখনো কেবলি সাইকেলচারী এক,
> কখনো বা হাতুড়ে স্বাপ্নিক।
> মাথার ভেতরে আজগুবি গোলাপের পাঁপড়ি প'ড়ে আছে কত,
> প'ড়ে আছে অনভ্যস্ত ভঙ্গিমায়, হৃদয়ে দাঁতের মতো চাঁদ
> ভীষণ আমূল বিদ্ধ। জোৎস্নারাতে হঠাৎ বাতাসে কালো চেন
> উন্মোচিত, সাইকেল ভেসে যায়, গোরস্থান, কাগজের স্টল,
> মেয়ে-পুরুষের আর ভুলচুক, করুণা, পাপের পরপারে।
> মেঘে-মেঘে, নক্ষত্রের বাগানে কেবলি ভেসে যায় দীপ্ত কী এক বোধিতে
> ('কোনো সাইকেলচারীর উপাখ্যান', *নিরালোকে দিব্যরথ*)

প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে'র বেতো ঘোড়াটা' কবিতায় যেমন ঘোড়াটি শেষ পর্যন্ত উড়ে চলে নীলিমায়, কবির মত নিঃশঙ্ক, ঠিক তেমনি সাইকেলটি নিরুদ্দেশ ভেসে চলে মেঘে-মেঘে। প্রকৃতপক্ষে, বেতো ঘোড়াটি কিংবা এই সাইকেলচারী কবিরই আত্মরূপ—কবির মনের গভীর স্বপ্নীল বাসনা প্রকাশের বহিরাশ্রয়। প্রথম কাব্যে কবির 'রুপালি স্নানে'র অভিলাষের সাথে দ্বিতীয় ও তৃতীয় কাব্যে বস্তুজগত-অভিজ্ঞতার সমন্বয় ছাড়াও এই কাব্যে যুক্ত হয় কবির স্মৃতিকাতরতা ও অতীত-বর্তমানের সংশ্লেষণ প্রবণতা। 'কিশোররূপে একজন কবির প্রতিকৃতি' কবিতায় কবি একজন কিশোরকে অবলম্বন করেন মূলত তাঁরই অতীত জীবনের স্মৃতিচারণের উদ্দেশ্যে। শহরের বর্তমান প্রেক্ষাপটকে দৃশ্যমান করে তোলার জন্য এবং কবির স্মৃতি ও অভিজ্ঞতাকে সমন্বিত করার উদ্দেশ্যে এটি কবির এক পরোক্ষ নান্দনিকতা। 'নিজস্ব সংবাদদাতা' কবিতায় কবি কল্পিত দেবদূতদের নামিয়ে আনেন এই শহরের অলিতে-গলিতে এবং সংবাদদাতার ভূমিকায় তারা ঈশ্বরের কাছে বয়ান করে চলে তাদের বিচিত্র আভিজ্ঞতার কথা। কবি নাগরিক জীবনের বৈচিত্র্যকে উপস্থাপন করেন আশ্চর্য পরোক্ষ শৈলীতে, সংবাদ প্রতিবেদনের ছলে (নিজস্ব সংবাদদাতা, *নিরালোকে দিব্যরথ*)। যে নগর ঢাকাকে

তার বিচিত্র বৈশিষ্ট্যে কবি উপস্থাপন করেছিলেন পূর্বের কাব্যগুলোতে সেই ঢাকাকেই *নিরালোকে দিব্যরথে* তিনি উপস্থাপন করেন পরোক্ষ কৌশলে , চরিত্রের বয়ানে। *রৌদ্র করোটিতে*'র চরিত্রগুলোর মত চারপাশের চেনা জগতের বাস্তবধর্মী কোনো চরিত্র নয়, এই চরিত্রগুলো বরং অনেকাংশে কবির কল্পনা-রঞ্জিত। যেমন, বিশ্বপ্রতিপালকের উদ্দেশে সংবাদদাতা দেবদূতগণের প্রতিবেদনে উঠে আসে অর্থনৈতিক-সামাজিক বৈষম্য পীড়িত, দুর্যোগ-দুর্দশাগ্রস্ত বাঙালি সমাজের দৈনন্দিন জীবনের চালচিত্র—

আপনার নিজস্ব সংবাদদাতা, হে বিশ্বপ্রতিপালক, এই আমরা ক'জন
পৃথিবীতে বহুদিন করেছি ভ্রমণ
...
দেখেছি পেছনে ফিরে গণ্ডগ্রাম হয়েছে উজাড়
চোখের পলকে আর শহরেও মড়কের নৃত্যনাট্য দেখেছি
...
মধ্যরাতে আলোকিত লিফ্‌ট-এ বিদেশী প্রতিনিধি উঠে যান
এগারো তলায় হোটেলের। সুটকেস হাতে কেউ কান্তিমান
দ্রুত হেঁটে যায়, যেন আশে পাশে ভালো ক'রে দেখার সময়টুকু নেই,
কখনো ফেরে না আর।
...
কখনো গলির পাশে বিশ্রামের মুহূর্তে শুনেছি কিছু গাঢ়
উচ্চারণ মানবিক: উন্মাদের বাজে
বকবকানিতে মাঝে-মাঝে অনেক গভীর সত্য হয় উচ্চারিত, পথচারী ভড়কায়
বোঝে না আলাপ তার কেউ, তেল নেই আপাতত চরকায়।
('নিজস্ব সংবাদদাতা', *নিরালোকে দিব্যরথ*)

শামসুর রাহমান তাঁর সাংবাদিক জীবনের নানা অভিজ্ঞতাই এই কল্পিত দেবদূতদের বিবরণের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে প্রকাশ করেন। 'অ্যনিমেশন' ছবির পুতুল চরিত্রের মুখে ভাষা দেবার মত কবি ময়নামতীর মূর্তিগণকে জীবন্ত করে নামিয়ে দেন শহরের বুকে—তাদের বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে কবি এঁকে চলেন বিচিত্র জীবন ও দৃশ্যের শব্দময় নাগরিক জীবন ('ময়নামতীর মূর্তিগণ', *নিরালোকে দিব্যরথ*)। নাগরিক জীবনের বৈচিত্র্যকেই কবি ভিন্ন কৌশলে উপস্থাপন করেন *নিরালোকে দিব্যরথে* কাব্যে।

কবিতায় নাটকীয়তা সৃষ্টির জন্য এলিয়ট ব্যবহার করতেন 'তৃতীয় স্বর'কে (third voice), যেখানে কবি এবং পাঠক ব্যতীত তৃতীয় কোনো চরিত্রের প্রেক্ষণবিন্দু থেকে কবিতা বর্ণিত হয় আর ঐ চরিত্র mouthpieceরূপে কবিরই ভাবকে উপস্থাপন করে[৫] (Eliot, 1969: 100)। এভাবেই প্রত্নতাত্ত্বিকের মাটি খুঁড়ে তুলে আনা করোটিকে দিয়ে কবি কথা বলান। 'ফ্রি ভার্স' বা মুক্ত ছন্দে কোরাস ও স্বগতোক্তির মাধ্যমে তিনি সেই করোটির রক্তমাংসে গড়া অতীত ও বর্তমানকে সমন্বিত করেন। বস্তুত, কবির সমকালবিদ্ধ যন্ত্রনাময় চৈতন্যই শব্দায়িত হয় করোটির স্বগতকথনে—

(করোটির স্বগতোক্তি)
আমিও ছিলাম এই পৃথিবীতে, আনুগত্যে প্রিয়
নাচের মুদ্রার মতো ফুটিয়েছিলাম জীবনকে
কতদিন। সৌন্দর্য নশ্বর নয় ভেবে মহিলাকে
করেছি উৎসর্গ প্রেম, নিজেকে ছুঁড়েছি নীলিমায়,
অধীর তৃষ্ণায় পান করেছি সত্তার সারাৎসার।

জনতা-জটিল সেই নগরের মোড়ে দেখি চেয়ে
আমার প্রিয়ার মাথা কেটে ফেলে কৃষ্ণহন্তারক
কুঠারের ক্ষিপ্র ঘায়ে। পিতৃপুরুষের ক্রোধ
ফুঁসে ওঠে অকস্মাৎ, কিন্তু তবু স্তম্ভের মতোই
নিঃসঙ্গ দাঁড়িয়ে থাকি, অসহায়। এবং তখন
অন্ধকারে ঈশ্বরকে খুঁজি একা দীর্ণ প্রর্থনায়।
('কয়েকটি স্বর', *নিরালোকে দিব্যরথ*)

কখনো কবিতায় প্রেক্ষণটি কবির করায়ত্ত থাকলেও কবি আলাদা চরিত্রের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় তাঁর কথা ব্যক্ত করেন আর সেই সূত্রে কবিতাটিতে যুক্ত হয় কবির নাট্যায়ন প্রবণতা (dramatisation)। শামসুর রাহমান জীবনব্যাপী রচিত নানা কাব্যে নানা সময়ে নাট্যায়ন-রীতির যে-সব প্রয়োগ ঘটিয়েছেন, তার সূত্রপাত হয় *নিরালোকে দিব্যরথে'র এই কবিতাগুলোতে*। এ কাব্যের 'তারা ক'টি যুবা' কবিতায় কয়েকজন যুবকের স্বপ্ন-স্বপ্নভঙ্গ ও প্রত্যয়কে ব্যক্ত করার মধ্য দিয়ে কবি নিজের ও তাঁর সহযাত্রীদের অভিজ্ঞতাকেই ব্যক্ত করেন—

তারা কটি যুবা হিংস্র যুদ্ধে
ভাবে না কখনো জিত কার হার কার?
দেয়ালে দেয়ালে শুধু সেঁটে দেয়,
লাল গোলাপের নতুন ইস্তাহার।
('তারা ক'টি যুবা', *নিরালোকে দিব্যরথ*)

আমাদের মনে পড়ে যায় *বিধ্বস্ত নীলিমা*'র সেই তিনটি 'সাদা ঘোড়া'র কথা, যারা স্বপ্নে, সাহসে কবিতার নীলিমায় নতুন শব্দ-ভাষার সাঁকো গড়তে চেয়েছিল।

নিরালোকে দিব্যরথে কখনো কখনো প্রতীকের মাধ্যমেও কবিতায় পরোক্ষতা সঞ্চার করেন কবি। একটি রঙিন মাছের শরীরে কবি প্রবিষ্ট করে দেন তাঁর শরীর ও সত্তা আবার অচিরেই সেই বর্ণিল মাছ ও কবি পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠেন—

অকস্মাৎ আমাকে বিঁধলে তুমি মাছ, ওগো মাছ;
হে বন্ধু আমার, অলৌকিক বড়শিতে।

নির্জন কিনারে হাঁটু গেড়ে কাটালো পাখির বুলি শুনি, ভাবি
তোমাকে ছাড়ব আমি নাকি তুমি আমাকে দয়ালু?
('মাছ', *নিরালোকে দিব্যরথে*)

কবির সত্তায় শিল্পের যে দ্বৈরথ চলে প্রতিমুহূর্তে, যে যুদ্ধ ও অন্তর্গত রক্তক্ষরণে কবিতার জন্ম দেন কবি নিজেকেই নিঃশেষ করে, সেই মধুর দ্বান্দ্বিক সম্পর্কই কবির সাথে এই মাছের—*'দি ওল্ড ম্যান অ্যান্ড দি সী'*তে সান্তিয়াগোর সাথে তার সেই মহৎ মাছটির সম্পর্ক ছিল যেমন। কবি নিজেই কবিতার মৃগয়া করেন, নাকি কবিতাই শিকার করে কবিকে—এ প্রশ্ন চিরন্তন। কবি সৃষ্টিশীলতার সেই মধুর, আত্মিক সংগ্রামশীলতাকে প্রকাশ করেন মাছ ও তাঁর দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের ক্রিয়াশীলতায়। একইভাবে, একটি ক্ষুধার্ত 'শঙ্খচূড়ে'র প্রতীক হয়ে কবি ঘুরে ফেরেন অমাবস্যার দ্বিপ্রহরে, যে শঙ্খচূড় প্রবল ক্ষুধায় শেষপর্যন্ত নিজেকেই নিজে আহার করে ('শঙ্খচূড়', *নিরালোকে দিব্যরথে*), কিংবা শাদা গোলাপকে লাল বানানোর অভিলাষে ধারালো কণ্টকে আপন বক্ষ বিদ্ধ করে যে নাইটিঙ্গেল সারারাত নিজের রক্ত ঝরিয়েছিলো, তার প্রতীকে কবি মূর্ত করেন তাঁর শিল্পচৈতন্যের যন্ত্রণাকে (সমান্তরাল)। মূলত, প্রতীক বা রূপক নয়, এক ধরনের পরোক্ষতা সৃষ্টি করতে কবি প্রতীককে ভেঙে দিয়ে তাঁর স্বগতকথনকে সাংকেতিক করে তোলেন এই কবিতাগুলোতে। *নিরালোকে দিব্যরথে*'র এই নতুন বিশেষ কৌশলটি শামসুর রাহমান তাঁর পরবর্তী অনেক কাব্যে প্রয়োগ করেছেন।

প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে কাব্য থেকেই কবি মিথকে তাঁর কবিতার শক্তিশালী প্রকরণ-শৈলীরূপে প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়েছেন। *নিরালোকে দিব্যরথে* কাব্যে গ্রিক পুরাণের 'টেলেমেকাসে'র ভাষ্যে উপদ্রুত জন্মভূমির অস্তিত্ব-সংকটের চিত্রণ ঘটিয়ে কবি তাঁর মিথ-নবায়নের শিল্পিতাকে আরো উৎকর্ষমণ্ডিত করে তোলেন। 'টেলেমেকাস' কবিতাটি যখন কবি রচনা করেন, তখন কবির স্বদেশ পশ্চিম পাকিস্তানী দস্যু পরিবৃত। আর সে জাতির পিতা শেখ মুজিবর রহমান স্বদেশের দাবী-দাওয়া আদায়ের সংগ্রামে নেতৃত্ব দিতে গিয়ে শত্রু-প্রাকারে বন্দী হয়ে আছেন। এই দৈশিক বাস্তবতায় কবি রচনা করেন 'টেলেমেকাস' কবিতাটি। কবির স্বীকারোক্তিতে—

> কবিতাটির নাম 'টেলেমেকাস'। তখন শেখ মুজিব কারাবন্দী। টেলেমেকাস বীর ইউলিসিসের পুত্র। ইউলিসিস তার রাজ্য ইথাকায় দীর্ঘদিন অনুপস্থিত। তার পুত্র পিতার প্রত্যাবর্তনের প্রতীক্ষায় সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে রয়েছে ব্যাকুল দৃষ্টিতে।...সেকালে কবিতাটির আড়ালে যে আমাদের দেশের হাল-হকিকত এবং জননেতা শেখ মুজিবের কথাই বলা হয়েছে, এই সত্য অনেকের কাছেই সম্ভবত উদ্ভাসিত হয়নি। তবে একটি কবিতার আত্মা যাদের অন্তর্দৃষ্টিতে পরিস্ফুট, তারা অবশ্যই বুঝতে পেরেছিলেন (শামসুর, ২০০৭: ২২২-২২৩)।

প্রকৃতই কবি গ্রিক মহাকাব্য 'অডেসি'র ঘটনাংশের মধ্যে বাংলার শত্রুকবলিত, উপদ্রুত সময়ের বাস্তবতাকে গভীর মনস্তাত্ত্বিক সম্পর্কে প্রতিস্থাপিত করতে সমর্থ হয়েছেন। প্রবল স্বপ্নহীনতায় দোদুল্যমান কবি 'অডেসিয়াস'-পুত্র 'টেলেমেকাসে'র মত বসে থাকেন উদগ্রীর তাঁর পিতার প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষায়, যিনি বর্বর-লাঞ্ছিত, নিষ্প্রাণ 'ইথাকা'কে নতুন স্বপ্নে ও অভিজ্ঞতায় তাঁর শৌর্যে-বীর্যে পুনর্গঠিত করতে পারেন—

তুমি কি এখনও আসবে না? স্বদেশের পূর্ণিমায়
কখনো তোমার মুখ হবে নাকি উদ্ভাসিত, পিতা,
পুনর্বার? কেন আজও শুনি না তোমার পদধ্বনি?
...
বিদেশিরা রাত্রিদিন করে গোল ইথাকায় ; কেউ
সযত্নে পরখ করে বর্শার ফলার ধার, শূন্য
মদের রঙিন পাত্র ছুড়ে ফ্যালে কেউ, লাথি ছোড়ে,
কেউবা উত্ত্যক্ত করে পরিচারিকাকে। মাঝে-মাঝে
কেবলি বাড়ায় হাত প্রোষিতভর্তৃকা জননীর
দিকে, যিনি কী-একটা বুনছেন সুচারু কাপড়ে
দিনে, রাতে খুলছেন সীবনীর শিল্প।
...থমথমে আকাশের মতো
সমস্ত ইথাকা, গরগরে জনগণ প্রতিষ্ঠিত
অনাচার, অজাচার ইত্যাদির চায় প্রতিকার।
('*টেলেমেকাস*', *নিরালোকে দিব্যরথ*)

মূলত 'টেলেমেকাসে'র মত কবিও উপনিবেশিত স্বদেশের এক উৎপীড়িত প্রাণ। আর এই কবিতায় বাংলাদেশ 'ইথাকা'রই প্রতিরূপ হয়ে ওঠে। যথার্থই কবিতাটির 'প্রতি পঙ্‌ক্তিতে থমথম করছে বাঙলাদেশ (হুমায়ুন, ২০০৪: ৭৯) আর কবি 'টেলেমেকাসে'র মতই অধীর, স্বপ্নালু চোখে জাতির কর্ণধার পিতার জন্য অপেক্ষমান, যিনি 'ইথাকা'র মতই তাঁর প্রিয় মাতৃভূমিকে পরাধীনতার জিঞ্জির থেকে মুক্ত করবেন।

প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে'র আত্মময় চৈতন্যের কবি *রৌদ্র করোটিতে* ও *বিধ্বস্ত* নীলিমা'য় প্রবলভাবে প্রতিবেশ-সংলগ্ন এবং নানা রক্তাক্ত অভিজ্ঞতা, স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের মধ্য দিয়ে *নিরালোকে দিব্যরথে* এসে হয়েছেন অভিজ্ঞানসম্পন্ন। তবে, ষাটের দশকের শেষ ভাগে উপনীত কবির মধ্যে একটু একটু করে সঞ্চারিত হয় স্বাধীনতা সংগ্রামের উত্তাপ। কবি স্পেনের স্বাধীনতার জন্য আত্মোৎসর্গকারী বিপ্লবী কবি 'লোর্কা'র দ্বারা উদ্বুদ্ধ হন, আর 'লোর্কা'র মত অজর কবিতা লিখতে চান—স্বদেশের নিঃশ্বাস হয়ে যে কবিতা অনুরণিত হবে সর্বত্র—

লোর্কার মতো শিল্পের আবেগে বাতাসে গোলাপের পাপড়ি হয়ে
গিটারে গিটারে গুঞ্জরিত গীতিকবিতা হয়ে,
আন্দালুশীয় মাল্লাদের গান হয়ে
কেঁপেছি থরোথরো, অথচ তাঁর মতো অজর কবিতা—যে-কবিতা
স্পেনের নিঃশ্বাস হয়ে বয়ে চলেছে আজও পাহাড়ে, সমুদ্রতটে,
রমনার পুষ্পিত বুকে, পুরুষের কম্পিত ঠোঁটে—
লিখতে পারবো না কোনোদিন।
('আমার স্বরের ডালে', *নিরালোকে দিব্যরথে*)

নিরালোকে দিব্যরথে'র অব্যবহিত পরের পর্বে শামসুর রাহমানও লোর্কার মতই পরাধীন, বিপন্ন বাংলাদেশকে স্বাধীনতার স্বপ্নের গানে গুঞ্জরিত করে তুলবেন তাঁর কবিতায়, ভিন্ন এক নতুন নান্দনিকতায়।

টীকাঃ

১. What can be said to characterize the Outsider is a sence of strangeness, or unreality...the outsider is a man who cannot live in the comfortable, insulted world of the bourgeois, accepting what he sees and touches as reality. 'He sees too deep and too much', and what he sees is essentially *chaos*...The Outsider is a man who has awakened to chaos. He may have no reason to beleive that chaos is positive, the germ of life...inspite of this, truth must be told, chaos must be faced. (Wilson, 1963: 13-14)

২. প্রতীকবাদী কবিরা 'সিনাসথেসিয়া'র (synaesthesia) প্রয়োগ বলতে বুঝতেন কবিতায় এক ইন্দ্রিয়কে উদ্দীপ্ত করে অন্য ইন্দ্রিয়ের সংবেদনা সৃষ্টির প্রক্রিয়া (জাহাঙ্গীর, ১৯৮৮: ৮)

৩. No! I am not Prince Hamlet, nor was meant to be;
Am an attendant lord, one that will do
To swell a progress, start a scene or two,
Advise the prince; no doubt, an easy tool,
Deferential, glad to be of use,
Politic, cautious, and meticulous;
Full of high sentence, but a bit obtuse;
At times, indeed, almost ridiculous—
Almost, at times, the Fool.

প্রুফ্রকের উদ্বৃত সংলাপে কবি স্বয়ং অনুপ্রবিষ্ট (Eliot, 1936: 7)।

৪. জাঁ বদ্রিলা কথিত 'হাইপাররিয়ালিটি' বা প্রতিরূপ বিভ্রান্তি (simulacra) হলো কল্পনা ও বাস্তবের মধ্যে সঙ্গতি হারানো আধুনিক মানুষের এক অসুখ, যা প্রতিনিয়ত বাস্তবের নানা প্রতিরূপ জনিত ধাঁধাঁ থেকে জন্ম নেয়। উত্তরাধুনিক কবিরা পরাবাস্তবতাকে ভেঙে দিয়ে এইরূপ বহির্বাস্তবতা সৃষ্টির মাধ্যমে কবিতায় স্বপ্নের আধিদৈবিক, পৈশাচিক কিংবা অনৈসর্গিক জগৎকে ভাষারূপ দেন (Baudrillard, 1983: 142)

৫. ... the voice of the author and the character in vnison, saying something apropriate to the character, but something which the author could say for himself also, though the words may not have quite the same meaning for both. That may be a very different thing from the ventriloquism which makes the character only a mouthpiece for the author's ideas or sentiments. (Eliot, 1969: 100)

তথ্যপঞ্জিঃ

অসীম সাহা (২০১৩) ''ষাটের দশক ও *স্যাড জেনারেশন* আন্দোলন'', *নান্দীপাঠ*, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি-ঐতিহ্য বিষয়ক সাময়িকী, সংখ্যাঃ পাঁচ, ফেব্রুয়ারি, ২০১৩ [সম্পা. সাজ্জাদ আরেফিন] সিটি আর্ট প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, পৃ. ১৩০-১৪৩

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস (জুলাই, ২০০২) '' স্মৃতির শহরে কবির জাগরণ'', *কিছুধ্বনি* কবিতাপত্র, শামসুর রাহমান সংখ্যা, ৩৭ বর্ষঃ ২য় সংখ্যা, [সম্পা.আন্ওয়ার আহমদ], মারিয়া প্রিন্টার্স, বগুড়া, পৃ. (৭-১১)

আশরাফ হোসেন খোন্দকার (১৯৯৪) ''রাহমানের চিড়িয়াখানা'', *বাংলাদেশের কবিতা : অন্তরঙ্গ অবলোকন*, বাঙলা একাডেমী, ঢাকা পৃ. (৪৪-৫৬)

জাহাঙ্গীর তারেক (১৯৮৮) *প্রতীকবাদী সাহিত্য*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

জুলফিকার হায়দার (২০১৩) ''ষাটের কবিতা : সন্ত্রস্ত সময়ের শিল্প'', *নান্দীপাঠ*, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি-ঐতিহ্য বিষয়ক সাময়িকী, সংখ্যাঃ পাঁচ, ফেব্রুয়ারি, ২০১৩ [সম্পা. সাজ্জাদ আরেফিন], সিটি আর্ট প্রেস লিমিটেড, ঢাকা পৃ. (১৮৬-২০২)

ফরহাদ মাজহার (জানু-মার্চ, ১৯৯১) ''শামসুর রাহমানের কবিতার একটি রাজনৈতিক পাঠ'', *মীজানুর রহমানের ত্রৈমাসিক পত্রিকা*, ষষ্ঠ বর্ষ : তৃতীয় সংখ্যা, উবিনীগ, পৃ. (৩৭৯-৪০৪)

শামসুর রাহমান (জানু-মার্চ, ১৯৯১) ''পূর্ববাঙলার সাম্প্রতিক কবিতা'', *মীজানুর রহমানের ত্রৈমাসিক পত্রিকা*, ষষ্ঠ বর্ষ : তৃতীয় সংখ্যা, উবিনীগ, পৃ. (২৭৪-২৮১)

শামসুর রাহমান (জানুয়ারি-মার্চ, ১৯৯১) ''শামসুর রাহমানের মুখোমুখি'' [সাক্ষাৎকার. হুমায়ুন আজাদ] *মীজানুর রহমানের ত্রৈমাসিক পত্রিকা*, শামসুর রাহমান সংখ্যা, ষষ্ঠ বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা, উবিনীগ, পৃ. (১০৬-১৩৪)

শামসুর রাহমান (২০০৭) *কালের ধুলোয় লেখা*, অন্যপ্রকাশ, ঢাকা

হুমায়ুন আজাদ (২০০৪) *শামসুর রাহমান : নিঃসঙ্গ শেরপা*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা

Baudrillard, Jean (1983) *The Precession of Simulacra* [Trans. Paul Foss, Paul Patton and Philip Beitehman], Semiotertce, U.S.A.

Burkhardt Armin and Nerlich Brigitte [ed.] (2010) *Tropical Truth(s),* Gruyter Gmblt & Co, Germany

Eagleton, Terry (2007) *How to Read a Poem*, Blackwell Publishing Ltd, U.K.

Eliot, T.S. (1936) *Collected Poems 1909-1962*, Harcourt, Brace & World, Inc. New York

Eliot T.S. (1969) *On Poetry and Poets*, Faber and Faber Limited, London

Eliot T.S. (1976) *Selected Essays*, Faber & Faber Limited, London

Pound, Ezra, (1966) *A Retrospect, Poets On Poetry* [ed. Norman Charles] The Free Press, New York, Page. (320-333)

Riley Denise [ed.] (1992), *Poets on Writing*, Macmillan Academic and Provessional LTD, London

Wilson, Colin (1982) *The Outsider*, foreword by Marlyn Ferguson, Penguin Putnam inc., New York

দ্বিতীয় অধ্যায়: দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
পুনরাবৃত্তি, সমান্তরালতা ও তালিকায়ন: শব্দ-ভাষার বিন্যাস

কবিতার বিবর্তনের ক্ষেত্রে পারিপার্শ্বিক পরিবর্তনের সাথে-সাথে কবির রীতি-সচেতনতা অপরিহার্য। শামসুর রাহমান তাঁর কবি-জীবনের দীর্ঘ সময়ে বারংবার বিবর্তিত হয়েছেন। সময় ও জীবনসৃষ্ট বাহ্যিক ও আত্মিক সংকট ও নানা সংবেদনায় পরিবর্তিত হয়েছে তাঁর মানসলোকের চেতন-অবচেতন। সে সব রূপান্তর প্রকাশের ঐকান্তিক দায়বদ্ধতা ফর্ম-সচেতন কবিকে ক্রমাগত ব্যাপৃত করেছে নতুনতর আঙ্গিক সাধনায়। শামসুর রাহমানের ভাষায়—'বহির্জগত এবং অন্তর্জগতের দিকে দৃষ্টি রেখে কবির একজন প্রকৃত সাধকের মতই নিরন্তর সাধনা করে যাওয়া উচিত' (শামসুর, ২০০৭: ২২৭)।

কবি-জীবনের শুরুতে শামসুর রাহমান স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছিলেন যে 'ভীষণ, রুক্ষ নির্বাসন', *রৌদ্র করোটিতে*'তে নাগরিক জীবনের বিচিত্র তরঙ্গ-সন্নিহিতিতে তা কলরোলময় হয়ে ওঠে। *নিরালোকে দিব্যরথ* পর্যন্ত নিরবিচ্ছিন্নভাবে পুরনো ঢাকার নাগরিক জীবন ও প্রতিবেশের মধ্যেই আবর্তিত ছিল তাঁর কবিতা। *নিজ বাসভূমে* (১৯৭০) থেকে *ফিরিয়ে নাও ঘাতক কাঁটা* (১৯৭৪) পর্যন্ত রাহমানের কবিতা আবর্তিত হয় বাংলাদেশের ইতিহাস ও এ দেশের মানুষের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে কেন্দ্র করে। ভাষা-আন্দোলনের রক্তাক্ত স্মৃতির উত্তরাধিকার এবং ঊনসত্তরের গণ অভ্যুত্থানের অভিঘাতই মূলত তাঁকে প্রথম জনচেতনার সাথে সম্পৃক্ত করে। শামসুর রাহমান আশি ও নব্বইয়ের দশকেও প্রচুর রাজনৈতিক কবিতা রচনা করেছেন কিন্তু তার প্রথম ও প্রবল প্রকাশ ঘটে সত্তরের দশকে রচিত এই পর্বের কাব্যসমূহে।

যদিও রাহমানের কবিতার বিবর্তন মূলত ব্যক্তিক এবং ঐকান্তিক, তবু তা বাংলার গণমানুষের বিপ্লবী চেতনার প্রতিধ্বনি হয়ে ওঠে সময়ের দাবিতেই। *প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে* কাব্যের অব্যবহিত পর থেকেই আত্মলোকবাসী কবি বহির্জগতের সংশ্রবে ধীরে-ধীরে নগরজীবনের একজন হয়ে উঠতে থাকেন এবং *নিজ বাসভূমে* থেকে স্বদেশের সংকটে সেই বহির্যাত্রা শিল্পচেতনার নতুন মাত্রা স্পর্শ করে। কিন্তু এ বিবর্তন কবির মৌল স্বভাব থেকে মূলোদ্ভিন্ন কোনো উত্তরণ নয়, যা তাঁকে নতুনভাবে দায়বদ্ধ করতে পারে শুধু বিষয়-নিষ্ঠায়। তাই লোরকা বা নেরুদার মত বৃহদার্থে

সমষ্টি-চেতন কবিদের তুলনায় তিনি দ্বিতীয় পর্যায়েও প্রায় স্বাধীনভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছেন তাঁর কবিতার বিষয় ও নান্দনিক স্বভাবকে। শামসুর রাহমান বরাবরই রাজনৈতিকভাবে দায়বদ্ধ কবি নন, কিন্তু জীবদ্দশায় আলোড়িত হয়েছেন স্বদেশের প্রতিটি রাজনৈতিক বিপ্লবেই। কারণ, তিনি সমকাল-সচেতন, সৎ ও দায়িত্বশীল কবি। অন্তঃপ্রেরণার তাগিদেই তিনি একাত্ম হয়েছেন বিভিন্ন সময়ে দেশের রাজনৈতিক সংঘটনগুলোর সাথে। 'বহির্জগত' অর্থাৎ স্বদেশের সংকট *নিজ বাসভূমে* থেকে শামসুর রাহমানকে এক নতুন প্রকাশমুখর নান্দনিকতায় প্রভাবিত করলেও তাঁর কবিতা তীব্র ঝাঁঝালো সেই সময়েও স্লোগানসর্বস্ব হয়ে ওঠেনি এই অন্তর্জাগতিক ও বহির্জাগতিক সংশ্লেষণের অপরিহার্যতায়। *নিজ বাসভূমে* থেকে শুরু করে এ পর্যায়ের কাব্যগুলোতে জনসংশ্লিষ্টতার সাথে শিল্প-সচেতনতার অন্তর্গত প্রতিশ্রুতির স্বীকারোক্তি মেলে কবির আত্মজীবনীর পাতায়—

> স্বীকার করছি, আমার কবিতা যে একটি বাঁক নিয়েছে *নিজ বাসভূমেতে*, এমন উক্তি সত্যে উদ্ভাসিত, তবে কবিতার সর্বনাশ ঘটানোর ক্ষমতা আমার ঝুলিতে গরহাজির। আমাদের জাতীয় জীবনের বেশ কিছু ঘটনা আমাকে আন্দোলিত করেছে, আমি কিছু কিছু কবিতায় সে সব স্পন্দনকে রূপায়িত করতে অনুপ্রাণিত হয়েছি। একাত্মবোধ করেছি উৎপীড়িত, দুঃখী আমজনগণের সঙ্গে। আমি তাদের দুঃখ কষ্ট মোচনের ক্ষমতা ধারণ করি না—এ ক্ষেত্রে আমি অসহায়, নাচার। কিন্তু সমাজের অনাচার, অবিচার, শাসকের অপশাসন এবং বেয়াড়া লুণ্ঠনের কথা তো আকারে ইঙ্গিতে হলেও প্রকাশ করার ক্ষমতা রাখি। সেটুকু কাজ করার জন্য লেখনীকে তো ব্যবহার করতেই পারি। তবে সে সব কথা লিখতে গিয়ে প্রপাগাণ্ডার কাঁধে সওয়ার হইনি সিন্দাবাদের নাছোড় বুড়োর মতো। কবিতাকে যথাসাধ্য কবিতাই রাখতে চেয়েছি (শামসুর, ২০০৭ : ২২৭)।

লক্ষণীয় যে, গণ অভ্যুত্থান ও স্বাধীনতা যুদ্ধের কালে রচিত দ্বিতীয় পর্যায়ের কাব্যগুলোতে কবি কেবল দৈশিক রাজনৈতিক বিষয়েই নিবদ্ধ থাকেননি। সামাজিক পরিবর্তন ও সমকালীন সমাজচৈতন্যের নানা প্রসঙ্গ—যেমন, অর্থনৈতিক মন্দা, বেকারত্ব, শ্রেণীবৈষম্য, ১৯৭০' এর বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়, চেনা শহরের দ্রুত বদলে যাওয়া—এ সমস্ত কিছুকেও কবি স্থান দিয়েছেন তাঁর বিভিন্ন কবিতায়। বস্তুত, *নিজ বাসভূমেতেও* 'মোমগন্ধী ইকারুসে'র মত তিনি শহরের পার্কে-পার্কে ঘুরে বেড়িয়েছেন—ফুটপাতে, এভিনিউয়ে, বিপ্লবের সাক্ষ্যবাহী ভীষণ নির্জন কিংবা হঠাৎ হত্যা-প্রকম্পিত রাজপথে। কবির সন্ত্রস্ত প্রহরগুলো ছিল না নিতান্ত প্রেমহীন, কামনা-বর্জিত। 'একপাল জেব্রা'র মত ভিড় করে আসা পঙ্‌ক্তিগুলোর পেছনে তিনি তখনো ছুটেছেন কবিতার শাঁ-শাঁ ট্রেনকে অন্তিম স্টেশনে পৌঁছে দিতে ('একপাল জেব্রা', *নিজ বাসভূমে*)। যদিও যুগ-সচেতন কবি দৈশিক সংকটে সৎভাবেই জনতার সাথে অভিন্ন বিপন্নতায় একস্বরিক, তবু 'ডিমের খোলের অন্তঃস্থলে যেতে' তাঁর ভালো লাগে তখনো। নৈঃশব্দের ধ্যান ভাঙতে চান না তিনি মুহূর্তের জন্যও। রাত-বিরেতে ভাবনার 'ময়ূরগুলো' ডেকে ওঠে

কবির সত্তায়।'রাজেন্দ্রাণী শব্দ'গুলো যেন হাতের মুঠো থেকে পিছলে না যায় 'স্তনে'র মত, সেই উৎকণ্ঠায় বিপন্ন থেকেছেন কবি তখনো। *নিজ বাসভূমে থেকে ফিরিয়ে নাও ঘাতক কাঁটা* পর্যায়ে রচিত কাব্যগুলোতে বহির্জগতের যুদ্ধের সাথে-সাথে কখনো থেমে থাকেনি কবির অন্তর্গত শৈল্পিক রক্তপাত। বস্তুত, কবিতাও তো কবির এক ক্ষমাহীন যুদ্ধ, যে যুদ্ধের শেষ নেই—

এ যুদ্ধের শেষ নেই। প্রতিপল অনুপল শুধু
গোলাবর্ষণের ধুম, ক্রুদ্ধ এরোপ্লেনের ছোঁ মারা
চলে অবিরাম, চূর্ণ ব্রিজ। সাবমেরিন হঠাৎ
ফুটো করে জাহাজের তলা। ট্রেঞ্চ খুঁড়ি প্রাণপণে
কখনো মাইন পাতি সুকৌশলে : একান্ত জরুরি
শত্রুকে ঘায়েল করার ছলে বলে। দিগন্ত-ডোবানো
চিৎকারে চমকে উঠি, প্রেতায়িত প'ড়ে থাকে কত
মাটি-মগ্ন হেলমেট, শতচ্ছিন্ন টিউনিক, হাড়।
...
কখনো জ্বরের ঘোরে দেখি, ওরা আসে উদ্ধারের
প্রবল আশ্বাস নিয়ে—বিশেষণ, বিশেষ্য এবং
ক্রিয়াপদ, আমার আপন সেনা, ওরা আসে; কিন্তু
তারাই আমার শত্রু, অতর্কিতে করে আক্রমণ—
ঘামে-ভেজা ক্লান্ত চোখে দোলে জয়, দোলে পরাজয়।
('এ যুদ্ধের শেষ নেই', *নিজ বাসভূমে*)

প্রতিনিয়ত অন্তর্গত যুযুৎসার নামান্তর এই শিল্পচেতনাই শামসুর রাহমানের এ পর্যায়ের কবিতাকে প্রপাগান্ডাপ্রবণ, শ্লোগানধর্মী, চিৎকৃত করে তোলে না বরং প্রগাঢ় মাত্রাচেতনায় বরাবরের মতই দৈশিক সংকটের সাথেও কবিতার নান্দনিকতাকে সমন্বিত করে তোলে। তবে, 'ললাটে নিদারুণ জড়ুল' বয়ে নিয়ে, 'জনহীন শূন্যতায়' কবিতার ভজনা করেছিলেন যিনি একদা, তিনিই বর্ণমালার বিপন্নতার দিনগুলোতে প্রতিবাদী হয়ে ওঠেন, ৬৯'এ অভ্যুত্থানের শ্লোগানে সুর মেলান এবং পার্কের ভেতর সবার অলক্ষে 'স্বাধীনতা' নামের এক 'সুহাস চারা' রোপণ করার স্বপ্ন দেখেন। ফলে, এ পর্যায়ের কবিতাগুলো শামসুর রাহমানের আত্মক্ষয়ী ব্যক্তিচেতনা নিরপেক্ষ যেমন নয়, তেমনি এ কথাও অনস্বীকার্য যে, কবিতার জন্য স্বাধীনতা এবং স্বাধীনতার জন্য কবিতা রচনার অভিপ্রায়ও অব্যক্ত থাকেনি কাব্যগুলোতে। একারণেই *নিজ বাসভূমে থেকে ফিরিয়ে নাও ঘাতক কাঁটা* পর্যায়ের কবিতাগুলোর প্রধান প্রসঙ্গ বিপ্লব ও স্বাধীনতা হলেও বিষয়ের অন্যান্য বিচিত্রতা যেমন উপেক্ষণীয় নয়, একইভাবে আঙ্গিকের ক্ষেত্রেও কবিতাগুলোর কোনো-কোনোটির মধ্যে রয়েছে রাহমানীয় পূর্বজ স্বভাব-পরম্পরা। আবার এই রচনা পরিধিতেই লক্ষ করা যায় জনসংশ্লিষ্টতার সাথে সঙ্গত তাঁর নতুন, উৎকেন্দ্রিক এক ফর্ম-সংস্থাপনের প্রয়াস। এ পর্বের কবিতায় একদিকে আছে মিথ, প্রতীক, চিত্রকল্পে ভাষার অন্তর্ময় প্রকাশ, অপরদিকে রয়েছে সহজ-সরল, পুনরাবৃত্তিপ্রবণ সমান্তরাল ও প্রকাশধর্মী

নব্যরীতির অনুশীলন। মূলত এই দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যটিই কবির এ পর্যায়ের কাব্যের নান্দনিক রূপান্তর সাধন করে। ভাব প্রকাশে কবি অবলম্বন করেন এক নতুন ধরনের রোমান্টিকতা, যা ঠিক আত্মময় রহস্যতন্ময় কোনো নৈর্ব্যক্তিকতার ভাব প্রকাশ করে না। বরং ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা থেকে আবেগের ঐক্যে এক নাটকীয় লিরিক বিন্যাসে কবির ভাব সেখানে সর্বসাধারণীকৃত হয়। সেখানে বিষয়ের চেয়ে ফর্ম বেশি আকর্ষণীয়। কবিতার রৈখিক বিন্যাসের পরিবর্তে পঙ্‌ক্তি ও স্তবক-পরম্পরায় আনুভূমিক অথচ সমান্তরাল, পুনরাবৃত্তিময় অথচ ক্লান্তিহীন, সুরেলা, স্বতঃস্ফূর্ত এবং নতুন গতিশীল, সংসর্পিত ফর্মকে কবি প্রতিস্থাপন করেন এ পর্যায়ের কাব্যে। বস্তুত, শামসুর রাহমান পশ্চিমা কবিতার ষাট দশকীয় আধুনিক রীতির নতুন লিরিক-স্বভাব ও নব্যরোমান্টিকতাকে অত্যন্ত অভাবনীয়ভাবে দেশ-কাল-ইতিহাসের সাথে অনন্যসূত্রে সম্পর্কিত করে তোলেন তাঁর এ পর্যায়ের কবিতাতে। প্রতিবাদ, প্রতিরোধ ও সময়ের সংকটকে উপস্থাপনের জন্য কবি যে নান্দনিকতাকে অপরিহার্য করে তোলেন তাঁর এ পর্যায়ের কাব্যগুলোতে, তা ষাটের দশকের ইংল্যাণ্ডের লিভারপুল কবিদের বহুল চর্চিত শব্দ-ভাষার পুনরাবৃত্তি রীতি (Repeatition) ও কাঠামোর সমান্তরালতার (Parallelism) কৌশল।

ঊনসত্তরের গণ অভ্যুত্থান থেকে ৭১' এর মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা ও তার অব্যবহিত পরের কাল-প্রতিবেশ শামসুর রাহমানের দ্বিতীয় পর্যায়ের কাব্যের প্রেক্ষাপট। ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান ছিলো তদানীন্তন পশ্চিম পাকিস্তানের কেন্দ্রীভূত সামরিক-আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের প্রবল জাগরণ, প্রতিবাদ, বিদ্রোহ ও বিপ্লব, যার চূড়ান্ত পরিণতি বাঙালি জাতির অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম ও স্বাধীনতা অর্জন। দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ বিভক্ত হয়ে যে ধর্মভিত্তিক নতুন পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠিত হয়, তাতে পূর্বাপর ছিলো রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈষম্য। ফলে, পূর্বপাকিস্তান জন্মমাত্রই হয়ে ওঠে জতুগৃহ। পূর্ব বাংলার উপর পাকিস্তান রাষ্ট্রের সাংস্কৃতিক আধিপত্যের মনোভাব, বিশেষত বাংলা ভাষার উপর নিয়ন্ত্রণ প্রথম এদেশের মানুষের মনে স্বতন্ত্র জাতীয় চেতনা গঠনের ভিত্তি রচনা করে। ৫২'র ভাষা-আন্দোলন ছিল পরবর্তী প্রায় দুই দশক জুড়ে বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনের উপক্রমণিকা। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের স্বৈরশাসনে ভাষা-আন্দোলনের রক্তাক্ত স্মৃতিতে আবারো উদ্বোধিত হয় বাঙালির জাতীয় চৈতন্য। শোষণ-শাসন-বঞ্চণা-ক্ষোভের পুঞ্জীভূত প্রকাশ ঘটে ৬৮'র প্রবল গণবিক্ষোভে, ৬৯'এর গণঅভ্যুত্থানে, যা বাঙালি জাতিকে তার অবিকল্প স্বাধীনতা সংগ্রামের নির্দেশনা দেয়। সুতরাং, বাঙালি জাতির মহান স্বাধীনতা মুলত ৫২' এবং ৬৯' এর আন্দোলন ও ৭১'এর সংগ্রামের ধারাবাহিক পরিণতি।

বস্তুত, বায়ান্ন সালের আন্দোলন ও আত্মত্যাগের বিনিময়ে বাঙালির ভাষাগত অর্জন সত্ত্বেও ৬৮' সাল থেকে পুনরায় স্বৈরশাসক আইয়ুব খান নানা কৌশলে বাঙালির বর্ণমালাকে কলুষিত করতে উদ্যত হন। ১৯৬৮ সালের শেষভাগে তিনি পাকিস্তানের সব ভাষার জন্য রোমান হরফ এবং একটি সাধারণ ভাষা চালু করার প্রস্তাব জারি করেন। তখন বাংলার সচেতন শিল্পী, সাহিত্যিক, সাংবাদিকগণ তার লিখিত প্রতিবাদ জানান (শামসুর, ২০০৭, ২২৫)। অক্ষরবৃত্ত ছন্দে লেখা *নিজ বাসভূমে* কাব্যে শামসুর রাহমানের 'বর্ণমালা, আমার দুঃখিনী বর্ণমালা' কবিতাটি সেই চেতনা উৎসারিত—

তোমাকে উপড়ে নিলে, বলো তবে, কী থাকে আমার?
ঊনিশশো বাহান্নোর দারুণ রক্তিম পুষ্পাঞ্জলি
বুকে নিয়ে আছ সগৌরবে মহীয়সী।
সে-ফুলের একটি পাঁপড়িও ছিন্ন হ'লে আমার সত্তার দিকে
কত নোংরা হাতের হিংস্রতা ধেয়ে আসে।
এখন তোমাকে নিয়ে খেঙরার নোংরামি,
এখন তোমাকে ঘিরে খিস্তি-খেউড়ের পৌষমাস,
তোমার মুখের দিকে আজ আর যায় না তাকানো,
বর্ণমালা, আমার দুঃখিনী বর্ণমালা।
('বর্ণমালা, আমার দুঃখিনী বর্ণমালা', *নিজ বাসভূমে*)

৫২'র ভাষা আন্দোলনের দগদগে ক্ষত আবারো উস্কে ওঠে ষাটের দশকের স্বৈরশাসনে। অবরুদ্ধ শব্দমালাকে সঙ্গী করে সে সময় প্রায় প্রত্যেক সংবেদনশীল কবিই বর্ণমালার প্রতি গভীর মমত্ব অনুভব করেছেন। শামসুর রাহমানের 'বর্ণমালা, আমার দুঃখিনী বর্ণমালা'ও বাংলা ভাষার প্রতি আজন্মলালিত মমতা আর অধুনা জন্ম নেয়া অনুকম্পার বোধ থেকেই রচিত, ১৯৬৮ সালে। শৈশব-কৈশোরে সত্তায় বর্ণমালার মমতাময় সান্নিধ্যের স্মৃতি, ৫২ তে সংগ্রামী সত্তায় তার ক্ষিপ্র আয়ুধের মত ঝলসে ওঠা, ৬৮'তে গৌরবদীপ্ত মহীয়সী বর্ণমালার আবারো লাঞ্ছনা—এ সব কিছুকে কবি বিভিন্ন চিত্রকল্পে, গভীর মমতায়, লিরিকের মত সুরে গেঁথেছেন 'বর্ণমালা, আমার দুঃখিনী বর্ণমালা' কবিতায়। E.E Cummings (১৮৯৪-১৯৬২) এর কবিতার মত কখনো সুরেলা, কখনো হঠাৎ আবার শব্দ-বিভাগের বিন্যাসে কবিতাটি অভিনব। কামিংস পূর্বজ কবি শেক্সপিয়রের ঐতিহ্যিক কাব্যের ধরন থেকে বেরিয়ে আসার জন্য কবিতার মুদ্রণ-প্রথার মধ্যেও ভাঙন আনতে চেয়েছিরেন। ফরে, তাঁর কবিতায় ভাঙা পঙ্‌ক্তি ও শব্দ-বিভাগের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন (সুধীন্দ্রনাথ, ১৯৯৫: ৩৯-৪০)। কামিংসের পর ষাটের দশকের মধ্যভাগে লিভারপুল কবিদের কবিতায়ও একই পদ্ধতির অনুসরণ লক্ষ

করা যায়। পঙ্‌ক্তি-ভাঙার খেলা খেলেছেন লিভারপুল কবি আড্রিয়ান হেনরি তাঁর অনেক কবিতায়, যেমন নিম্নে উদ্ধৃত 'In the Midnight Hour' কবিতার শেষাংশ—

in the
moonlight
midnight
hour
country girl

I will bring you

Yellow
White
eyes
bright
moon
light
mid
night
flowers
in the midnight hour

(Adrian Henri, Roger McGough, Brian Patten, 1975: 20)

চিত্রকল্পে গাঁথা, লিরিক বিন্যাসের 'বর্ণমালা, আমার দুঃখিনী বর্ণমালা' কবিতাটির মধ্যভাগে এসে ভাষাকে ক্ষিপ্রতা দেবার জন্য শামসুর রাহমানও একই পদ্ধতিতে পঙ্‌ক্তি ভেঙে দেন এমনকি শব্দকে বিচ্ছিন্ন করে দেন নিম্নরূপে—

আমার এ অক্ষিগোলকের মধ্যে তুমি আঁখিতারা।
যুদ্ধের তাণ্ডবে,
প্রবল বর্ষায়
কি অনাবৃষ্টিতে,
বারবণিতার
নুপূর নিক্কনে,
বণিতার শান্ত
বাহুর বন্ধনে
ঘৃণায় ধিক্কারে,
নৈরাজ্যের এলো-
ধাবাড়ি চিৎকারে
সৃষ্টির ফাল্গুনে
হে আমার আঁখিতারা তুমি উন্মীলিত সর্বক্ষণ জাগরণে।
('বর্ণমালা, আমার দুঃখিনী বর্ণমালা', নিজ বাসভূমে)

এভাবে ভাঙা পঙ্‌ক্তির বিন্যাসে (line-break) কবি কবিতায় একধরনের দৃশ্যমানতা তৈরি করেন, যা উপমা-উৎপ্রেক্ষায় গাঁথা সম্পূর্ণ কবিতাটির লিরিক স্বভাবকে ভেঙে দিয়ে স্তবকটিকে বিশেষায়িত

করে। পাঠক কবিতার এই যতিভেদ এবং গতিভেদ সম্পর্কে উৎসুক হয়। কবিতার মন্থর গীতলতার মধ্যে কবি হঠাৎ গতি সঞ্চার করেন এভাবে এবং এভাবেই বর্ণমালার সাথে আমাদের শোষণ-সংগ্রাম-বঞ্চণা-প্রেরণার নানা ইতিহাস শিল্পিত হয় কোমল-কঠোর শব্দ-ভাষার সন্নিবেশনে।

নিজ বাসভূমে কাব্যটি মূলত ৬৮'র গণ-আন্দোলন ও ৬৯'এর গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে রচিত। কিন্তু ৬৯' এর গণদাবী, প্রতিবাদ, মিছিল, সভা সব বাঙালির মত কবির স্মৃতিতেও প্রতিবর্তী ক্রিয়ায় জাগ্রত করে বায়ান্নোর ভাষা-আন্দোলনের রক্তাক্ত স্মৃতি। কারণ, 'একুশের কৃষ্ণচূড়া আমাদের চেতনারই রঙ'। কবির মনে হয় বায়ান্নোর বিদ্রোহী সালাম-বরকতই ঊনসত্তরের উত্তাল রাজপথে ফিরে আসে আবার—

বুঝি তাই ঊনিশশো-ঊনসত্তরেও
আবার সালাম নামে রাজপথে, শূন্যে তোলে ফ্লাগ,
বরকত বুক পাতে ঘাতকের থাবার সম্মুখে
সালামের বুক আজ উন্মথিত মেঘনা,
সালামের মুখ আজ তরুণ শ্যামল পূর্ববাংলা।

দেখলাম রাজপথে, দেখলাম আমরা সবাই জনসাধারণ
দেখলাম সালামের হাতে অবিনাশী বর্ণমালা
আর বরকত ব'লে গাঢ় উচ্চারণে
এখনও বীরের রক্তে দুঃখিনী মাতার অশ্রুজলে
ফোটে ফুল বাস্তবের বিশাল চত্বরে
হৃদয়ের হরিৎ উপত্যকায়।

('ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯', *নিজ বাসভূমে*)

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিতে শব্দ ও শব্দগুচ্ছের পুনরাবৃত্তিতে কবি যথাক্রমে ৪র্থ ও ৫ম এবং ৬ষ্ঠ ও ৭ম পঙ্‌ক্তিতে সমান্তরালতা (Parallelism)[১] সৃষ্টি করেছেন। কখনো কখনো একই শব্দ দু'টি পঙ্‌ক্তিতে, বিশেষত দুই পঙ্‌ক্তির শুরুতে বসে পঙ্‌ক্তিদ্বয়ের মধ্যে কেবল সংযোগ সাধনই করে না বরং সমান্তরালতার আবহও তৈরি করে। ভাষার সেই সমান্তরাল স্বভাবকে রাহমানও সহজাত করে তুলেছেন উদ্ধৃত পঙ্‌ক্তিমালায়।

বাক্-স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, কৃষকের খাজনা হ্রাস, শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি, জরুরি আইন প্রত্যাহার, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহারসহ মোট ১১ দফা দাবি নিয়ে সচেতন ছাত্রসমাজ ৬৯' এর ১৪ জানুয়ারি থেকেই প্রকাশ্যে আন্দোলনে ব্রতী হয়। ১৪৪ ধারা ভেঙে পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকের সমস্ত প্রতিরোধ ব্যর্থ করে বাঙালি যখন ধর্মঘটকে সফল করে তুলেছে, তখন ২০

জানুয়ারি পুলিশের গুলিতে নিহত হন মিছিলের সম্মুখভাগে শ্লোগানরত ছাত্রনেতা আসাদুজ্জামান। আসাদের মৃত্যু গণ আন্দোলনকে বিদ্যুৎগতিতে ত্বরান্বিত করে। বাংলার রাজপথ উত্তাল হয়ে ওঠে ছাত্র, কৃষক, কুমোর, তাঁতি, কেরাণিসহ সর্বস্তরের পেশাজীবী মানুষের দীর্ঘ মশাল মিছিলে (লেনিন, ১৯৯৭: ৪৬০-৪৬৭)। শামসুর রাহমানের 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতাটি সেই প্রবল গণজাগরণেরই অনুরণন—

আমি দূর পলাশতলির
হাড়্ডিসার ক্লান্ত এক ফতুর কৃষক,
মধ্যযুগীয় বিবর্ণ পাটের মতো ধূ-ধূ ,
আমি মেঘনার মাঝি, ঝড়-বাদলের
নিত্য সহচর
আমি চটকলের শ্রমিক,
আমি মৃত রামাকান্ত কামারের নয়ন-পুত্তলি,
আমি মাটিলেপা উঠোনের
উদাস কুমোর, প্রায় খ্যাপা, গ্রাম উজাড়ের সাক্ষী,
আমি তাঁতি সঙ্গীহীন, কখনো পড়িনি ফারসি, বুনেছি কাপড় মোটা-মিহি
মিশিয়ে মৈত্রীর ধ্যান- তাঁতে,

আমি
রাজস্ব দফতরের করুণ কেরানি, মাছি-মারা তাড়া খাওয়া,
আমি ছাত্র, উজ্জ্বল তরুণ, আমি নব্য কালের লেখক,
. . .
আমরা সবাই
এখানে এসেছি কেন ? এখানে কী কাজ আমাদের?
কোন সে জোয়ার
করেছে নিক্ষেপ আমাদের এখন এখানে এই
ফাল্গুনের রোদে? বুঝি জীবনেরই ডাকে
বাহিরকে আমরা করেছি ঘর, ঘরকে বাহির।
('ফেব্রুয়ারি ১৯৬৭', *নিজ বাসভূমে*)

ঊনসত্তরের উত্তাল তরঙ্গে কবি যেমন মিশে যান, তেমনি তাঁর শব্দ-ভাষাকেও অর্গলমুক্ত করে দেন তিনি। উপরের উদ্ধৃতিতে মুহূর্মুহূ 'আমি' সর্বনামের পুনরাবৃত্তিতে 'anaphora'[২] অলংকার প্রয়োগের মাধ্যমে এবং একেকটি চরিত্র প্রতীকী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে কবিতাটিকে সমগ্র বাঙালির সত্তার ঐকতানরূপে ঝংকৃত করে। 'অ্যানাফোরা' কবিতার এক বিশেষ অলংকরণ কৌশল, যেখানে পঙ্‌ক্তির প্রথম শব্দ বা শব্দগুচ্ছের পুনরাবৃত্তির মধ্য দিয়ে সমস্ত কবিতায় অথবা কবিতাংশে শব্দ-ধ্বনির একটি কাঠামো তৈরি করা হয়। অনুরূপভাবে, ৬৯' এ ঢাকার রাজপথের সর্বব্যাপ্ত মিছিলকে শব্দ-পুনরাবৃত্তিরই অপর এক কৌশল 'antistrope'[৩] এর বিন্যাসে কবি প্রকাশ করেছেন 'পুলিশ-রিপোর্ট' কবিতার নিম্নোক্ত স্তবকে—একজন পাকিস্তানী সৈন্যের পরোক্ষ প্রেক্ষণবিন্দুতে—

চতুর্দিকে তরঙ্গিত মাথা,
উত্তাল, উদ্দাম।
সড়কের দু'কূল-ছাপানো
লোক, শুধু লোক।
লোক,
আমাদের চোখের পাতায়
লোক
লোক,
পাঁজরের প্রতিটি সিঁড়িতে
লোক।
লোক,
ধুকপুকে বুকের স্কোয়ারে
লোক।
('পুলিশ রিপোর্ট', *নিজবাসভূমে*)

গ্রিক 'antistrophe' শব্দের অর্থ 'ফিরে-ফিরে আসা'(turning back)। এটি এমন একটি পুনরাবৃত্তিমূলক অলংকার-কৌশল, যেখানে একই শব্দ পঙ্‌ক্তি বা পঙ্‌ক্তিমালার অগ্রভাগে ও প্রান্তে বসে, অর্থাৎ বাক্য বা বাক্যাংশের শুরুতে এবং শেষে সমস্বরে উচ্চারিত হয়ে একটি ধারাবাহিক ও ভারসাম্যপূর্ণ লিরিক বিন্যাস তৈরি করে। কবি মূলত কোন একটি বিশেষ শব্দকে প্রত্যক্ষ করে তুলতে এই কৌশলটি কবিতায় ব্যবহার করে থাকেন। শামসুর রাহমান গণ অভ্যুত্থানের মিছিলে শামিল হওয়া লোকারণ্যকে প্রকট করে তুলতে 'লোক' শব্দটির এই বিশেষ আবর্তন ঘটিয়েছেন।

বস্তুত যে শহর এতোদিন কবির কাছে ছিল 'মাতৃগর্ভের' মত উষ্ণ, যে শহর কবির মগজের কোষে-কোষে সঞ্চারিত করত নানা সংবেদনা আর কবির মস্তিষ্কই হয়ে উঠতো এক বহ্নিমান শহর, যুদ্ধ ও সংক্রান্তিতে আজন্ম পরিচিত কবির সে শহর বদলে যেতে থাকে। শহর ও শহরবাসী প্রত্যেকে ভীষণ সন্ত্রস্ত, কারফিউ-উৎকর্ণ সর্বদা। যে নগরের ব্যস্ত জীবনের অমিয়-গরল প্রতিদিন কবি পান করতেন ঝাঁঝাঁলো মদের মত, যার অলি-গলি-এভিনিউ-পার্কের বিচিত্র object কবির কবিতার প্রধান রসদ ছিল, তাও ক্রমে বাড়ন্ত হয়ে আসে। কবির প্রাণচঞ্চল শহর ক্রমশ হয়ে ওঠে 'ভয়াবহ শবাগার' এক। ঊনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটেই কবি প্রথম অনুভব করেন শহরের এই পরিবর্তন। 'এ শহর' শব্দগুচ্ছের (phrase) পুনরাবৃত্তিতে 'অ্যানাফোরা'র আঙ্গিকে বদলে যাওয়া সেই শহরের চরিত্র নিরূপণ করেন কবি 'এ শহর' কবিতায়—

এ-শহর দারুণ দুক্ষোভে ছেঁড়ে চুল, ঠোকে মাথা
কালো কারাগারের দেয়ালে,
এ-শহর ক্ষুধাকেই নিঃসঙ্গ বাস্তব জেনে ধূলায় গড়ায় ;

এ-শহর পল্টনের মাঠে ছোটে, পোস্টারের উল্কি-ছাওয়া মনে
এল গ্রেকো ছবি হয়ে ছোঁয় যেন উদার নীলিমা,
এ-শহর প্রত্যহ লড়াই করে বহুরূপী নেকড়ের সাথে।
('এ-শহর', নিজ বাসভূমে)

কখনো প্রচণ্ড বিপ্লবে রাস্তাঘাট প্রকম্পিত, কখনো হরতাল-কারফিউয়ের খাঁ-খাঁ শূন্যতা ও অন্ধকার। স্বজনের শবের স্মৃতি বুকে নিয়ে নিরীহ, জীবন্মৃত মানুষের দারুণ উৎকণ্ঠা, ভয় ও বিভীষিকা নিয়ে জেগে থাকা তখন প্রতিদিনের বাস্তবতা। সমস্ত শহর কাঁটাতারে ঘেরা। কাঁটাতার যেন ঘাতকের সঙ্গিন হয়ে বিদ্ধ করে কবিকে—নিদারুণ 'ক্রুশকাঠ' হয়ে ঝোলে জীবনের সম্মুখে। 'কাঁটাতার, কাঁটাতার' শব্দ-জোড়ার সমান্তরাল প্রয়োগে কাঁটাতারকীর্ণ হয়ে ওঠে তাঁর নিম্নোক্ত কবিতাটি—

কাঁটাতার, কাঁটাতার।
ড্রাগনের বিষদাঁতের মতন
চৌদিকে কী-যে সন্ত্রাস ছোড়ে
কাঁটাতার, কাঁটাতার।
. . .
এ ব্যাপক কাঁটাতারে
জীবন ঝুলছে, যেন ক্রুশকাঠ;
শহরে শহরে, ধূ-ধূ প্রান্তরে
কাঁটাতার, কাঁটাতার।
('কাঁটাতার', *বন্দী শিবির থেকে*)

মাঝে-মাঝে হত্যা প্রকম্পিত, স্লোগান-উপচিত রক্তাক্ত শহরের বুকে নেমে আসা হঠাৎ শূন্যতাকে কবির মনে হয়েছে গ্রিক অ্যাম্ফিথিয়েটার-ফেরত দর্শকদের বিক্ষত হৃদয়ের গোপন হাহাকারের মত—

পঞ্চমাঙ্ক শেষ, ফিরে যাচ্ছি.....
চৌদিকে শবের ছড়াছড়ি, ফিরে যাচ্ছি.....
ভাঁড়ের কেবলি ভয়, কখন মাড়িয়ে দেয় নায়কের শব,
ফিরে যাচ্ছি—
বিকৃত শবের গন্ধ নিয়ে ফিরে যাচ্ছি বিবরে আবার
অ্যাম্ফিথিয়েটার থেকে পালা দেখে ফিরে যাচ্ছি আর
জানেন তো পালাটা বিয়োগান্ত, ফিরে যাচ্ছি।
('ফিরে যাচ্ছি', *নিজ বাসভূমে*)

শব্দ-ভাষার বিমূর্তায়ন ছাড়াও 'ফিরে যাচ্ছি' বাক্যাংশের পুনরাবৃত্তি কবিতাটিতে ভিন্ন মাত্রা সৃষ্টি করেছে, যা কবিতার অন্তর্নিহিত সুরধ্বনিকে মন্থরভাবে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। উপর্যুক্ত স্তবকে 'ফিরে যাচ্ছি' বাক্যাংশটি প্রত্যেক পঙ্‌ক্তির প্রান্তে বসে এক ধরনের সমরূপতা তৈরি করে, যাকে বলা হয় 'epistrophe'[৪] অলংকরণ। 'অ্যানাফোরা'র ক্ষেত্রে শব্দ বা বাক্যাংশ যেমন পঙ্‌ক্তির প্রারম্ভে একটি সৌসাদৃশ্য সঞ্চার করে, তেমনি 'এপিস্ট্রোফে'র ক্ষেত্রে পঙ্‌ক্তির প্রান্তস্থিত শব্দগুচ্ছ বা

বাক্যাংশের পুনরাবর্তনে একটি শৈল্পিক ভারসাম্য (balance) সৃষ্টি হয়। এই দুই অলঙ্করণ মূলত কবিতায় শব্দ-পুনরাবৃত্তি কৌশলেরই দু'টি মাত্রা। পঙ্‌ক্তিতে শব্দ বা শব্দগুচ্ছের অবস্থানগত পার্থক্যই এই দুই অলংকরণের বিভিন্নতার কারণ।

যে নতুন নন্দনসূত্রে শামসুর রাহমানের *নিজ বাসভূমে* থেকে *ফিরিয়ে নাও ঘাতক কাঁটা* পর্যন্ত কাব্য-পর্যায় বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত, তা হলো—শব্দ, শব্দগুচ্ছ, বাক্যাংশ, বাক্য ও স্তবকের পুনরাবৃত্তি রীতি, তালিকায়ন এবং সমান্তরালতার কৌশল।

কবিতায় পুনরাবৃত্তি এমন এক ধরনের আঙ্গিক, যা কবির সাথে পাঠক-শ্রোতার ব্যবধান ঘোচায়; শব্দ-ভাষার স্বননে সুর, ধ্বনি ও ছন্দের সূত্রে সংবেদনার সেতু নির্মাণ করে। বিশ শতকের প্রথমার্ধের আধুনিক কবিতার ক্ষেত্রে পাঠকের যে গভীর অভিনিবেশ অপরিহার্য ছিল, এ ধরনের কবিতায় তেমনটি নয়। সহজ-সরল ভাষায় স্বতঃস্ফূর্ত প্রবাহ সঞ্চারের মাধ্যমে শব্দের আন্দোলনে কবিতার কাঠামোয় প্রতিধ্বনির মত লিরিক অনুবর্তন সৃষ্টি করেন কবি। তিনি 'মুডে'র অনুসরণ করেন, সৎ ও স্বতঃপ্রণোদিত অভিব্যক্তির অকপট প্রকাশ ঘটান এবং শব্দ-ভাষার স্বাধীনতাকে আবিষ্কার করেন। এ ধরনের কবিতায় বিষয় অপেক্ষা আঙ্গিকটি মুখ্য হয়ে ওঠে; উচ্চারণের প্রগাঢ়তা অপেক্ষা ভাবের প্রসরণ প্রাধান্য পায়। সাধারণত কবি কোনো একটি মৌলিক বিষয় বা ভাবকে সোচ্চার করে তোলার লক্ষ্যে পুনরাবৃত্তি কাঠামোর প্রয়োগ করেন। ফলে, জীবন, সমাজ, সমকালকেই তিনি অবলম্বন করেন অধিকাংশক্ষেত্রে। যেমন শামসুর রাহমান পুনরাবৃত্তির নানা কৌশলে ব্যাপকভাবে স্বাধীনতার দাবিকেই সোচ্চার করে তোলেন তাঁর দ্বিতীয় পর্যায়ের কবিতায়—যেমনভাবে, অ্যালেন গিনসবার্গ (১৯২৬-১৯৯৭) পঞ্চাশের দশকে তাঁর *Howl* (১৯৫৫) ও অন্যান্য কবিতায় যুদ্ধ-পরবর্তী আমেরিকার 'মেট্রোপলিস' তরুণদের জীবনের উৎকণ্ঠা, অবক্ষয়, হতাশা ও প্রতিবাদকে সরব করে তুলেছিলেন তাঁর আবিষ্কৃত জনপ্রিয় ও বিতর্কিত আধুনিক কাব্যরীতিতে। মূলত এই রীতিতে প্রকাশের তৎপরতা যেমন বেশি থাকে, কবির শৈল্পিক স্বজ্ঞাদৃষ্টির প্রতিফলন ততখানি থাকে না। বরং, কবি তাঁর বিশ্বাস বা কোনো মৌলিক দাবির বারংবার উচ্চারণের মাধ্যমে, বহু দৃষ্টান্তের তালিকায়নে তাকে প্রতিষ্ঠা দেবার একটা সচেতন আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেন।

কবিতার পুনরাবৃত্তি রীতি আনকোরা আধুনিক নয়; বরং সনাতন ও স্বভাবজ। কবির অন্তরাবেগ প্রকাশের এই লিরিক স্বভাব প্রাচীন কাল থেকেই চলে আসছে। আমাদের *ঋগ্বেদে*, প্রাচীন

গ্রিক কবিতায় এবং তার পরের রোমান্টিক কবিতায় এর দৃষ্টান্ত বিরল নয়। রবীন্দ্রনাথ যখন তাঁর 'ছবি' কবিতায় 'তুমি কি কেবলই ছবি' কিংবা 'হায় ছবি, তুমি শুধু ছবি' পঙ্‌ক্তিগুলোতে 'ছবি' শব্দটিকে বারংবার ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে ব্যবহার করেন, তখনো একটা লিরিক দ্যোতনা তৈরি হয় কবিতায়। রোমান্টিক কবিরা ভাবের গীতলতা সৃষ্টি করতে প্রায়ই ধ্রুবপদের অনুসরণ করতেন। 'বিদ্রোহী' কবিতায় নজরুল তাঁর অস্মিতা প্রকাশে বিদ্রোহের বিচিত্র অনুষঙ্গকে একীকৃত করেন 'আমি' শব্দের পুনরাবৃত্তিতে ও তালিকায়ন কৌশলে। 'আমি' সর্বনামটির সুতোয় তিনি গেঁথে চলেন বিদ্রোহের বিচিত্র বিভাবকে—কবিতার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত। বস্তুত, এই পুনরাবর্তন কৌশলে কবি তাঁর যে কোনো ভাবকে বিস্তৃত তরঙ্গরাশির মত ছড়িয়ে দিতে পারেন। কিন্তু পুনরাবৃত্তির যে কৌশল নজরুল সেখানে প্রয়োগ করেছেন, তাকে বলা হয় 'অ্যানাফোরা' বা কবিতার পঙ্‌ক্তিগুলোর প্রথম শব্দের পুনরাবৃত্তি রীতি, যা বাংলা কবিতায় বা বিশ্ব কবিতায় কোনো ভূঁইফোড় নতুন অলংকরণ নয়। Whitman এর 'Song of Myself'এবং আরো কিছু কবিতায় এরূপ শব্দ-পুনরাবৃত্তির দৃষ্টান্ত আছে। পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য রোমান্টিক কবিদের মধ্যে শেলি, কিটস, টেনিসন, লরেন্স, রবীন্দ্রনাথ এবং তারও পরে পল এলুয়ার্দ, অ্যাপ্পোলিনেয়ার প্রমুখ কবিগণও তাঁদের কবিতায় লিরিক ছন্দঃস্পন্দ সৃষ্টিতে শব্দ, শব্দগুচ্ছ বা বাক্যের পুনরাবৃত্তি সাধন করেছেন কবিতায়। কিন্তু, কবিতায় শব্দ-আন্দোলনের এই কারু-কৌশল দু'রকম হতে পারে—একটি কবির স্বতঃস্ফূর্ত আবেগপ্রসূত পুনরাবৃত্তি, অপরটি পুনরাবৃত্তির লক্ষ্যেই কবির সচেতন শব্দ-প্রয়োগ। পুনরাবৃত্তির সূত্রে কবিতার কাঠামোকেই প্রধান করে তোলার রীতিটিই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে ষাটের দশকের মধ্যভাগে 'লিভারপুলে'র কবিদের কেন্দ্র করে। আধুনিক কবিতায় এই 'রোমান্টিক রিভাইভাল' কাব্যমোদী পাঠকের কাছে এতোই আদৃত হয়েছিল যে 'লিভারপুল কবিকূল'—বিশেষত আড্রিয়ান হেনরি (১৯৩২-২০০০) , রজার ম্যাকগাফ (১৯৩৭-২০১৫) এবং ব্রায়ান প্যাটেনের (১৯৪৬-) প্রথম কাব্য সংকলন *The Mersey Sound* (১৯৬৫) প্রকাশের সাথে-সাথে প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ কপি বিক্রি হয় (আশরাফ, ২০০৫: ৯)। শব্দ, শব্দগুচছ, বাক্যাংশ এবং বাক্যের পুনরাবৃত্তি, ধ্রুবপদের সমান্তরাল ব্যবহার, ধ্রুবপদের আংশিক বিবর্তন ঘটিয়ে refrainরূপে প্রয়োগ করে দীর্ঘ, আনুভূমিক কবিতা রচনা ছিল তাঁদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কোনো একটি আবেগকে উন্মথিত করে তোলার জন্য, কিংবা কোনো একটি সুরকে মনের ভাব দিয়ে দীর্ঘায়িত করার উদ্দেশ্যে পুনরাবৃত্তি রীতি ছিলো তাঁদের অন্যতম অবলম্বন। কবিতাকে গানের মত সুরেলা করে তুলতেন বলেই সাধারণ পাঠকের কাছে তাঁরা এতো জনপ্রিয় ছিলেন। যেমন: 'Without you' বাক্যাংশের পুনরাবৃত্তিতে অ্যাড্রিয়ান হেনরির নিম্নোক্ত সুরেলা পঙ্‌ক্তিমালা—

Without you every morning would be like goingÔ back to work
after a holiday,
Without you I couldn't stand the smell of the East Lancs
Road,
Without you ghost ferries would cross the Mersey manned by
skeleton crews,
Without you I'd probably feel happy and have more money
And time and nothing to do with it,
Without you I'd have to leave my stillborn poems on other
People's doorsteps, wrapped in brown paper,
(Henry, McGough, Patten; 1975: 29)

একটি শব্দের পুনরাবৃত্তিতে এইরূপ দীর্ঘ তালিকায়নে কবিতাকে বিলম্বিত করার রীতি লিভারপুলের এই কবিরাই ব্যাপকভাবে জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন ষাট ও সত্তরের দশকজুড়ে। কবিতাগুলো ছিলো সমকালাশ্রয়ী—ভিয়েতনাম-যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে যুদ্ধ-বিরোধী আন্দোলন, ১৯৬৪ সালের বৈষম্যমূলক বৃটিশ 'নাগরিক অধিকার আইন' বিরোধী আন্দোলন প্রভৃতির সাথে-সাথে যুব সমাজের নানা নিরাশ্রয়তার কথা প্রতিধ্বনিত হয়েছে কবিতাগুলোতে, হালকা সুরে। যেমন: অ্যাড্রিয়ান হেনরির নিম্নোক্ত কবিতাটি—

Tonight at noon
Supermarkets will advertise 3d EXTRA on everything
Tonight at noon
Children from happy families will be sent to live in a home
Elephants tell each other human jokes
America will declare pease on Russia
World War I generals will sell poppies in the streets on
November 11th
The first daffodils of autumn will appear
When the leaves fall upwards to the trees

Tonight at noon
Pigeons will hunt cats through city backyards
Hitler will tell us to fight on the beaches and the landing
Fields
A tunnel full of water will be built under Liverpool
Pigs will be sighted flying in formation over Woolton
and Nelson will not only get his eye back but his arm as well
White Americans will demonstrate for equal rights
in front of the Black House
and the Monster has just created Dr. Frankenstein
(Henry, McGough, Patten; 1975: 13)

এমন তরল সুরে, 'Tonight at noon' বাক্যাংশের পুনরাবৃত্তিতে কাঙ্ক্ষিত রাষ্ট্র, সমাজ, বিশ্বের স্বপ্নে বাস্তবতা ও কল্পনার মিশেলে অনর্গল কবিতা বুনে যেতেন লিভারপুল কবিরা। *The Mersey Sound* সংকলনের কবিতাগুলো ষাটের দশকে দারুণভাবে প্রভাবিত করে বাংলাদেশের কবিদের সচেতন ও অবচেতন সত্তাকে (আশরাফ, ২০০৫: ৯)। সৈয়দ শামসুল হক, ফজল শাহাবুদ্দিন, শহীদ কাদরী প্রমুখ কবিগণ পুনরাবৃত্তি ও তালিকায়ন পদ্ধতির অনুসরণও করেন তাঁদের কিছু কবিতায়। শামসুর রাহমানও ইতঃপূর্বে *রৌদ্র করোটিতে*'তে 'দুঃখ' কবিতায় সেই ভঙ্গিটিকে আত্তীকৃত করেছেন নিজস্ব চেতনার শব্দভাষ্যে। সৈয়দ শামসুল হকের স্মৃতিচারণসুত্রে জানা যায় অন্যদের মত শামসুর রাহমানেরও এই বিশেষ ফর্মটির সাথে সংযোগসূত্রের কথা—

> ওই 'দুঃখ' কবিতাটি শামসুর রাহমানের—মনে পড়ছে, তখন আমরা—শহীদ, আমি আর রাহমান—খুব করে পড়ছিলাম মার্কিনী কবিতা, সেই মার্কিনী কবিতা বিস্তার থেকে একটি আঙ্গিক আমাদের চোখে পড়ে খুব, শহীদ যাকে বলে 'ক্যাটালগিং'—তালিকা-পাত; একটি ভাবকে একের পর এক উপমা চিত্রকল্পে প্রকাশ করে যাওয়া, দীর্ঘ থেকে দীর্ঘ করে তোলা সে তালিকাটি এবং শেষ পর্যন্ত সেটাই কবিতা। ... এখন বলতে পারি 'ক্যাটালগিং' এর ধারায় শামসুর রাহমানের 'দুঃখ' কবিতাটিই প্রথম কবিতা বাংলা ভাষার। অচিরে তিনি এই তালিকা-পাতের আঙ্গিকটি পরিহার করেন, কিন্তু এর জের থেকে যায় পঞ্চাশ বছর জুড়ে তাঁর পরবর্তী বহু রচনায়; তিনি একটি ভাবকে বহু উপমায় চিত্রকল্পে চারিয়ে দিয়ে চলেন—সম্ভবত এটিকেই একজন একদিন তাঁর কবিতা প্রস্তাবের এক নিজস্ব ধারা হিসেবে শনাক্ত করে উঠবেন। বহু বছর পরে, মুক্তিযুদ্ধের সময়, আর একবারই মাত্র শামসুর রাহমানকে আমরা দেখবো সরাসরি 'ক্যাটালগিং' এ ফিরে যেতে একই দিনে পেনসিলে লেখা তাঁর দু'টি কবিতায়—দু'টিই এখন প্রায় নিত্য আবৃত্তি-কৃত—'তোমাকে পাবার জন্য, হে স্বাধীনতা' আর 'স্বাধীনতা তুমি' (শামসুল, ২০১০: ১১)।

কেবল উল্লেখিত দু'টি কবিতাই নয়, ব্যাপক অর্থে কবির দ্বিতীয় পর্যায়ের কাব্যরীতির মৌল স্বভাব এই 'ক্যাটালগিং' এবং পুনরাবৃত্তির বৈচিত্র্য। এ ধরনের কবিতায় তালিকায়ন ও শব্দ-পুনরাবৃত্তি পরস্পর-সাপেক্ষ—বলা যায় পুনরাবৃত্ত নির্দিষ্ট শব্দ বা শব্দগুচ্ছ কবিতার অপরাংশের ধারাভাষ্যরূপে কাজ করে এবং সুন্দর ধ্বনি-প্যাটার্নে একটি কাঠমো তৈরি করে। এক কথায়, কবির অভিব্যক্তিসমূহের ঐক্য সৃষ্টিতে, কবিতার পঙ্‌ক্তি ও স্তবকগুলোকে সুশৃঙ্খলরূপে বেঁধে রাখার জন্য, 'রিদম' বা সুর সঞ্চারের উদ্দেশ্যে ভাষাকে একদিকে ব্যবহারিক, অপরদিকে সুললিত করার লক্ষ্যে, কবির অনিরূপনীয় চিন্তনগুচ্ছকে অনুপুঙ্খতা ও প্রত্যক্ষতা দেবার উদ্দেশ্যেই পুনরাবৃত্তি কৌশল প্রযুক্ত হয় কবিতায়—

> In verse, repeatition is chiefly employed not for emphasis (compare the use of the refrain), but for melody or rhythm, for continuousness or sonorousness of effect, for unity of impression, for banding lines or stanzas, and for the more indefinable thought not less important purpose of suggestiveness. (Alphonso, 1894: 9)

পুনরাবৃত্তি কৌশলে ভাবের বিস্তৃত তরঙ্গরাশিকে বাঁধতে পারেন কবি। ফলে, প্রাঞ্জল ভাষায় কবি তাঁর কথাকে আলুলায়িত করে দেন। যতক্ষণ তাঁর ভাবনা চলতে থাকে, কবিতা বিসর্পিল লয়ে সামনের দিকে সমচ্ছন্দে এগোতে থাকে। কখনো সম্পূর্ণ কবিতায়, কখনো নির্দিষ্ট কোনো স্তবকে কবি এই শব্দ-জাদু বিন্যস্ত করেন। যেমন:'ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯' কবিতার মধ্যবর্তী একটি স্তবক নিম্নরূপ:

জীবন মানেই
মাথলা মাথায় মাঠ ঝাঁ-ঝাঁ রোদে লাঙল চালানো,
জীবন মানেই
ফসলের গুচ্ছ বুকে নিবিড় জড়ানো,
...
জীবন মানেই
তালে তালে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মিছিলে চলা, নিশান ওড়ানো,
অন্যায়ের প্রতিবাদে শূন্যে মুঠি তোলা,
জীবন মানেই
মায়ের প্রসন্ন কোলে মাথা রেখে শৈশবের নানা কথা ভাবা,
...
জীবন মানেই
রেশনের দোকানের লাইনে দাঁড়ানো
স্ফূলিঙ্গের মতো সব ইস্তাহার বিলি করা আনাচে-কানাচে
জীবন মানেই...

('ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯', *নিজ বাসভূমে*)

এভাবে, 'জীবন মানেই' শব্দগুচ্ছের পুনরাবৃত্তিতে উদ্দেশ্য-পদ 'জীবনের' নানা অর্থকে কবি ব্যক্ত করেন অসংখ্য বিধেয়-পদের সমাহারে। মেঘনার ঢলের মত কলকল বেগে ভাবের প্রবাহ ও উচ্ছ্বাস সঞ্চারিত হয় সারা কবিতায় বাঙালির স্বাধীনতা-উন্মুখ চৈতন্যের সাথে সমস্বরিক হয়ে। কবি এভাবে subject এর সাথে objectগুচ্ছকে সমন্বিত করেন এবং সম্পূর্ণ কবিতাটি হয়ে ওঠে একটি অপূর্ব শিল্পিত তালিকা। অমলেন্দু বসুর ভাষায়—''এ যেন তিব্বতী মন্দিরের গম্ভীর ঘণ্টা পুনরাবৃত্ত ধ্বনিতে কবিতাটির মূল ভাবনা আমাদের বোধির পরতে-পরতে মিশিয়ে দিল। নিছক পদ্যের ছন্দ একটা অভ্যন্তরীণ ভাবছন্দের সূক্ষ্ম সত্তায় উত্তোলিত হলো''(অমলেন্দু, ১৯৯১: ২৫৩)। এভাবে প্রত্যেকটা কবিতা কোনো শব্দগুচ্ছ বা বাক্যাংশের আবর্তনে, কবির ভাবাবেগের বুননে দীর্ঘ একটি যৌগের মত আদ্যন্ত বিস্তৃত হয়। এ ধরনের কবিতাগুলো সাধারণত মুক্ত-আঙ্গিক হয়ে থাকে। ভাবের বিস্তার যেন শেষ হয় না—কবিতা সমাপ্ত হলেও শ্রোতার মনে তার অনুরণন চলতে থাকে—যেমন পদার্থে পরিবহণ বা বিকিরণ ক্রিয়া শেষ হয়েও তার রেশ চলতে থাকে অনেক্ষণ। ২৫ মার্চের পর শহর থেকে আত্মগোপনকালে লেখা শামসুর রাহমানের 'স্বাধীনতা তুমি' সেরূপ এক অনিঃশেষ তালিকায়ন। 'স্বাধীনতা তুমি' এই শব্দগুচ্ছের আবর্তনে কবি বাঙালির জীবন-ঐতিহ্য ও আকাঙ্ক্ষার সাথে সম্পৃক্ত

গভীর আবেগমথিত objectগুলোকে একীকৃত করেছেন সমচ্ছন্দে, লিভারপুল কবি আড্রিয়ান হেনরির ‘ Love is…’ কবিতার মত (Henry, McGough, Patten; 1975: 21) :

স্বাধীনতা তুমি
রবিঠাকুরের অজর কবিতা, অবিনাশী গান
স্বাধীনতা তুমি
কাজী নজরুল ঝাঁকড়া চুলের, বাবরি দোলানো
মহান পুরুষ, সৃষ্টি সুখের উল্লাসে কাঁপা—
স্বাধীনতা তুমি
শহীদ মিনারে অমর একুশে ফেব্রুয়ারির উজ্জ্বল সভা,
স্বাধীনতা তুমি,
পতাকা-শোভিত স্লোগান-মুখর ঝাঁঝালো মিছিল।
(‘স্বাধীনতা তুমি’, *বন্দী শিবির থেকে*)

ধ্রুবপদটিকে অবলম্বন করে আবেগের সম্প্রসারণের তালে-তালে কবি অসংখ্য object এর একটি দীর্ঘ মালা গাঁথেন। বারবার ধ্রুবপদের আবর্তনে সমস্ত কবিতাটিতে একটি সুর মুখ্য হয়ে ওঠে। শাস্ত্রীয় সংগীতে গুণী যেমন ধ্রুপদ বা খেয়াল গাইতে গিয়ে ধ্রুবপদের আংশিক উচ্চারণ করেই চলে যান ‘বিস্তারে’ এবং বারবার বিস্তার শেষে সোমে এসে ধ্রুবপদকেই অবলম্বন করেন, তেমনি সামঞ্জস্যপূর্ণ অথচ অনিঃশেষ একটি বিন্যাস লক্ষ করা যায় শামসুর রাহমানের এই কবিতাগুলোতে। শামসুর রাহমানের এই কবিতাগুলো কেবল ধ্বনিময় ও শ্রবণসুভগই নয়, কোনো নির্দিষ্ট শব্দগুচ্ছ বা বাক্যাংশের পুনরাবৃত্তিকে বৈচিত্র্যময় করে তোলার জন্য কবি কখনো কখনো objectগুলোকে অলংকৃত করে তোলেন উপমা, উৎপ্রেক্ষা, চিত্রকল্পের মালায়। ফলে, কবিতায় subjectivity’র পরিবর্তে multiplicity বা বহুত্ব তৈরি হয়। লিভারপুল কবিদের কবিতাগুলোর তুলনায় শামসুর রাহমানের কবিতার উৎকর্ষ নিহিত এই সচেতন কবিত্বে। তাঁর একেকটি কবিতা চলচ্ছবির মত হয়ে ওঠে উপমা-চিত্রকল্পের অবিরাম উৎসারণে। ‘স্বাধীনতা একটি বিদ্রোহী কবিতার মত’ কবিতায় কবি পুনরাবৃত্তির সূত্রেই স্বাধীনতাকে উপমায়িত করেন নানা অলংকারে এবং একটি অমূর্ত বিষয়কে মূর্ত করে তোলেন পাঠকের সামনে—

কখনো নিঝুম পথে হঠাৎ লুটিয়ে পড়ে কেউ গুলির আঘাতে,
এনে হয় ওরা গুলিবিদ্ধ করে স্বাধীনতাকেই।
দিনদুপুরেই জিপে একজন তরুণকে কানামাছি ক’রে
নিয়ে যায় ওরা;
মনে হয়, চোখ-বাঁধা স্বাধীনতা যাচ্ছে বধ্যভূমিতে।
বেয়োনেটবিদ্ধ লাশ বুড়িগঙ্গা কি শীতলক্ষ্যায় ভাসে;
মনে হয়, চোখ-বাঁধা স্বাধীনতা লখিন্দর যেন,
বেহুলাহীন,
জলের ভেলায় ভাসমান।

যখন শহরে ফাটে বোমা, হাতবোমা, অকস্মাৎ
ফাটে ফৌজি ট্রাকের ভেতর,
মনে হয়, স্বাধীনতা গর্জে ওঠে ক্রোধান্বিত দেবতার মতো।
এরই মধ্যে মৃত্যুগন্ধময় শহরে যখন খুব
কুঁকড়ে-থাকা কোনো শীর্ণ গলির ভেতর
আঁধারের নাড়ি-ছেড়া নবজাতকের
প্রথম চিৎকার জেগে ওঠে,
মনে হয়, স্বাধীনতা একটি বিদ্রোহী
কবিতার মতো
তুমুল ঘোষণা করে অলৌকিক সংবাদ।
('স্বাধীনতা, একটি বিদ্রোহী কবিতার মতো', *দুঃসময়ের মুখোমুখি*)

শব্দ-পুনরাবৃত্তির সাথে-সাথে তালিকায়নের ক্ষেত্রে অলংকার প্রয়োগের ফলে কবিতাটিতে ক্ষিপ্রতার পরিবর্তে লালিত্য সঞ্চারিত হয়। যদিও, সর্বক্ষেত্রে অলঙ্করণ অপরিহার্য নয়। যেমন, নিম্নোক্ত কবিতাটিতে 'আমাদের মৃত্যু আসে'—এই প্রধান বাক্যাংশের (primary clause) পুনরাবৃত্তি আর নির্ভরশীল বাক্যাংশগুলোর (secondary clauses) সমন্বিত বিন্যাসের মধ্য দিয়ে কবিতাকে 'ডাইনামিক' বা গতিশীল করে তোলেন কবি আর মৃত্যুকে ছড়িয়ে দেন নানা ক্ষেত্রে, নানা অনুষঙ্গে—

আমাদের মৃত্যু আসে ঝোপে ঝাড়ে নদী নালা খালে
আমাদের মৃত্যু আসে কন্দরে কন্দরে
আমাদের মৃত্যু আসে পাট ক্ষেতে আলে
গ্রামে গঞ্জে শহরে বন্দরে
...
আমাদের মৃত্যু আসে সুপরিকল্পিত নকশারূপে
আমাদের মৃত্যু আসে দূর ইসলামাবাদ থেকে
আমাদের মৃত্যু আসে কারবাইনে বারুদের স্তূপে
আমাদের মৃত্যু আসে বিউগলে বিউগলে।
('আমাদের মৃত্যু আসে', *বন্দি শিবির থেকে*)

স্লোগানের মত দল বেঁধে, মিছিলের মত দৃপ্ত পায়ে অগ্রবর্তী হয় কবিতার শব্দগুলো। মৃত্যু-তাড়িত সময়েরই গতি সঞ্চারিত হয় যেন কবিতাটিতে আর সেই সাথে বিউগলের করুণ আর্তনাদ বাজে। কখনো-কখনো কবি 'স্টাইল'টিকে দৃশ্যমান করে তোলার জন্য কবিতায় শব্দের পার্শ্বিক পুনরাবৃত্তি (partial anaphora) ধ্বনিত করেন। যুদ্ধ-প্রসঙ্গ ছাড়াও কবি এ পর্যায়ে অনেক কবিতায় আংশিকভাবে 'অ্যানাফোরা'র শব্দ-অনুনাদ ঘটিয়েছেন তালিকায়নের নানা বৈচিত্র্য সৃষ্টির জন্য অথবা কোনো শব্দ বা শব্দগুচ্ছকে বিশেষায়িত করার জন্য—যেমন, নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিতে 'অস্থি' শব্দটির অনুরণন—

অস্থি মানে একদা-যুবক
অস্থি মানে একদা-যুবতী
অস্থি মানে একদা-কৃষক

অস্থি মানে একদা-শ্রমিক
অস্থি মানে একদা-বালক,
অস্থি মানে একদা-শ্রমণ
অস্থি মানে একদা-নাবিক
মহিষাসুরের ক্ষুরে ছত্রভঙ্গ অস্থি-র জনতা!
('অস্থি', *ফিরিয়ে নাও ঘাতক কাঁটা*)

শব্দের সাঁজোয়া মিছিল যেন উদ্ধৃতাংশটি। স্পষ্টতই স্টাইলটিকে মুখ্য করে তোলার জন্য কবি এভাবে শব্দ সাজিয়েছেন এবং লক্ষণীয় যে শেষ বাক্যেও 'অস্থি' শব্দটির অনুরণন রক্ষার জন্য কবি সচেতনভাবে ভেঙে দিয়েছেন 'অস্থির' শব্দটি 'অস্থি-র'রূপে। আপাতদৃষ্টিতে, এই শব্দ-বিন্যাসের কোনো মৌলিক গুরুত্ব না থাকলেও আছে প্রতীকী গূঢ়তা। যুদ্ধোত্তর কালে রচিত *ফিরিয়ে নাও ঘাতক কাঁটা* কাব্যের 'অস্থি' কবিতাটিতে স্মৃতিচারী কবি তাঁর যাপিত জীবনের বিস্তৃত সময়জুড়ে দেখা যুদ্ধ গণহত্যার ইতিহাসে জমে যাওয়া অসংখ্য 'অস্থি'র বিশাল স্তূপের কথা জানাতেই ব্যবহার করেছেন শব্দের পুনরাবৃত্তির এই 'স্টাইল'টি। আমরা জানি, কবি হলেন শব্দ-খেলার কুশলী। তিনি তাঁর কবিতার শব্দ-ভাষার অধীশ্বর। শামসুর রাহমান তাঁর কাব্য রচনার বিভিন্ন পর্যায়ে শব্দকে নিয়ন্ত্রণ করেছেন বিভিন্নভাবে। কবি জ্ঞানতই এ পর্যায়ে কখনো-কখনো শব্দ-খেলার মত এরূপ রীতি-নির্ভর বিন্যাসে আগ্রহী হয়েছেন। কারণ, দৈশিক সংকটের ভেতর কবির সংবেদনার টানাপোড়েন, তাঁর আবেগের চলন ও হৃদস্পন্দনের ওঠানামা আর কোনো রীতিতে হয়ত এতো স্বতঃস্ফূর্ত হতে পারতো না। তবে, লিভারপুল কবিদের মতই যুদ্ধ ছাড়াও প্রেম বা ব্যক্তিগত প্রসঙ্গেও কবি এ পর্বের অনেক কবিতায় নানা মাত্রায় শব্দের অনুরণন তুলেছেন। 'তুমি অন্তর্হিতা' কবিতায় সম্প্রতি অন্তর্হিতা প্রেমিকার উদ্দেশ্যে সমস্ত কবিতাজুড়ে বারংবার 'তুমি অন্তর্হিতা' শব্দের অনুবর্তন কবির উৎকণ্ঠা ও হাহাকারকে প্রতিধ্বনিত করে তোলে (তুমি অন্তর্হিতা, *দুঃসময়ের মুখোমুখি*)। ঘুম বা অনিদ্রাকে কবি এই পদ্ধতিতেই তাঁর চেতন-অবচেতনের নানা অনুষঙ্গের সাথে উপমিত করে চলেন—যেন চেতনার অর্গল মুক্তির একটি স্রোতোচ্ছ্বাস তৈরি করেন ('অনিদ্রা', *দুঃসময়ের মুখোমুখি*)।

পুনরাবৃত্তি ও তালিকায়ন পদ্ধতিতে ভাবের অপরিসীম বিস্তার যেমন সম্ভব, তেমনি সমান্তরাল পদ্ধতিতে (parallesism) সম্ভব বিস্তৃত কল্পনারাশিকে সংহত করা। কবিতায় শব্দ, বাক্য বা স্তবকের আবর্তনমাত্রেই কবিতা নয়। কবির মাত্রাবোধ ও আবেগ এই পুনরাবৃত্তি কৌশলকে নিয়ন্ত্রণ করে সুচারুভাবে। 'প্যারোডি' কবিতাগুলো থেকে এই ধরনের কবিতার পার্থক্য কবির সেই মাত্রাচেতনায়। পরিকল্পনাহীন অধিক পুনরাবৃত্তি অন্যথায় কবির আবেগকে সোচ্চার না করে, বরং স্থূলতা সঞ্চার করতে পারে কবিতায়।

কবিতার ক্ষেত্রে 'সমান্তরালতা' পুনরাবৃত্তি কৌশলেরই অন্য একটি মাত্রা. যেখানে শব্দ নয়, বরং কাঠামোটিই আবর্তিত হয়ে কবিতাকে শ্রবণমুখর ও গতিময় করে তোলে। সমান্তরালতাও কবিতার সুরের সাথে সম্পৃক্ত। স্তবক বা স্তবকান্তরজুড়ে যখন পুনরাবৃত্তি ঘটে বাক্যাংশ, বাক্য বা স্তবকাংশের, তখন কবিতায় সমান্তরালতা সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ, একটি ধারাবাহিক পুনরাবৃত্তি কবিতায় সার্থক সমান্তরালতা সম্পন্ন করে—

> Parallelism is only another from of repeatition, but in this case costructions are repeated, not words… In poetry, however, balance, or parallelism, the domain of rhythm. It is usually found joined with repeatition (Alphonso, 1894 : 9-10)

সমান্তরালতা এমনকি একাধিক স্তবককেও বেঁধে রাখতে সক্ষম , সাদৃশ্যের অপূর্ব ভারসাম্যে। সে ক্ষেত্রে, 'refrain' বা আংশিক পরিবর্তিত ধ্রুবপদগুলো কবিতায় বাঁধনরজ্জু হিসেবে কাজ করে। কবির আবেগসূত্রেই 'রিফ্রেন'গুলো বিবর্তিতরূপে কবিতাংশে কিংবা সমস্ত কবিতায় আবর্তিত হতে পারে। যেমন, *বন্দি শিবির থেকে* কাব্যের 'তোমাকে পাওয়ার জন্য হে স্বাধীনতা' কবিতায় 'তোমাকে পাওয়ার জন্য হে স্বাধীনতা' বাক্যটি দিয়ে কবিতা শুরু, এরপর আংশিক বিবর্তিতরূপে অনুরূপ ভাবের বাক্যই 'রিফ্রেন' হিসেবে কবি একাধিকবার ব্যবহার করেন। সম্পূর্ণ কবিতায় কখনো 'তুমি আসবে বলে হে স্বাধীনতা', কখনো 'স্বাধীনতা তোমার জন্য', কখনো 'তোমার জন্য' প্রভৃতি বাক্যাংশ একই প্রতীতিতে প্রযুক্ত হয়ে কবির ভাবকে সুষমরূপে দীর্ঘায়িত করে তোলে—

তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা,
তোমাকে পাওয়ার জন্যে
আর কতবার ভাসতে হবে রক্তগঙ্গায়?
আর কতবার দেখতে হবে খাণ্ডবদাহন? } ক

তুমি আসবে ব'লে হে স্বাধীনতা, } খ
সকিনা বিবির কপাল ভাঙল,
সিঁথির সিঁদুর মুছে গেল হরিদাসীর।
তুমি আসবে বলে, হে স্বাধীনতা } খ
শহরের বুকে জলপাই রঙের ট্যাঙ্ক এল
দানবের মতো চিৎকার করতে করতে
তুমি আসবে বলে, হে স্বাধীনতা, } খ
অবুঝ শিশু হামাগুড়ি দিল পিতা-মাতার লাশের উপর

তোমাকে পাওয়ার জন্য, হে স্বাধীনতা,
তোমাকে পাওয়ার জন্যে
আর কতবার ভাসতে হবে রক্তগঙ্গায়?
আর কতবার দেখতে হবে খাণ্ডবদাহন? } ক

('তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা', *বন্দী শিবির থেকে*)

উদ্ধৃত অংশে 'ক' চিহ্নিত স্তবকদ্বয় সমান্তর এবং 'খ' চিহ্নিত পঙ্‌ক্তিগুলো পরস্পর সমান্তরাল। এভাবে সম্পূর্ণ কবিতাটিই হয়ে ওঠে সমান্তর-স্বভাবী। এই সমান্তরাল প্রক্রিয়ায়ও কবিতায় আসাধারণ গতি সঞ্চারিত হতে পারে। কখনো মোক্ষম কোনো বাক্যে কবিতার শুরুতে ভাবের একটি শিখাকে কবি প্রজ্জ্বলিত করেন এবং ক্রমশ সে আগুনকে দাবানলের মত বিস্তৃত করেন সম্পূর্ণ কবিতায়—

দাউ দাউ পুড়ে যাচ্ছে ঐ নয়াবাজার।
পুড়ছে দোকানপাট, কাঠ,
লোহালক্কড়ের স্তূপ, মসজিদ, মন্দির।
দাউদাউ পুড়ে যাচ্ছে ঐ নয়াবাজার।

বিষম পুড়ছে চতুর্দিকে ঘর-বাড়ি।
পুড়ছে টিয়ের খাঁচা, রবীন্দ্র রচনাবলি, মিষ্টান্নভাণ্ডার,
মানচিত্র, পুরনো দলিল।
...
দাউ দাউ পুড়ে যাচ্ছে ঐ নয়াবাজার,
আমাদের চৌদিকে আগুন,
গুলির ইস্পাত শিলাবৃষ্টি অবিরাম।
('তুমি বলেছিলে', *বন্দী শিবির থেকে*)

একটি সম্পূর্ণ বাক্যের সমান্তরাল পুনরাবৃত্তিতে হানাদার বাহিনীর অগ্নিসংযোগে পুড়ে যেতে থাকা নয়াবাজারের আগুন আরো লেলিহান হয়ে ওঠে। কখনো কবি একই কবিতায় সমান্তরালতার বিভিন্নতাও তৈরি করেন সচেতনভাবে। যেমন, 'বারবার ফিরে আসে' কবিতার প্রথমাংশে—'বারবার ফিরে আসে রক্তাপ্লুত শার্ট, / ময়দানে ফিরে আসে, ব্যাপক নিসর্গে ফিরে আসে,/ ফিরে আসে থমথমে শহরের প্রকাণ্ড চোয়ালে।'—এই সম্পূর্ণ স্তবকটি পুনরাবৃত্ত হয়ে একটি আবহ তৈরি করে, আবার, কবিতার শেষভাগে 'আমাকেই হত্যা করে ওরা' বাক্যটি আরেকটি সমান্তরালতা সৃষ্টি করে নিম্নরূপে—

আমাকেই হত্যা করে ওরা,
ঊনসত্তরের বিদ্রোহী প্রহরে,
একাত্তরে পুনরায় হত্যা করে ওরা আমাকেই,
আমাকেই হত্যা করে ওরা
পথের কিনারে
এভেন্যুর মোড়ে,
মিছিলে, সভায়—
আমাকেই হত্যা করে ওরা, হত্যা করে বারবার।
('বারবার ফিরে আসে', *দুঃসময়ের মুখোমুখি*)

শেষ বাক্যটি আংশিক বিবর্তিতরূপে ব্যবহৃত হয়ে কবির আবেগকে সোচ্চার করে তোলে। পুনরাবৃত্তির ক্ষেত্রে শব্দ-ভাষার বৈচিত্র্য সৃষ্টির জন্য ধ্রুবপদকে আংশিক বিবর্তিতরূপে কবি ব্যবহার করেন 'রিফ্রেন'। সমান্তর কৌশলে বারংবার একই পঙ্‌ক্তি বা স্তবকের উচ্চারণে কবির অন্তরাবেগ যেমন সোচ্চার হয়ে উঠতে পারে, অন্য আর কোনো কাব্য-প্রকৌশলে তেমনটি সম্ভব নয়। যেমন, 'কী করে লুকাবে'? কবিতায় কবি প্রথম স্তবকে একটি জিজ্ঞাসা ছুঁড়ে দেন—'' কী ক'রে লুকাবো বলো এইসব লাশ?/ এইসব বেয়োনেট-চেরা/ বিষম নাপাম-পোড়া লাশ?'' স্তবকান্তে ওই ধ্রুবপদটিই কবির ভাবাবেগের পুনরুক্তিতে পুনর্বিন্যস্ত হয়—'কী ক'রে লুকাবে বলো এতো বেশি লাশ?' এভাবে কবিতার পুরো কাঠামোটিই আন্দোলিত হয়ে ওঠে কবির ঐকান্তিক আবেগের পুনঃ পুনঃ প্রকাশে। সমান্তরালতা এভাবেই কবির কোনো কেন্দ্রীয়ভাবকে প্রতিধ্বনিত করে বিস্তারিত হয়। refrain ভাবের রজ্জু হয়ে কবিতাকে বেঁধে রাখে অপূর্ব সৌষম্যে—সমস্ত কবিতায় সঞ্চারিত হয় এক নান্দনিক সমরূপতা। দৈশিক সংকটে কবির সংবেদনার টানাপোড়েন, তার আবেগের চলন, হৃদস্পন্দনের ওঠানামা, অভিব্যক্তির বৈচিত্র্য ও প্রবাহকে অন্য কোনো কাব্যরীতিতে এতো স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশ করা হয়ত সম্ভব হতো না।

শব্দ-বাক্যের পুনরাবৃত্তি, সমান্তরালতা এবং তালিকায়নের প্রকাশধর্মী কাঠামো এ পর্বের কবিতার অন্যতম নন্দন-স্বভাব হলেও মিথ-প্রতীক-চিত্রকল্পের প্রয়োগে কবিতার অন্তর্ময় প্রকৃতিও লক্ষ করা যায় কখনো-কখনো। প্রতীক শামসুর রাহমানের কবিতায় পূর্বাপর প্রিয় এক মাধ্যম। সেদিন পূর্ববাঙলার সমস্ত বাঙালির মত কবির চেতনায়ও একুশের রক্তাক্ত স্মৃতি আর ৬৯'এর অভ্যুত্থান এক সুতোয় গাঁথা ছিলো। শহরের কৃষ্ণচূড়া, একুশের 'শহীদদের চৈতন্যে। শামসুর রাহমানের কবিতায়ও তার প্রতিধ্বনি শোনা যায়। অবিনাশী বর্ণমালার প্ল্যাকার্ড হাতে ৬৯'এর রাজপথে যেমন ফিরে আসেন ভাষাশহীদ সালাম-বরকত, তেমনি ৬৯' এর গণ অভ্যুত্থানে শহীদ আসাদের রক্তাক্ত শার্ট বাঙালি জাতির সংগ্রামী চৈতন্যের প্রতীক হয়ে অবিরাম উড়তে থাকে হাওয়ায় কবির কল্পনায়—

গুচ্ছ গুচ্ছ রক্তকরবীর মতো কিংবা সূর্যাস্তের
জ্বলন্ত মেঘের মতো আসাদের শার্ট
উড়ছে হাওয়ায়, নীলিমায়।
. . .
উড়ছে, উড়ছে অবিরাম
আমাদের হৃদয়ের রৌদ্র-ঝলসিত প্রতিধ্বনিময় মাঠে
চৈতন্যের প্রতিটি মোর্চায়।
আমাদের দুর্বলতা, ভীরুতা কলুষ আর লজ্জা
সমস্ত দিয়েছে ঢেকে একখণ্ড বস্ত্র মানবিক;

আসাদের শার্ট আজ আমাদের প্রাণের পতাকা
('আসাদের শার্ট', *নিজবাসভূমে*)

৬৯' এর গণঅভ্যুত্থানকালে রাজপথে বিক্ষোভ, মিছিল, হত্যা, খুন, দমন, নিপীড়ন, হরতাল, কারফিউয়ে সাধারণ বাঙালি যখন ভীত-সন্ত্রস্ত ও বিবরবাসী, তখন শহর ঢাকার শূন্যতাকেও নানা প্রতীকে অথবা প্রতীকাশ্রয়ী চিত্রকল্পে রূপকান্বিত করেছেন কবি। যেমন, একটি কবিতায় মৃত্যুভয় প্রকম্পিত রাজপথের প্রমাদ গোনা শূন্যতায় একটি সন্ত্রস্ত কাঁকড়া দ্রুত হেঁটে যায় শূন্যতা বুকে নিয়ে কারফিউ উপদ্রুত শহরে দ্রুত প্রস্থানরত কবির স্বজ্ঞা ও সংকটকে চিহ্নিত করে—

যেন মৃত্যু অকস্মাৎ এ-শহরে সব কটি ঘরে
দিয়েছে বাড়িয়ে হাত, শহরের প্রত্যেকটি ঘড়ি
হয়েছে বিকল আর শোক-পালনের মতো কেউ
এখনো কোথাও নেই। ভয়ানক নৈঃশব্দ্যের ঝড়ে
শহর-মরুর বুকে একটি কাঁকড়া শুধু তড়ি-
ঘড়ি যাচ্ছে ঠেলে ক্রমাগত শূন্যতার ঢেউ।
('ডাকছি', *নিজবাসভূমে*)

যে জেদী ঘোড়াটা কিছুদিন আগেও *বিধ্বস্ত নীলিমায়* নতুন স্বপ্নে ক্ষুরধ্বনি তুলেছিল, সেই তেজী ঘোড়াটার পায়েই শোষক আর তার দোসরগণ পরায় পরাধীনতার কঠিন শৃঙ্খল—

জেদী ঘোড়াটা ডাইনে বাঁয়ে
ভীষণ ছুটে ক্লান্ত হ'লে জুড়োয় পাড়া।
হঠাৎ কারা পরায় বেড়ি ঘোড়ার পায়ে;
স্তব্ধ ঘোড়া, শকুনিদের চঞ্চু খাড়া।
('জেদী ঘোড়াটা', *নিজ বাসভূমে*)

সংশয় থাকে না আর যে, এই অবরুদ্ধ ঘোড়াটি অবদমিত শব্দ-ভাষার অধীশ্বর কবিরই প্রতীক কিংবা আনমনে একা-একা স্বপ্নের নিঝুম বিলে চরে বেড়ানো সেই মুক্তপক্ষ্ম সারসটা, যে ছিল কবির প্রেরণা, সম্প্রতি তার সফেদ শরীর ভীষণভাবে বিদ্ধ হয়ে থাকে কাঁটাতারে। সঙ্গিনের মত কাঁটাতারে বিদ্ধ সেই সারসটা কবি এবং আমাদের সকলের যন্ত্রণাবিদ্ধ পরাধীন সত্তার প্রতীক হয়ে ওঠে—('সারস', *বন্দী শিবির থেকে*)। কোকিল, কুকুর, হাঁস, টিকটিকিকে কবির ঈর্ষণীয় মনে হয় সেই বৈরী সময়ে, কারণ কোনো গোয়েন্দা তাদের পিছু নেয় না, কখনো শোষিত হয় না তারা ('প্রকারভেদ', *নিজ বাসভূমে*)। রবীন্দ্রনাথ নিষিদ্ধ হলেও তাঁর সোনার তরী মেঘে ভেসে-ভেসে অনায়াসে অতিক্রম করে ব্যারিকেড, কারফিউ-ভীত জনপদ ('সোনার তরী', *নিজ বাসভূমে*), যেমন শহীদ কাদরী ব্ল্যাক আউটের পূর্ণিমাকে দেখেছিলেন স্পর্ধিতরূপে পূর্ণ বিকশিত, কিংবা আইডেন্টিটি কার্ডবিহীন বিদ্রোহী পাখিদের স্বাধীন ও স্বেচ্ছাচারীরূপে। যখন শহরের রাজপথে ট্যাঙ্ক-কামান, সৈন্যদের রাইফেল ক্ষমাহীন, যখন 'প্লেগবিদ্ধ

রক্তাক্ত ইঁদুরে'র মত পথে-ঘাটে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকে মানুষ, যখন অতর্কিত মৃত্যুও ভয়ে গৃহবন্দী সন্ত্রস্ত শ্বাসজীবী মানুষগুলো দেয়ালে টিকটিকির অস্তিত্বেও ভীত—এমনকি নিজেদের নিঃশ্বাস পতনের শব্দকেও বাহুল্য ভাবতে বাধ্য, তখন পথের ফুর্তিবাজ, নির্ভীক কুকুরটিকে সৈন্য-সাঁজোয়া জলপাই রঙের জিপের দিকে বারবার শাণিত চিৎকারে ধেয়ে যেতে দেখে মধ্যবিত্ত নিঃসহায় কবির নিজেকে ম্রিয়মান মনে হয় বড়। ওই জীবের প্রতীকী প্রতিবাদ কবির অবদমিত জিঘাংসার তৃপ্তি মেটায়, আবার নিজের ক্লীবত্বকেও পরিহাস করে যায়—('পথের কুকুর', *বন্দী শিবির থেকে*)। অস্তিত্বের অনমনীয় প্রয়োজনে যখন কবি বাস্তুছাড়া—প্রিয় শহর ছেড়ে পল্লিতে শরণার্থী, তখনও গ্রামের উচ্ছল, প্রাণময় পথঘাট খাঁ-খাঁ শূন্য মনে হয় কবির কাছে। সেই শূন্যতায় টেড হিউজের (১৯৩০-১৯৯৮) মত শুধু অশুভ 'কাকে'র আনাগোনা লক্ষ করেন কবি—

গ্রাম্য পথে পদচিহ্ন নেই। গোঠে গোরু
নেই কোনো, রাখাল উধাও, রুক্ষ মরু
আল খাঁ-খাঁ, পথপার্শ্বে বৃক্ষেরা নির্বাক
নগ্ন রৌদ্র চতুর্দিকে, স্পন্দমান কাক, শুধু কাক।
('কাক', *বন্দী শিবির থেকে*)

এই ছোট্ট কবিতাটিতে জনশূন্যতায় কেবল কাকের অস্তিত্ব বাঙালি জাতির অনস্তিত্বের আশঙ্কাকে প্রতীকান্বিত করে। বৈরী দেশ-কালে, যখন হাওয়ায়-হাওয়ায় দুঃসংবাদ, শহরে আর গ্রামে-গঞ্জে, ঘরে-ঘরে চলে মুক্তিকামী বাঙালির গুপ্ত অস্ত্রের সন্ধানে, তখন কবির মনে হয়, বাংলার সর্বত্র শরীর-ভরা কাঁটা নিয়ে যে বাবলার সারি নির্ভীক দাঁড়িয়ে আছে , তা সকল মারণাস্ত্রের চেয়ে অধিক ক্রুর, প্রাণঘাতী (শমীবৃক্ষ, *বন্দী শিবির থেকে*)। উদ্বাস্তু কবি যুদ্ধ শেষে বিধ্বস্ত শহরে ফিরে ধর্ষিতার মত পড়ে থাকা দেয়ালটির দিকে তাকিয়ে নিজেকেই অনুরূপ বোধ করেন। অসংখ্য স্মৃতিচিহ্নের ধ্বংসাবশেষ ওই দেয়ালটি বাঙালির রক্তক্ষয়ী ইতিহাস ও তার স্মৃতিবিদ্ধ ধ্বংসপ্রায় অস্তিত্বের প্রতীক—

এখানে দরজা ছিল, দরজার ওপর মাধবী
লতার একান্ত শোভা। এখন এখানে কিছু নেই,
কিচ্ছু নেই। শুধু এক বেকুব দেয়াল, শেল খাওয়া,
কেমন দাঁড়ানো, একা। কতিপয় কলঙ্কিত ইট
আছে পড়ে ইতস্তত। বাঁ দিকে তাকালে ভাঙাচোরা
একটি পুতুল পাবে, তা ছাড়া এখানে কিছু নেই।

ভস্মস্তূপে আমি, ধ্বংস চিহ্ন নিজেই যেন বা।
ভস্ম নাড়ি জুতো দিয়ে, যদি ছাই থেকে অকস্মাৎ
জেগে ওঠে অবিনাশী কোনো পাখি, যদি দেখা যায়
কারুর হাসির ছটা, উন্মীলিত স্নেহ, ভালোবাসা।
('এখানে দরজা ছিল', *বন্দী শিবির থেকে*)

যুদ্ধ বা প্রলয়ের পূর্বে যে স্বজ্ঞা, শূন্যতা ও স্তব্ধতাকে উপলব্ধি করা যায়, কবি ৬৯' পর্যায়ে হরতালের নিস্তব্ধতায় আসন্ন যুদ্ধের সেই পূর্বাভাসকেই উপলব্ধি করেছিলেন তাঁর ইন্দ্রিয় দিয়ে। 'হরতাল' কবিতায় নগর ঢাকার শূন্য রাজপথের স্তব্ধতাকে কবি সংজ্ঞায়িত করেন প্রকাশোন্মুখ পঙ্‌ক্তি মাথায় নিয়ে কোনো কবির গভীর বিবিক্তর সাদৃশ্যে কিংবা পর্বতের গুহায় ধ্যানস্থ হবার পূর্বে নিঃসঙ্গ অথচ কৃতসংকল্প হযরতের পবিত্র হৃদয়ের শূন্যতার সূত্রে—

দশটি বাক্ময় পঙ্‌ক্তি রচনার পর একাদশ পঙ্‌ক্তি নির্মাণের আগে
কবির মানসে জমে যে-স্তব্ধতা; অন্ধ, ক্রুদ্ধ, ক্ষিপ্র
থাবা থেকে গা বাঁচিয়ে বুকে
আয়াতের নক্ষত্র জ্বালিয়ে
পাথরে কণ্টকাবৃত পথ বেয়ে ঊর্ণাজাল-ছাওয়া
লুকানো গুহার দিকে যাত্রাকালে মোহাম্মদ যে- স্তব্ধতা আস্তিনের ভাঁজে
একদা নিয়েছিলেন ভ'রে
সে স্তব্ধতা বুঝি
নেমেছে এখানে।
('হরতাল', *নিজ বাসভূমে*)

দুঃসময়ের আততিকে কবি মাঝে-মাঝে গেঁথে দেন মোক্ষম উপমাগুচ্ছে ও চিত্রকল্পসমূহে—হরতালে শূন্য শহরের স্তব্ধতার ভাষাচিত্র নির্মাণে। বস্তুত, সমস্ত কবিতাটিই স্তব্ধতার চিত্রকল্পমালা হয়ে যায়। যেমন:

রাজপথ নিদাঘের বেশ্যালয়, স্তব্ধতা সঙ্গিন হয়ে বুকে
গেঁথে যায়; একটি কি দু'টি
লোক ইতস্তত
প্রফুল্ল বাতাসে-ওড়া কাগজের মতো ভাসমান।
. . .
কলকারখানায়
তেজি ঘোড়াগুলো
পাথুরে ভীষণ;
ন্যাশনাল ব্যাংকের জানালা থেকে সরু
পাইপের মতো গলা বাড়িয়ে সারস এক স্তব্ধতাকে খায়।
('হরতাল', *নিজ বাসভূমে*)

কখনো রাজপথের সীমাহীন স্তব্ধতা ও আততি থেকে বিমোক্ষণের জন্য কবি নিঃশব্দ শহরের পথে একা হাঁটতে-হাঁটতে তাঁর রুদ্ধ কল্পনাকে নির্ভয়ে প্রসারিত করে দেন। নিজের স্বপ্নের মত করে কল্পনায় সাজিয়ে তোলেন আপন শহর—রাজপথের সমস্ত বিজ্ঞাপন ও সাইনবোর্ড মুছে বসান তাঁর প্রিয়

কবিতার উজ্জ্বল লাইনগুলি, প্রতিটি পথের মোড়ে ঝুলিয়ে দেন পিকাসো, মাতিস আর ক্যাণ্ডিনেস্কির ছবি এবং কল্পনাকে পরাবাস্তব শূন্যতায় ভাসিয়ে নিয়ে যান কল্পনাতীতের উদ্দেশে—

শহর ঢাকার পথ ফাঁকা পেয়ে কত কী-য়ে বানালাম
হেঁটে যেতে-যেতে
বানালাম ইচ্ছে মতো : আঙুলের ডগায় হঠাৎ
একটি সোনালি মাছ উঠলো লাফিয়ে,
বড় হতে হতে
গেল উড়ে দূরে
কোমল উদ্যানে
ভিন্ন অবয়ব
খুঁজে নিতে অজস্র ফুলের বুদোযারে।
('হরতাল', *নিজ বাসভূমে*)

বস্তুত, শহর ছেড়ে যাবার আগ পর্যন্ত কবি একা-একা হেঁটেছেন এই শূন্যতায়। কিন্তু, নাগরিক জীবনের যে তীব্র-তীক্ত ঝাঁঝালো আসবে আসক্ত ছিলেন কবি, তার অভাবে অসহায় বোধ করেন ভীষণ। কারণ, কিছু দিন পূর্বেও কবির কবিতার জীবন্ত প্রেক্ষাপট ছিল যে ভীষণ ব্যস্ত, ভ্রূক্ষেপহীন শহর, তা আজ 'পাষাণপুরীর রাজকন্যা'র মত ঘুমন্ত, ভয়ে থমথম। সান্ধ্য আইন জারি হওয়া শহরের পথে-পথে কবি প্রেতের মত একা ঘুরে-ঘুরে ডেকেছেন বিবর্ণ, ফ্যাকাশে, মূক জনপদকে—''এ শহরে কেউ কি আজ নেই? কেউ নেই?'' ('সান্ধ্য আইন', *বন্দি শিবির থেকে*)। যেহেতু শহরের বুকে বিষাদ একাকী দাঁড়িয়ে রয় নিঃসঙ্গ কবির মত, ফলে, আপাত নিষ্ক্রিয়, অবরুদ্ধ ও নিরুপায় কবি স্বচক্ষে দেখা যুদ্ধের দিনগুলির অভিজ্ঞতাকে কখনো দিনলিপির মত, কখনো স্বগতকথনের মত, কখনো জরুরি চিঠির মত কবিতায় উপস্থাপন করেন। কবিত্বেও চেয়ে অধিক বস্তুনিষ্ঠা নিয়ে কখনো সংবাদ পরিবেশনের মত এঁকে যান দৃশ্যাবলি কিংবা তাৎক্ষণিক অনুভূতিগুলো। কবির কাব্যিক স্বীকারোক্তিতে সেই নান্দনিক পরিবর্তনেরই ইঙ্গিত লক্ষ করা যায়—

আমার মগজ একটি বাগান, দৃশ্যাবলিময়।
কখনো তরুণ রৌদ্রে কখনো-বা ষোড়শীর যৌবনের মতো
জ্যোৎস্নায় উঠতো ভিজে।
...
এখন যা-কিছু লিখি সবকিছুতেই
ভর করে লক্ষ লক্ষ গুলিবিদ্ধ লাশ। কখনো-বা
গোইয়ার চিত্রের মতো দৃশ্যাবলি খুব
অন্তরঙ্গ হয়ে মেশে প্রতিটি অক্ষরে।
প্রতিটি পঙ্‌ক্তির রন্ধ্রে রন্ধ্রে
বিধবার ধূ-ধূ আর্তনাদ
জননীর চোখের দু'কূল ভাঙা জল
হু হু বয়ে যায়। প্রতি ছত্রে
নব্য হিরোশিমা, দাউ দাউ
কত মাইলাই।
('প্রতিটি অক্ষরে', *বন্দি শিবির থেকে*)

চকিতে বদলে যাওয়া শহরের রাজপথে, পার্কের বেঞ্চি, এভিনিউ, চৌরাস্তার বিপ্লবের তরঙ্গমালা, সন্ত্রাসের কালো ছায়া, আকাশে-বাতাসে হত্যার হুলিয়া, দগ্ধ গ্রাম-নগর ও স্বাধীনতা-সংগ্রামের বিচিত্র সংঘটন কবিকে পরিচালিত করেছে এ পর্যায়ে। ফলে, এই কালসীমায় লেখা কবিতাগুলো অধিকাংশক্ষেত্রেই সহজ-সরল, বিবরণধর্মী, সাংবাদিকতার মত অনুপুঙ্খ-প্রায়। শৈল্পিক দায়বদ্ধতা ছিল না বলে মিশ্র ফর্মে, বিভিন্নভাবে কবি তাঁর অনুভূতিকে ব্যক্ত করেছেন, যখন যেমন সঙ্গত—কখনো আংশিক নাটকীয়তার আশ্রয়ে, কখনো ঐকান্তিক আবেগে লিরিকের মত, কখনো উপমা-চিত্রকল্প-প্রতীকের সূক্ষ্ম আবরণে। ভাবের বিস্তৃতায়নে শব্দ ও বাক্যের পুনরাবৃত্তিতে কখনো ঘটেছে উপমাগুচ্ছের কেবল উৎসারণ। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, কবি এ পর্যায়ে পূর্বের মত সচেতন শব্দ-ধ্যানে ও সূক্ষ্ম বিন্যাসে বিরত থেকেছেন। হন্তারক সময়ে কবি তাঁর চেতনার কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন স্বেচ্ছায় এবং অধিকাংশ সময় তাঁর ভাষাকে সেই ভাবনাপ্রবাহের অনুসারী করেছেন। কারণ, আত্মমগ্ন, বিবরবাসী কবি, যিনি আজন্ম ঘৃণা করেন যুদ্ধকে, স্বদেশের বিপন্নতায় তিনিও বুঝে নেন, 'যুদ্ধই উদ্ধার'। তাই তাঁর কলমও হয়ে ওঠে এক অলক্ষ মারণাস্ত্রের মত।

নিজ বাসভূমে থেকে *ফিরিয়ে নাও ঘাতক কাঁটা* পর্যন্ত দ্বিতীয় পর্যায়ের কোনো কবিতায় কবি নাটকীয়তার আশ্রয়ী, আখ্যান-অনুরক্ত এবং সম্ভাষণ-প্রিয়। আঙ্গিকের বৈচিত্র্য সাধনই তার লক্ষ্য। *নিজ বাসভূমে*'র 'পুলিশ রিপোর্ট' কবিতায় কবি একজন পাকিস্তানী পুলিশের দৃষ্টিকোণ থেকে বয়ান করেছেন গণঅভ্যুত্থানের বিস্তৃত মশাল-মিছিলকে। সেই অগ্নিল জনসমুদ্রকে তাঁর কাছে মনে হয়েছে মুসার দেখা উজ্জ্বলতার চেয়েও জ্বলজ্বলে। বুলেটবিদ্ধ কোনো তরুণের তাজা উষ্ণ রক্তের দাগ সৈনিকটি তাঁর হাত থেকে মুছতে পারে না 'ম্যাকবেথে'র মত সহস্র চেষ্টায়ও—মুছে ফেলতে পারে না 'হোর্স পাইপের অজস্রতায়'ও। ব্যারাকে নির্ঘুম কাটে তার রাত। পাক-পুলিশের সেই অমোচনীয় পাপবোধকে কবি নাটকীয় মাত্রায় উপস্থাপন করেন তাঁর কবিতায়—

> ঘড়িতে গভীর রাত, ব্যারাক নিশ্চুপ। বারান্দায়
> করি পায়চারি আর হঠাৎ কখনো কানে ভেসে আসে
> সমুদ্রের বিপুল গর্জন;
> সুন্দরবনের সব বাঘ যেন আমার ওপর
> পড়বে ঝাঁপিয়ে ক্ষমাহীন।
> ('পুলিশ রিপোর্ট', *নিজ বাসভূমে*)

একইভাবে, *বন্দী শিবির থেকে*'র 'জনৈক পাঠান সৈনিক' কবিতায় ক্ষমতান্ধ শাসকের রক্ত-পিপাসা চরিতার্থতা উদ্দেশ্যে ইচ্ছা বা অনিচ্ছায় তার যন্ত্ররূপে নিয়োজিত এক পাঠান সৈনিকের উপলব্ধিতেও কবি এক ধরনের নিঃসহায়তা ও সন্তাপ কল্পনা করেন—

এ-মুল্লুকে জিপসির মতো ঘোরে মৌত, বড় ক্ষিপ্র;
হচ্ছে ফৌত বেশুমার লোক, বড় নিরস্ত্র নিরীহ,
দেহাতি, শহুরে, দিনরাত। গ্রামে-গ্রামে
দেয় হানা সাঁজোয়া বাহিনী, মানে আমরাই। যুবা,
বৃদ্ধ, নারী, শিশু
শিকার সবাই—চোখ বুজে ছুঁড়ি গুলি ঝাঁক ঝাঁক।
মনে হয়, যেন আমি নিজেই কাবিল !
কিছু বুঝি আর না-ই বুঝি, এটুকু ভালোই বুঝি
আমাদের সাধের এ-রাষ্ট্র পচা মাছের মতন
ভীষণ দুর্গন্ধময় আর
ক্ষমতান্ধ শাসকের গদি সামলাতে
আমরা কাতারবন্দি ফৌজ সর্বদাই।
('জনৈক পাঠান সৈনিক', *বন্দী শিবির থেকে*)

বৈরী পক্ষের শত্রু-সেনাদের প্রেক্ষণ থেকে আমাদের দেশের আন্দোলন-সংগ্রাম কিংবা গণহত্যার চিত্র বর্ণনার এই পরোক্ষ রীতিটি বেশ কৌতূহলোদ্দীপক, অভিনব। আঙ্গিকের ভিন্নতা সাধনের লক্ষ্যেই হয়ত কবি বৈরীসেনাদের বিপরীত প্রেক্ষনের প্রয়োগ ঘটান। পাঠান সৈনিকের ভাষায় বিবরণ দেন বলে প্রাসঙ্গিকভাবে কবি ব্যবহার করেন 'মৌত', 'ফৌত', 'কাবিল', 'ফৌজ' প্রভৃতি উর্দু শব্দাবলি এবং সেই সাথে আরোপ করেন দু'টি চমৎকার উপমা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, শব্দের শূঁচিবায়ুগ্রস্ততাকে শামসুর রাহমান কখনো আমলে আনেননি। তিনি অসাম্প্রদায়িক ও মনে-প্রাণে বাংলাভাষাকে ভালোবাসেন। ৬০'এর দশকে বাংলা বর্ণমালার উপর পশ্চিমী শোষকের আধিপত্যে ক্রুদ্ধ হলেও কবিতা রচনা করতে গিয়ে বাংরা শব্দের সাথে আরবি-ফারসি বা যে-কোনো বিদেশী শব্দের যথাযথ মিশ্রণকে দোষাবহ বরে মনে করেননি। কবির ভাষায়—

> কোনও কোনও ক্ষেত্রে আরবি ফারসি শব্দের ব্যবহার করা যেতেই পারে।... আমাদের শব্দে আরবি ফারসি ব্যবহার করা যাবেই না—এমন গোঁড়ামিরও পক্ষে আমার সায় নেই। এজন্য আমি মাঝে মাঝে জুৎসই আরবি ফারসি শব্দ আমার লেখায় ব্যবহার করি নির্দ্বিধায়। অনর্থক প্রত্যেকটি বাক্যে জোর জবরদস্তি করে বিদেশী শব্দ ব্যবহার কোনও সুস্থ মস্তিষ্কের ব্যক্তি করতে পারেন না (শামসুর, ২০০৭: ১৭২)।

কবির শেষোক্ত বাক্যটি ফর্‌রুখ আহমদ বা তাঁর মতো আরবি-ফারসি-মুগ্ধ বাঙালি কবিদের উদ্দেশ্যে উচ্চারিত। সুতরাং শামসুর রাহমানের শব্দ-প্রয়োগের অভিপ্রায়টি স্পষ্ট—শব্দের বর্নভেদ নয়, বরং কবিতার প্রয়োজনটি সেখানে মুখ্য।

নাটকীয়তা শামসুর রাহমানের কবিতার প্রিয় প্রসঙ্গ। কবিতায় নাটকীয়তা সৃষ্টির প্রয়োজনে তিনি ব্যবহার করেন বিভিন্ন চরিত্রের দৃষ্টিকোণ—উপর্যুক্ত কবিতা দু'টি যেমন বর্ণিত হয়েছে পাক-সৈনিকের প্রেক্ষণে। স্বাধীনতার অব্যবহিত আগে রাজাকারদের চক্রান্তে বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর বীভৎস হত্যা-যজ্ঞের প্রেক্ষাপটে লেখা 'তাঁর উক্তি'তে কবিতায় কবি রায়েরবাজার বধ্যভূমিতে অশনাক্ত কোনো বুদ্ধিজীবীর কঙ্কালের স্বগতোক্তিতে বয়ান করেন তাঁর দ্রোহ, ক্ষোভ ও বেদনা—

এই যে করোটি দেখছেন, একদা এটাই ছিল
স্বীকৃত আমার দামি মাথা আর মাথার ভেতর
নানাবিধ চিন্তা পুঞ্জ পুঞ্জ
মেঘের মতন সূর্যোদয় কি সূর্যাস্তে
মোহন রঙিন
এবং গভীর বিবেচনা—
সেখানে ফ্রয়েড, কাল মার্কস, রিল্কে, ডস্তয়ভস্কির
শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে ছিল না বাধা কোনো।
এই যে যময লাঠি, সরু, শাদা, এরাই আমার
দু'টি বাহু, কোনোদিন কী আবেগে ধরত জড়িয়ে
দয়িতাকে। আর এই শূন্য জায়গাটায়
স্পন্দিত হৃদয় ছিল, যা ওরা নিয়েছে উপড়ে পাশব আক্রোশে
আর এইমাত্র যেটা লোভাতুর কুকুর শেয়াল
পালাল সাবাড় করে, একেই তো জানতাম আমার নিজস্ব
কণ্ঠ বলে, যে-কণ্ঠে ধ্বনিত হ'ত বারংবার অসত্য অন্যায়
ইত্যাদির বিরুদ্ধে ঝাঁঝালো প্রতিবাদ, যে-কণ্ঠে ধ্বনিত হ'ত
কল্যাণের প্রগতির কী সজীব জিন্দাবাদ আর স্বাধীনতা, স্বাধীনতা।
এজন্যই জীবনের বৈমাত্রেয় দ্বিপ্রহরে হলাম কঙ্কাল।
('তাঁর উক্তি', *বন্দি শিবির থেকে*)

এছাড়া এ পর্যায়ের চারটি কাব্যের বিভিন্ন কবিতায়—যেমন, 'ঐকান্তিক শ্রেণীহীনা', 'ললাটে নক্ষত্র ছিল যার', 'মধুস্মৃতি', 'রক্তাক্ত প্রান্তরে', 'তুমি কে হে?', 'ক্ষমাপ্রার্থী' প্রভৃতি কবিতায় আখ্যান ও নাটকীয়তার মধ্য দিয়ে কবি কখনো বিপ্লবী নারীকে, মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী কোনো দামাল যুবককে, কখনো স্মৃতি হাতড়ে মধুর কেন্টিনের মধু'দাকে, কখনো শহীদ বুদ্ধিজীবী মুনীর চৌধুরীর স্মৃতির প্রতি প্রণতি জানিয়ে কিংবা যুদ্ধহত কোনো বন্ধুর কাছে হাঁটু গেঁড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করে, স্মৃতিচারণে, স্বগতভাষণে, নাটকীয়তায় বেশ কিছু কবিতা রচনা করেছেন কবি। আবার কখনো কবিতার পর কবিতায় সহজ-সরল, অন্তর্গাঢ় ভাষায় কবি বিবরণ দিয়ে গেছেন সন্ত্রস্ত সময়ের নানা চিত্রের। কারফিউ, তল্লাশি, অগ্নিসংযোগ ও নির্বিচার হত্যার স্বচক্ষে দেখা নানা দৃশ্যকে কবি সংবাদ-প্রতিবেদনের মত করে উপস্থাপন করেছেন কবিতায়। যেমন:

সহসা শহরে কারফিউ, সবখানে
সন্ত্রাস দখলদার। পাড়ায় পাড়ায় ঢুকে পড়ে

নরকের ডালকুত্তাগুলো; সঙ্গে নেড়ি
কুকুরের দল, ধার করা তেজে আপাতত তুখোড়!
...
হঠাৎ কপাটে
বুটের বেদম লাথি, হাঁক-ডাক। তুই-তোকারির
ডাকে বান, নিমেষে উঠোনে
খাকি উর্দি কতিপয়; মরণলোলুপ কার্বাইন
গচ্ছিত সবার কাঁধে, কারও-বা বাহুতে
চওড়া সবুজ ব্যাজ। ভয়-পাওয়া জননী তাকান
তরুণ পুত্রের দিকে, লাফাচ্ছে বাঁ চোখ
ঘন-ঘন; বিমূঢ় জনক প্রস্তরিত
তরুণী কন্যার হাত ধরে ত্রস্ত খুব,
ঘরের চেয়েও বেশি নিরাপদ আশ্রয় খোঁজেন
দিগ্বিদিক।
('শমীবৃক্ষ', *বন্দী শিবির থেকে*)

অস্তিত্বের সেই অনমনীয় সময়ে কবিত্ব যেন নিস্প্রয়োজন, এমনকি প্রবল শব্দ-সচেতন কবির জন্যও। ঘটমান বর্তমানের সুরে রক্তাক্ত সমকাল ও তার ঘটনাপ্রবাহে কেবল গেঁথে রাখেন কবি রোজনামচার মত। তবে, দিনলিপির মত কিংবা রিপোর্টধর্মী হলেও কবিতাগুলো নান্দনিকতা-বর্জিত নয়। অগ্রজ সুহৃদ লেখক জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী শামসুর রাহমানের কবিতায় সংবাদ পরিবেশনের এই নান্দনিকতা সম্পর্কে বলেন—'' বলা যায়, এই ব্যক্তিত্বই তাঁর কবিতার মূলধন, বাইরের ঘটনাবলি নয়। পেশায় সাংবাদিক, কবিতায় বিস্তর সাংবাদিকতার উপকরণ ও লক্ষণ নিয়েও বলতে পারি, সবই তাঁর কবিত্বের রসে জারিত'' (জিল্লুর, ২০০৬: ৪২)। তবে, গভীর আততি নিয়েও কবি কেবল অভ্যাস বশতই নয়, ঐকান্তিক দায়বদ্ধতায় ডাইরির পাতায়-পাতায় মুদ্রিত করে গেছেন যে শব্দমালা, তা নিতান্ত বিশুষ্ক নয়—তাতে অনুভব করা যায় ত্রাসের তরাস, অপারগতার ক্ষমাহীন প্রলাপ, অক্ষম ক্রোধের উষ্ণশ্বাস, জিঘাংসার অনল। মূলত অলঙ্করণ নয়, বরং স্বাভাবিকত্বই এই কবিতাগুলোর নান্দনিক বিশেষত্ব।

সর্বপ্রথম কাব্যগ্রন্থের নাম কবিতা, *প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যু আগে* থেকেই মিথ শামসুর রাহমানের কবিতার এক উল্লেখযোগ্য অনুষঙ্গ। *নিরালোকে দিব্যরথে*'র শেষ কবিতা 'টেলেমেকাসে'ই গ্রিক মিথের প্রচ্ছদে বাংলাদেশের ইতিহাসকে তিনি উপস্থাপন করেছিলেন শৈল্পিক মহিমায়। সেখানে শত্রু-আক্রান্ত বিপন্ন 'ইথাকা' হয়ে উঠেছিল নব্য উপনিবেশিত বাংলার প্রতিরূপক এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান প্রতিস্থাপিত হয়েছিলেন 'অডেসিয়াস' চরিত্রে। দ্বিতীয় পর্যায়ের কবিতায় মিথ, চূর্ণ মিথ, ইতিহাস ও রূপকথার আদলে কবি উপস্থাপন করেছেন দেশের যুদ্ধকালীন নানা সংকটকে।

পাকিস্তানী স্বৈরশাসক যখন একদিকে বাংলায় নির্বিচার গণহত্যায় মত্ত, অন্যদিকে. গণমাধ্যমগুলোতে তাদের সে হত্যা, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগের পক্ষে সাফাই গাইতে দ্বিধাহীন, তখন কবি প্রবল ক্ষোভে ক্ষমতাসীন প্রেসিডেন্টকে ব্যজস্তুতির ছলে 'ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির' বলে ব্যঙ্গ করেন। মত্ত গণ্ডারের প্রতীকে কবি চিহ্নিত করেন এই দলনপ্রিয় শোষককে, যে সাজানো কমলবনের মত আমাদের বাংলার সবুজ প্রান্তরকে ছিন্ন-ভিন্ন করেছে আর সেই স্বৈরশাসকের আদর্শপুষ্ট এদেশীয় সুবিধাভোগী , চাটুকার, রাজাকার, আলবদর বাহিনী, যারা রাতের অন্ধকারে দেশের বুদ্ধিজীবীদের চোখ বেঁধে বধ্যভূমিতে নিয়ে যেতে পথ দেখায় শত্রুপক্ষকে, যারা নির্বিচার হত্যা-লুণ্ঠন- ধর্ষণ-অগ্নিসংযোগে চিহ্নিত শত্রুদের একান্ত দোসর, দুর্দিনে দেশের মানুষের সাথে ষড়যন্ত্রকারী, তাদের তিনি ইতিহাসের স্বীকৃত বিশ্বাসঘাতক 'মোহাম্মদী বেগ' আর 'মীরজাফর' বলে উল্লেখ করেন—

তুমুল গাইছে গুণ কেউ-কেউ কুণ্ঠাহীন খুনি
সরকারের, কেউ-কেউ ইসলামী বুলি ঝেড়ে তোফা
বুলবুল হতে চায় মৃতের বাগানে।
কেউবা জমায় দোস্তি নিবিড় মাস্তিতে
ভার্তৃঘাতকের সাথে। গদগদে দালাল,
বখাটে যুবক আর ভাড়াটে গুণ্ডারা
রটাচ্ছে শান্তির বাণী লাঠিসোটা নিয়ে
অলিতে-গলিতে দলে-দলে
মোহাম্মদি বেগ ঘোরে, ঝলসিত নাঙা তলোয়ার।
নেপথ্যে মীরজাফর বঙ্কিম গোঁফের নিচে মুচকি হাসেন।
('প্রাত্যহিক', *বন্দী শিবির থেকে*)

দ্বিতীয় পর্যায়ের কাব্যগুলোতে মিথ বা ইতিহাস প্রয়েগের লক্ষণীয় দিক হলো প্রত্যক্ষতা। কোনো প্রতিরূপকের আচ্ছাদনের প্রয়োজন নেই আর। সরাসরি শব্দ ও বাক্য প্রয়োগে, উল্লিখনের মাধ্যমে তিনি বাংলার বিরূপ সময়কে উপস্থাপন করেছেন। ইসলামী ইতিহাসের অনুষঙ্গ, হিন্দু পুরাণ ও গ্রিক মিথ। যেমন, শত্রু উপদ্রুত বাংলা কবির কল্পনায় হয়ে ওঠে 'মহাভারতে'র ধ্বস্ত দ্বারকার প্রেক্ষাপট, যেখানে বর্বর-কর্তৃক লুণ্ঠিত হয় কবির সুবর্ণ বাঁশিখানিই। শোষকের রক্তচক্ষুর সামনে শিল্পী-কবির স্বয়ম্প্রকাশ সত্তার অবদমনের বিপন্নতাকে ভারতীয় পুরান-অনুষঙ্গে প্রকাশ করেন কবি (ধ্বস্ত দ্বারকায়, *বন্দি শিবির থেকে*)। বাঙালির সশস্ত্র যুদ্ধের উন্মাদনা উন্মাদনা গ্রামীণ জীবনের নিস্তরঙ্গতায়ও তুলেছিল তোলপাড়। শান্ত-শিষ্ট পল্লি-যুবকের সুশীতল রক্তেও সেদিন ফণা তুলেছিল সহস্র বাসুকি। মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও তাই সে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল দুর্বার সংগ্রামে ('গ্রামীণ', *বন্দী শিবির থেকে*)। অসংখ্য মৃতদেহ বাংলার পথে-ঘাটে পড়ে থাকতে দেখে কবি স্মরণ করেছেন গ্রিক মিথের 'আন্তিগোনে'কে, যে স্বৈরশাসক ক্রেয়নের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে প্রবল দুঃসাহসে তার মৃত সহোদর পলিনেসেসকে

সমাধিস্থ করে কারাবরণ করেছিল (সুধাংশু, ১৯৬০: ২৫৬-২৫৯)। বাংলার বুকে ইতস্তত ছড়িয়ে থাকা সৎকারবিহীন সহস্র লাশের ত্রাণের জন্য কবি আহ্বান করেন মমতাময়ী, দুঃসাহসী 'আন্তিগোনে'কে—

আন্তিগোনে দ্যাখো চেয়ে—
একটি দু'টি নয়কো মোটে,
হাজার হাজার মৃতদেহ
পথের ধূলায় ভীষণ লোটে।
রৌদ্রে শুকায় রক্তধারা,
মাংস ছেড়ে শবাহারী,
কে দেবে গোর দুর্বিপাকে?
নেই যে তুমি উদার নারী।
('আন্তিগোনে', *বন্দি শিবির থেকে*)

স্বরবৃত্ত ছন্দে মিথের উল্লিখনে বিষাদ সঞ্চারিত করে দিয়েছেন কবি 'আন্তিগোনে' কবিতায়। কখনো সাহিত্যের অনুষঙ্গকেও উল্লিখন হিসেবে ব্যবহার করেন কবি। যেমন, ১৯৭০'এর বন্যায় উপদ্রুত স্বদেশকে কবি কল্পনা করেন শেক্সপিয়রের 'হ্যামলেট' নাটকের 'ওফেলিয়া'র মত জলে ভাসমান এক বিস্রস্ত সুন্দরীর অবয়বে—

তোমাকে দেখলে মন আজ হয় উচাটন।
তোমার সুদীর্ঘ চুল ভাসে জলে, তুমি ভাসো সরলা সুন্দরী
কখনো অত্যন্ত মৃদু সুরে গাও গান, স্তব্ধ হও কখনো-বা,
যেন ওফেলিয়া।
('বহু কিছু থেকে ছুটি', *দুঃসময়ের মুখোমুখি*)

রূপকথার আদলে ছড়ার ছন্দে শোষককে লক্ষ্য করে ব্যঙ্গ কবিতাও রচনা করেছেন কবি, যেমন ইতঃপূর্বে *নিরালোকে দিব্যরথে* আইয়ুব খানকে নিয়ে লিখেছিলেন 'হাঁতির শুঁড়'। কবিতায় পশ্চিম পাকিস্তানী শোষকের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক শোষণ-বঞ্চণা আর দমননীতি এবং বাক্-স্বাধীনতা হরণের মনোভাবকে ব্যঙ্গ করে *নিজ বাসভূমে* কাব্যে কবি স্বরবৃত্ত ছন্দে লিখেছেন 'ধন্য রাজা' কবিতাটি—

ধন্য রাজা ধন্য
দেশজোড়া তার সৈন্য।
ঢ্যাম কুড় কুড় বাজনা বাজে
পথে-ঘাটে সান্ত্রি সাজে
শোনো সবাই হুকুমনামা,
ধরতে হবে রাজার ধামা
বা দিকে ভাই চলতে মানা,
সাজতে হবে বোবা-কানা।
মস্ত রাজা হেলে দুলে
যখন তখন চড়ান শূলে

মুখটি খোলার জন্য।
ধন্য রাজা ধন্য।
('রাজকাহিনী', *নিজ বাসভূমে*)

শামসুর রাহমান ছন্দ-বিন্যস্ত কবিতা লিখতেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন। এমনকি তাঁর সমকালের নতুন কবিরা যখন প্রচলিত ছন্দে বিমুখ হয়ে গদ্যকবিতায় মত্ত হয়েছে তখনো তিনি অক্ষরবৃত্ত, মুক্তক, মাত্রাবৃত্ত এমনকি স্বরবৃত্ত ছন্দে নিয়মিত কবিতা রচনা করেছেন। ছন্দ-সচেতনতা সম্পর্কে কবি এক সাক্ষাৎকারে বলেন—''আমি মনে করি, আমি যে কাজটি করবো সেটা সুচারুভাবে সম্পাদন করা উচিত। ছন্দের যেন কোনো পতন না ঘটে, সেদিকে কবির খেয়াল রাখা দরকার। ছন্দজ্ঞানটাঅনেকের থাকে না। আমি মনে করি, কবি ছন্দ জানবেন না, বা ছন্দে ভুল করবেন এটা ঠিক নয়'' (শামসুর, ১৯৯১: ১২৮)। শামসুর রাহমান তাঁর সব পর্বের কাব্যে অক্ষরবৃত্তের পাশাপাশি এমন সমিল ছন্দে কবিতা রচনা করেছেন।

ফিরিয়ে নাও ঘাতক কাঁটা স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে রচিত। ফলে, এ কাব্যে কবি স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়কালকে স্পর্শ করেন অতীতচারিতার সূত্রে। বস্তুত, কবির বিগত কয়েক দশকের যাপিত জীবনের 'স্মৃতির পুরাণ' এই কাব্য, যাকে তিনি বলেছেন 'মহররমী স্মৃতির প্রহর'। কবির জীবনের এই কাল-সীমায় নানা আনন্দ-বেদনা, চড়াই-উৎরাই শোষণ সংগ্রাম, শোক-অর্জন, স্বপ্ন-স্বপ্নভঙ্গের সাথে জড়িয়ে থাকে মুক্তিযুদ্ধের অনপনেয় স্মৃতিগাঁথা। ফলে, স্মৃতিসূত্রেই এ কাব্যে বারংবার ক্রিয়াপদের অতীতকালের প্রয়োগ ঘটিয়েছেন কবি। কাঠামোগত দিক থেকেও কাব্যটি অব্যবহিত পূর্বের কাব্যগুলি থেকে অনেকাংশে ভিন্নতর, অপেক্ষাকৃত জটিল বিন্যাসের। নয় মাস রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম ও অসংখ্য আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত বাঙালির কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা 'মুছে ফেলে ব্যাপক নরক'। যদিও শোষণ ও নিধনের 'ভীতিচিহ্নগুলো' কবির ভাষ্যে মুছে যায় সুমসৃণরূপে শহর ও গ্রাম থেকে, তবুও স্বাধীনতার অব্যবহিত পরের দিনগুলোতেও সেই অনপনেয় ত্রাস একেবারে মুছে যায় না বাঙালির মন থেকে। যদিও কবি অন্তর্হিত শোষককে উদ্দেশ্য করে সদর্পে বলেন—'ফিরিয়ে নাও ঘাতক কাঁটা, এবার আমি গোলাপ নেব', তবু দারুণ 'হাইড্রা ভয়' কবির দুঃস্বপ্নে হানা দেয় যখন-তখন। স্বপ্নের সেই বিভীষিকাকে কবি অতিবাস্তব বহিরাশ্রয়ে প্রকাশ করেন—

ভীতিচিহ্নগুলো মুছে যাচ্ছে একে একে সুমসৃণ;
অথচ আমার বুক, মগজের কোষ
শিরা-উপশিরা
এখনও তো সন্ত্রাসের প্রজা।
...
হঠাৎ জানালা থেকে একটি রোমশ হাত ঘরে

ঢুকে পড়ে, বিচূর্ণিত গেরস্থালি। জামবাটি বুড়ো
নাবিকের ফিচেল করোটি হয়ে নৃত্যপর উদোম মেঝেতে।
প্রভুভক্ত কুকুরের মতিভ্রম, অকস্মাৎ আমার গলায়
তার রক্তখেকো দাঁত ব'সে যায়। আমার ছেলেটা
তার অনুজের মাথা কেটে হো হো হেসে ওঠে, সন্তানের রক্ত
নিজের জঠরে কেলিপরায়ণ! একটি যুবতী, উন্মাদিনী,
ঘাসের মৌসুমী ফুল চিবুচ্ছে কেবল, নাকে তার
লাভাস্রোতে। সহোদরা বিষম ঝুলছে কড়িকাঠে। একজন
লোলচর্ম বৃদ্ধ মারহাবা ব'লে তার নকল সফেদ দাঁতে
কুটি কুটি করে কাটছেন কিশোরীর মাই। আমার সমস্ত ঘর
চাপ-চাপ বরফে আকণ্ঠ ঢাকা, মুর্দাফরাশের
গান ভাসমান সবখানে।

('ভীতিচিহ্নগুলি', *ফিরিয়ে নাও ঘাতক কাঁটা*)

সংখ্যাবাচক শব্দের ব্যবহারে অতিরঞ্জন ঘটিয়ে ধ্বংসপ্রবণ সমকালের নানা ভয়াবহতার প্রকাশ ঘটাতে 'হাইপারবোল' ব্যবহৃত হয় কবিতায়। লিভারপুল কবিদের কেউ-কেউ কবিতার এই বিশেষ অলংকারিক উপাদানটি ব্যবহার করেছিলেন। যেমন, অ্যাড্রিয়ান হেনরি'র 'I want to paint' কবিতার নিম্নোক্ত পঙ্‌ক্তিগুলো—

I want to paint
2000 dead birds crucified on a background of night
Thoughts that lie too deep for tears
Thoughts that lie too deep for queers
Thought that moves at 186000 mile/second
The Entry of Crist into Liverpool in 1966
…
I want to paint
The Simultaneous and historical Faces of Death
1000 shocking pink hearts with your name on
The phantom negro postmen who bring me money in my Dreams

(Henri, MacGough, Patten; 1975: 24-25)

শামসুর রাহমানও ভাষার এই বিশেষ রূপকায়ণে প্রকাশ করেছেন তাঁর সময়ের সন্ত্রস্ততাকে। স্বাধীনতার পরও ৭১' এর সেই ভয়াল মুহূর্তগুলোতে কবির স্বচক্ষে দেখা হত্যা, ধর্ষণ, অস্তিত্বের ভীষণ দলন প্রকম্পিত করে কবির অবচেতন সত্তাকে। কবির সে ত্রাস কবিতায় প্রকাশ পায় বিকৃত বাস্তবরূপে। প্রকৃতপক্ষে, নানাভাবে—বর্তমানের সাথে অতীতের সংযোগসূত্রে, স্মৃতিকথনে কিংবা সময়ের প্রচ্ছন্ন ধারায় বয়ে, দৈশিক প্রেক্ষাপট কিংবা কবির ব্যক্তিগত জীবনের চরিতার্থতা-অচরিতার্থতার সূত্রে বারবার স্বাধীনতার কথা এসেছে *ফিরিয়ে নাও ঘাতক কাঁটা*'য়। স্বাধীনতা-উত্তর নতুন বৈরী সময়ে বাস্তব যখন ভেল্কিবাজি দেখাচ্ছে এবং মধ্যবিত্ত জীবিকা-কাতর অথচ সংবেদনশীল

কবির চারপাশে অসংখ্য খানা-খন্দ, এবং সে মীনরাজ্যে অভিমন্যুর মত কবি বড় বড় রুই-কাতলার মত শক্তিধরের বিরুদ্ধে একাকী সংগ্রামশীল, তখন হাইপারবোল (hyperbole) বা 'অতিশয়োক্তি'র সূত্রে কবি বর্তমান ও অতীতকে সূত্রবদ্ধ করেন—

বস্তুত চাদ্দিক আজ কুয়াশায় ঢাকা। সতর্কতা
এখন একান্ত কাম্য। নইলে হয়তো অন্ধকূপ গিলে
খাবে, হয়তো স্কন্ধকাটাদের সঙ্গে হবে ঠোকাঠুকি
টর্চও নেই, কে নিরীহ পান্থ কে বা দস্যু বোঝা দায়।

১৯৭৩ টি বাড়ি ধ্বংস হয়ে গেছে
১৯৭৩ টি শহরকে গিলে খাচ্ছে আঁধার ভূতল
১৯৭৩ জন ভেসে যাচ্ছে কী বিশাল ড্রেনে
১৯৭৩ নদীর হিংস্রতা ভয়ানক যাচ্ছে বেড়ে,
আমি দেখছি না।

('এ কেমন বৈরী তুমি', *ফিরিয়ে নাও ঘাতক কাঁটা*)

মূলত, অত্যুক্তি এবং ভাষার বিমূর্তায়নের মধ্য দিয়ে কবি ত্রিকালকে বিন্দুবদ্ধ করেছেন—যুদ্ধে আমাদের যা কিছু ধ্বংস হয়ে গেছে এবং কালের ভুক্তাবশিষ্টরূপে যা কিছু আছে, এই নতুন মাৎস্যন্যায়ের সময়ে তাও অপচিত হবার আশঙ্কা ব্যক্ত করেন কবি। '১৯৭৩' সেই সূত্রে যুদ্ধপরবর্তী সময়ের সামূহিক ক্ষয়-ক্ষতির প্রতীকবাহী সংখ্যা। সমকালের নিঃসহায়তায় মৃত্যুচেতনা যখন কবিকে আচ্ছন্ন করে, তখনো কবির সত্তা ফুঁড়ে বেরিয়ে আসে বিগতযুদ্ধের গণকবরের দুঃসহ স্মৃতি ('মহর্‌রমী স্মৃতির পুরাণ', *ফিরিয়ে নাও ঘাতক কাঁটা*)। মুক্তাঙ্গনের মেলায় দাঁড়িয়ে কবি বিগত যুদ্ধে শহীদদের উদ্দেশ্যে মর্সিয়া ক্রন্দনে আর বিশ্বাসী নন; বরং কয়েক লক্ষ যীশু, যাদের হারিয়েছে বাংলা, এদেশের মানুষের হৃদয়ের রক্তসেচে তাঁরা জীবন্ত রবেন জীবিতের চেয়েও বেশি—এই আকাঙ্ক্ষাই ব্যক্ত করেন। *ফিরিয়ে নাও ঘাতক কাঁটা*'য় স্বাধীন দেশে স্মৃতিচারণের সূত্রে, উজ্জীবনের মন্ত্ররূপে, শহীদদের প্রতি কৃতজ্ঞতায় বারবার কবির কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে স্বাধীনতার কথা। মুক্তাঙ্গনের মেলায় কবি স্মরণ করেছেন অগণিত মানুষের স্মৃতি, যাদের আত্মত্যাগে এ দেশ স্বাধীন এখন। একেকটি প্রতীকী চরিত্রে সেই আত্মত্যাগের তাৎপর্যকে প্রকাশ করেন কবি:

এই যে দেখুন,
আমার দু'চোখে দগ্ধ গ্রাম বেশুমার,
আমার ললাটে
আহত শহরগুলো ব্যান্ডেজসমেত
শুয়ে আছে। দেখুন আমার বুকে রক্তে-ভেসে-যাওয়া
মরিয়ম নিঃস্পন্দ কেমন,
আমার বাহুর কোণে ভয়ানক ছিন্নভিন্ন শীতল বাবলু
অচঞ্চল; আমার পাঁজরে

শচীন শাঁখারি, রাজমিস্ত্রি জাবেদালি
মুখ থুবড়ে পড়ে আছে; শরীরে ভীষণ ফুঁটোগুলো
নগ্ন চক্ষুময়।
আমার চিবুকে কত ভগ্ন সেতু বারুদের গন্ধে
ভরপুর কত যে পরিখা,
আমার চোয়ালে লগ্ন লক্ষ্মীবাজারের
সুহাসিনী দেবীর রক্তিম শাড়ি, যেন স্বাধীনতার পতাকা।
('আমি তো মেলারই লোক', *ফিরিয়ে নাও ঘাতক কাঁটা*)

সবশেষে ক্ষ্যাপা দুর্বাশার মত প্রচণ্ড ঘৃণা ও ক্রোধে কবি অভিসম্পাত করেছেন সেইসব বর্বরদের, যারা আমাদের সমস্ত স্বাধীনতাকে রুদ্ধ করে রেখেছিল বেয়োনেট, বুলেট আর সঙ্গিনের নিচে। মুক্তাঙ্গনে দাঁড়িয়ে শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে কবি অভিসম্পাত করেন স্বাধীনতার শত্রুদের—

তবু আজ এখানে দাঁড়িয়ে এই রক্ত গোধূলিতে
...
অভিশাপ দিচ্ছি
অভিশাপ দিচ্ছি
অভিশাপ দিচ্ছি...
('রক্তসেচ', ফিরিয়ে নাও ঘাতক কাঁটা)

একটি সরল বাক্যের পুনরাবৃত্তিতে কবির ক্ষমাহীন অভিশাপ প্রতিধ্বনিত হতে থাকে।

'রুপালি-স্নান'-অভিলাষী কবি তাঁর 'শব্দে-শহীদ' সত্তাকে দৈশিক রাজনৈতিক চরম সংকটে আমুল বদলাতে বাধ্য হয়েছেন বটে, কিন্তু সঙ্গতভাবেই ব্যক্তি-অস্তিত্ব ও জাতিগত অস্তিত্বের অভিন্ন সংকটেও কবিতার বন্ধ্যাত্মকে মুহূর্তের জন্যও স্বীকার করেননি বরং বৈরী সময়ে ব্যক্তি-সমাজ-দেশ-কালকে অভিন্ন আধারে প্রকাশের এক ভিন্নতর নন্দনসূত্র খুঁজে নিয়েছিলেন। মর্মের ভেতর প্রচ্ছন্ন থাকা একটি 'ফর্ম'কে অভিব্যক্তি প্রকাশের বিস্ময়কর ক্ষমতায় সপ্রতিভ করে তুলেছেন কবি তাঁর দ্বিতীয় পর্যায়ের কাব্যসমূহে। তিনি শব্দ নিয়ে খেলেছেন, শব্দকে স্লোগানের মত করে আউড়েছেন, রীতিমুখ্য কবিতার জন্ম দিয়েছেন। কিন্তু তা মতবাদী কিংবা কলাকৈবল্যবাদী কবিদের মত করে নয়। রাজনীতিকে শোষণ করে তাকে কবিতায় রূপান্তরিত করেছেন কবি। পাশ্চাত্য কবিদের কবিতার বিশেষ আঙ্গিকটিকে কবি আত্তীকৃত করেছেন নিজস্ব স্বভাবে এবং সৎ ও অন্তর্ভেদী কবিত্বে তাকে পুনর্নির্মাণ করেছেন নতুন প্রেক্ষাপটে। বাংলাদেশের কবিতার ধারায় কবি রোপণ করলেন এক ভিনদেশী বৃক্ষকে, যার শাখা-প্রশাখা, পত্র-পল্লবে তিনি মুদ্রিত করে দিলেন একটি নাম—স্বাধীনতা। বাঙালি জাতির রক্তাক্ত ইতিহাসে সাক্ষ্যবাহী কবির সে কল্পতরু তাঁরই অমূল্য স্মারকচিহ্নরূপে বাংলা কবিতায় কালজয়ীরূপে স্বীকৃত।

টীকাঃ

১. There is one attitude toward Mr. Cumming's language which has deceived those who hold it. The typographical peculiarities of his verse have caught and irritated public attention. Excessive hyphenation of single words, the use of lower case ''i'', the breaking of lines, the insertion of punctuation between the letters of a word, and so on, will have a possible critical importance of the textual scholarship of the future; (R.P Blackmur, 1957: 290-291)

২. One word is often repeated twice in two successive lines. This word usually occupies corresponding places in the two lines ─ especially in the beginning of these two lines; and thus it does not only link the two lines; and thus it also brings about some effects of Parallelism. (Emile,1910: 6)

৩. Anaphora [a-naf-ô-râ], a rhetorical *FIGURE* of repeatition in which the same word or phrase is repeated in (and usually at the beginning of) successive lines, clauses, or sentences…These lines by Emily Dickinson illustrate the device :
Mine ─ by the Right of the White Election!
Mine─ by the Royal seal!
Mine─ by the Sign in the Scarlet prison
Bars─ cannot conceal!
(Baldick, 2001: 11)
নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতাটিতে ''আমি'' সর্বনামের পুনরাবৃত্তি 'anaphora' অলংকার প্রয়োগের সার্থক দৃষ্টান্ত।

৪. antistrophe, … In RETHORIC, antistrophe is also the name given to two rhetorical *FIGURES* of repetition : In the first, the order of terms in one clause is reversed in the next [''All for one, and one for all''] (Baldic, 2001: 14)

৫. Epistrophe : The rhetorical figure of the repeatition of the same word at the end of successive clause or sentences :' we are born to sorrow, pass our time in sorrow, end our days in sorrow' (Percival, 1900 : 65)

তথ্যপঞ্জিঃ

অমলেন্দু বসু (জানু-মার্চ ১৯৯১) ''শামসুর রাহমানের কবিতা'', *মীজানুর রহমানের ত্রৈমাসিক পত্রিকা* [সম্পা. মীজানুর রহমান] ষষ্ঠ বর্ষ ৩য় সংখ্যা, উবিনীগ, ঢাকা, পৃ. (২৪০-২৬১)

আশরাফ হোসেন, খোন্দকার (২০০৫) *বিশ্ব কবিতার সোনালি শস্য*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা

জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী (২০০৬) ''শামসুর রাহমান: তাঁর কবিতা'', *নির্জনতা থেকে জনারণ্যে*, [সম্পা. ভূঁইয়া ইকবাল ও রেজাউল কবির সুমন] মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা পৃ. (৩৮-৫৪)

লেনিন আজাদ (১৯৯৭), *উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান : রাষ্ট্র, সমাজ ও রাজনীতি*, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা

শামসুর রাহমান (জানু-মার্চ ১৯৯১) ''শামসুর রাহমানের মুখোমুখি'' [সাক্ষাৎকার. হুমায়ুন আজাদ] *মীজানুর রহমানের ত্রৈমাসিক পত্রিকা* [সম্পা. মীজানুর রহমান] ষষ্ঠ বর্ষ ৩য় সংখ্যা, উবীনিগ, ঢাকা পৃ. (১০৬-১৩৪)

শামসুর রাহমান (২০০৭) *কালের ধুলোয় লেখা* , অন্যপ্রকাশ, ঢাকা

সৈয়দ শামসুল হক (২০১০)''আমাদের মহান সতীর্থ শামসুর রাহমান'', *শামসুর রাহমান স্মারক গ্রন্থ* [সম্পা. শামসুজ্জামান খান ও আমিনুর রহমান] বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. (৯-১৮)

সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ (১৯৬০) *গ্রীক পুরাণ কথা*, তুলি-কলম, কলকাতা

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯৯৫) *সুধীন্দ্রনাথ দত্তের প্রবন্ধসংগ্রহ*, কলকাতা

Henri Adrian, McGough Roger, Patten Brian (1975), *The Mersey Sound (Penguin Modern Poets-10)*, Penguin Books Ltd, Great Britain

Baldick, Chris (2001) *The Concise Oxford Dictionary of Literary Terms*, Oxford University Press, U.K

Lauvriere Emile (1910), *Repeatition and Parallelism in Tennyson*, Oxford University Press, London

Vivian Percival (1900) *A Dictionary of Literary Terms*, Routledge, London

Alphonso Smith (1894), *Repeatition and Parallelism in English Verse*, University Publishing Company, New York

Burkhardt Armin & Nerlich Brigitte [ed.] (2010), *Tropical Truths*, Gruyter Gmblt & co, New York

দ্বিতীয় অধ্যায়, তৃতীয় পরিচ্ছেদ
স্বপ্ন-কল্পমালা ও পরাবাস্তবতা: চেতন-অবচেতনের রূপায়ণ

সত্তরের দশকের মাঝামাঝি থেকে আশির দশকের মধ্যভাগ পর্যন্ত সময়ে রচিত কাব্যগুলোতে শামসুর রাহমানের নান্দনিক চেতনার মূল স্বভাব হলো ব্যষ্টিচেতনা থেকে অন্তর্ময়তায় প্রস্থান, শব্দ-ভাষার প্রত্যক্ষ জগৎ ছেড়ে বিমূর্তলোকে নির্বাসন এবং নিজ বাসভূমের সংকট থেকে আবারো অস্তিত্বের গহিন অন্ধকারে নিমজ্জন। মুক্তিযুদ্ধোত্তর প্রেক্ষাপটে স্বপ্নভঙ্গের বেদনা ও হতাশা, রাজনৈতিক অস্থিরতা, স্বৈর-শাসনের শৃঙ্খল, সামাজিক অবক্ষয়, শ্রেণীবৈষম্য কবিকে সমকাল-বিমুখ করে তোলে এবং ক্রমশ প্রবিষ্ট করে স্মৃতি, স্বপ্ন, ইতিহাস, ঐতিহ্যমণ্ডিত এক পরাজগতে। উদ্ভট উটের পিঠে আরূঢ় স্বদেশের মুখে কবি ধ্বনিত হতে শোনেন—'মুক্তিযুদ্ধ হায়, বৃথা যায়, বৃথা যায়, বৃথা যায়'—দুঃখিনী বাংলার মুখ শীর্ণতর হয়। এ পর্যায়ে বহির্জগতের নানা অভিজ্ঞতায় পরিণত কবি আবারো স্বপ্নাহত হয়ে বস্তুবিশ্বের বিপরীতে গড়ে তোলেন তাঁর নতুন কল্প-বিশ্ব। যুদ্ধের বাস্তবতায় যুযুৎসা, সংকট, স্বপ্ন, বিজয় অতিক্রম করে এলুয়ার্দ-আরাগোঁর মতই কবিও মগ্ন হন বাস্তব-পরাবাস্তবে মেশা নতুন ভুবনে। প্রথম পর্বে পুরনো ঢাকার অলি-গলিকে ঘিরে যে প্রাণবন্ত প্রদক্ষিণ চলতো কবির সত্তা জুড়ে, মুক্তিযুদ্ধোত্তর আধাসামন্ত-আধাবুর্জোয়া নতুন ঢাকার জটিল চরিত্র সেই রহস্যময়তার পর্দাকে ছিন্ন করে দেয়। আস্তাবল, বেতো ঘোড়া, সহিস—সব যেন ভোজবাজির মত মিলিয়ে যায়—থেমে যায় যুদ্ধের ডামাডোল, রণরক্ত সফলতা। কিন্তু, স্বাধীন দেশে শুরু হয় এক নতুন নাগরিক নাটক, যেখানে কুশীলবগণ হয়ে ওঠে বহুরূপী। হত্যা, রক্তপাত, গোলাগুলি রূপক-প্রতীকে ঢাকা কোনো অপ্রত্যক্ষ সত্যরূপে চাপা থাকে না আর বরং ভীষণ বাস্তবতায় হয়ে ওঠে অরুন্তুদ ('নাটক', *আদিগন্ত নগ্ন পদধ্বনি*)। আয়োনেস্কোর 'গণ্ডার' নাটকের মত কবির মনে হয় চারিদিক ক্রমশ চেতনাহীন গণ্ডার-পরিকীর্ণ ('গণ্ডার- গণ্ডার', *আদিগন্ত নগ্ন পদধ্বনি*)। দেশচেতনার সমগ্রতা থেকে কবি আবারো নিঃসঙ্গতায় প্রত্যাবর্তন করেন। 'উন্মত্ততা' বয়স্য হয় কবির আর সেই সূত্রেই সমকাল-স্বপ্নাহত কবি এ পর্বে স্মৃতি, স্বপ্ন ও পরাজগত পরিক্রমণেই স্বচ্ছন্দ হন । 'এলুয়ার এবং আরাগঁ'র যুগলবন্দী'তে কান পাতেন কবি এবার ('কবিতার সঙ্গে গেরস্থালি', *কবিতার সঙ্গে গেরস্থালি*)। আঁদ্রে ব্রেতো'র (১৮৯৬-১৯৬৬) 'অলৌকিক মেনিফেস্টোর ডানায় ভর করে' কবিতা 'কল্পনালতা'কে তিনি ডাকেন স্বপ্নাহত জ্যোৎস্নায়, 'শবাকীর্ণ স্টেজে', উন্মাদিনী 'ওফেলিয়া'র বেশে। পরাবাস্তবতার আশ্রয়ে কবি অর্গলমুক্ত করেন তাঁর অবচেতনাকে—

রঙিন কুপন
হাতে নিয়ে টপলেস পরীরা আঁধারে পরিচারিকার মতো
ব্যস্ততায় সঞ্চারিণী; মেঝে ফুঁড়ে ভৌতিক আলোয় উঠে আসে

অবিরত
অপরূপ শব আর শুয়োরের মুণ্ড। পিরিচে যুগল স্তন, যাত্রী
সবুজের দিকে ক্রমাগত। বইয়ের কবরে কে ঘুমায় ? রাত্রি
চোলিতে নক্ষত্র গেঁথে চন্দ্রমাকে আনে বুদোয়ারে
নিরিবিলি প্লুত দৃষ্টি হেনে; অতিশয় মৌন হাড়ে
জ্যোৎস্না বোনে অন্তহীন কিংবদন্তি। এই তো প্রফুল্ল জোনাকিরা
গুল্মলতায় খেলে লুকোচুরি বনময় কী আদিম ক্রীড়া।

হে প্রিয় কল্পনালতা এসো তুমি উন্মাদিনী ওফেলিয়া সেজে
আমার এলসিনোরে, হে দয়িতা, পাখাবতী, শবাকীর্ণ স্টেজে।
('হে প্রিয় কল্পনালতা', *আদিগন্ত নগ্ন পদধ্বনি*)

প্রকৃতপক্ষে, পরাবাস্তবতা তার অমিশ্র বৈশিষ্ট্যে কখনোই প্রকট হয়ে ওঠে না রাহমানের কবিতায়, বরং তা মৌল স্বভাবে মিশে থাকে কবিতার সত্তায়। শামসুর রাহমান পরাবাস্তববাদী কবি নন, কিন্তু বিভিন্ন পর্যায়ের কবিতায় স্বপ্ন, বাস্তব ও তন্ময়তার সাথে বিভিন্ন অনুপাতে পরাবাস্তবতার সংশ্লেষণ ঘটিয়েছেন তিনি। মুক্তিযুদ্ধোত্তর কালে ১৯৭৪ থেকে ১৯৮৪ কাল পর্বে রচিত *আদিগন্ত নগ্ন পদধ্বনি* (১৯৭৪), *এক ধরনের অহংকার* (১৯৭৬), *আমি অনাহারী* (১৯৭৬), *শূন্যতায় তুমি শোকসভা* (১৯৭৭), *বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে* (১৯৭৭), *প্রতিদিন ঘরহীন ঘরে* (১৯৭৮), *ইকারুসের আকাশ*(১৯৮২), *মাতাল ঋত্বিক* (১৯৮২), *উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ* (১৯৮২), *এক ফোঁটা কেমন অনল* (১৯৮৩), *কবিতার সঙ্গে গেরস্থালি* (১৯৮৩)—কাব্যগুলোতে বিস্তৃতভাবে লক্ষ করা যায় কবির পরাবাস্তব প্রতীতি। যুদ্ধোত্তর দৈশিক অরাজকতাই কবিকে দুঃস্বপ্নের অনুবর্তী করে তোলে। *এক ধরনের অহংকার*, *বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে* কাব্যে কখনো কখনো কবি দেশকে নিয়ে স্বপ্নবান হতে চেয়েছেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেশজুড়ে কালোবাজারি, বুভুক্ষা, বৈষম্য, প্রতিযোগিতা, ছদ্মবেশ, রাজনৈতিক অস্থিরতায় অগত্যা দুঃস্বপ্নই শরণ হয়েছে কবির। লক্ষণীয় যে, ১৯৭৪ থেকে ১৯৮৪ কালপর্বে শামসুর রাহমানের কবিতার প্রবণতাকে সর্বতোভাবে বলা যাবে না পরাবাস্তব লক্ষণাক্রান্ত। কারণ, *আদিগন্ত নগ্ন পদধ্বনি* থেকে *প্রতিদিন ঘরহীন ঘরে* পর্যন্ত কাব্যগুলো মূলত কবির এ পর্বের কাব্য রচনার উপক্রমণিকা। অর্থাৎ, যুদ্ধোত্তর কালে, নতুন দেশে, নতুন পরিপ্রেক্ষিত ও সময়ে কবির অভিজ্ঞতা, প্রত্যক্ষণ ও অঙ্গীকারকে মিলিয়ে নেয়ার একটা প্রচেষ্টার কাল। কবি কোনো জটিল সিদ্ধান্তের দ্বারপ্রান্তে ভ্রাম্যমান যেন। বাস্তব জগৎকে কবিতায় গ্রহণ করবেন, না কি অন্য কোথাও আশ্রয় নেবেন—অন্য কোথাও হলে সেটা কি অন্তর্লোক না কি বহির্লোক—শব্দ-ভাষার প্রত্যক্ষতা নাকি বিমূর্ততায় ব্রতী হবেন—এইরূপ নানা আত্মজিজ্ঞাসার মধ্য দিয়ে মূলত কবি আত্মস্থ হতে চান নতুন প্রকরণে। যেন লেখনীকে উদ্দেশ্যহীন পথে ছেড়ে দিয়ে যথাযথ গন্তব্য অনুসন্ধান করছেন কবি।

হুমায়ুন আজাদ কবির কাব্য রচনার এই পর্যায়কে সঙ্গত কারণেই বলেছেন 'আত্মপ্রদক্ষিণের কালো সময়' (হুমায়ুন, ২০০৪: ১০৭)। মূলত, এই সময়টি কবির নতুন নান্দনিকতা অন্বেষণের কাল। কবি এভাবেই নিজের কবিতার পর্বান্তর সাধন করেন। *ইকারুসের আকাশ* থেকেই কবি নতুন শিল্প-প্রত্যয়ে স্থির হন। তবে, *আদিগন্ত নগ্ন পদধ্বনি* থেকেই জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে কবি মাঝে-মাঝে অন্তর্চারী এবং ক্রমশ তাঁর সত্তা , হয়ত তাঁর অজ্ঞাতেই প্রোথিত হতে থাকে চৈতন্যের অতলে, স্বপ্নে, দুঃস্বপ্নে, এলোমেলো স্মৃতিলোকে, কালগ্রন্থিহীন ইতিহাস ও সময়বিবরে। এভাবেই ক্রমে-ক্রমে কবি পরাজগত বিচরণে পারঙ্গম হয়ে ওঠেন এবং *ইকারুসের আকাশ* থেকে তা কবির কবিতার প্রধান লক্ষণরূপে প্রতীয়মান হয়। তখন 'চৈতন্যের অত্যন্ত গহনে অক্লান্ত সাঁতারু তিনি, নিজেই নিজের অন্তর্যামী'।

দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে ১৯২০ থেকে ১৯৩৯ পর্যন্ত ইউরোপজুড়ে জনপ্রিয় পরাবাস্তবতাবাদী আন্দোলনের পুরোধা আঁদ্রে ব্রেতোঁ (১৮৯৬-১৯৬৬) এবং এই ধারার কবি এলুয়ার্দ (১৮৯৫- ১৯৫২) ও আরাগঁ (১৮৯৭-১৯৮২) প্রভাবিত ছিলেন সিগমুন্ড ফ্রয়েডের (১৮৫৬-১৯৩৯) মনঃসমীক্ষণমূলক তত্ত্বসমূহে এবং কার্ল মার্কসের দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী তত্ত্বে। ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষণ তত্ত্ব ও স্বপ্ন-ব্যাখ্যাকে অবলম্বন করে মানুষের স্বপ্ন-দেশ ও মনোজগতের গহীন সঞ্চরণকে তাঁরা কবিতায়, কথাসাহিত্যে চিত্রিত করেন। তাঁরা কবিতায় আমদানী করেন আশ্চর্যজনক, বিস্ময়কর সব চিত্রকল্প, স্বপ্নকল্পচিত্র (dream imagery), অতিবাস্তব চিত্রকল্প, গূঢ় প্রতীক, চিত্রকলার কলাকৌশল। সে সময়ে অবচেতনার উন্মত্ততাকে পরাবাস্তব চিত্ররূপ দিয়েছিলেন পিকাসো (১৮৮১-১৯৭৩), সালভাদর দালি (১৯০৪-১৯৮৯) প্রমুখ চিত্রশিল্পী। জাঁ ককতোঁ (১৮৮৯-১৯৬৩) মঞ্চ ও দর্শককে অবলম্বন করেছিলেন তাঁর উৎপীড়িত অন্তর্জগতের উন্মীলনে। পরাবাস্তবতাবাদের মূল কথা ছিল স্বয়ংক্রিয় লেখনীর মাধ্যমে শিল্পীর অবচেতন প্রবাহের প্রকাশ-স্বাধীনতা। আঁদ্রে ব্রেতোঁ তাঁর প্রথম ইশ্‌তেহারেই মনস্তাত্ত্বিক স্বয়ংক্রিয়তা বা '*Psychic Automatism*' বলতে এই বৈশিষ্ট্যটিকেই নির্দেশ করেছিলেন—

> Phychic automatism in it's pure state, by which one proposes to express—verbally by means of the written word, or in any manner—the actual functioning of thought. Dictated by thought, in the absence of any control exercised by reason, exempt from any aesthetic or moral concern. (Breton, 1969: 26)

সুতরাং, মনস্তাত্ত্বিক স্বয়ংক্রিয়তা বা স্বতঃস্ফূর্ত লেখনী হলো যৌক্তিক মনের অনুশাসন ছাড়াই কবির অবচেতন-মনের অনর্গল ভাবনা-চিন্তার দ্বিধাহীন প্রকাশ। কোনো রাখ-ঢাক বা পুনর্লিখন ছাড়াই কবি

স্বগতকথনের মত উচ্চারণ করে যান তাঁর মনের গোপন তলের ভাব-ভাবান্তর—জেমস জয়েস-এর *inner monologue* এর মত। সেই আত্মকথন কবিতায় বিন্যস্ত হয়ও ঠিক স্বপ্নের মতই পারম্পর্যবিঘ্নিত বা ঔচিত্যরহিত হয়ে। পার্বত্য নির্ঝরিণী যেমন উপর থেকে নিচে নেমে নিঃসঙ্গভাবে প্রবাহিত হয়, কেউ তার গতিধারার দিক নির্দেশ করতে পারে না, স্রোতকে পরিশোধন করতে পারে না, তেমনি স্বতঃস্ফূর্ত, বিশুদ্ধ, গহীনসঞ্চারী এই 'অটোমেটিক রাইটিং'য়ের ধরন। কবির জাগ্রত-অর্ধজাগ্রত চেতনা ও স্বপ্নের অনির্দেশ্য গতিধারা এই বিশেষ লেখনী। পরাবাস্তব কবিতায় সামাজিক জীবনচিত্রের উপর আধিপত্য করে কবির মনের গভীর-অগভীর পরালোক। পরাবাস্তবতা মানব মনের এই স্বাধীন কল্পনাত্মক প্রক্রিয়ার স্বীকৃত শিল্পভূমি—যুক্তি ও পারম্পর্যকে অস্বীকার করে অবচেতনলোকের মুক্তি ঘটিয়ে বাস্তবাতীত সত্যকে উদ্ঘাটনের রহস্যময় শিল্পজিজ্ঞাসা। সেখানে বিচিত্র, উদ্ভট, ভুতুড়ে বিষয়, স্বপ্ন বা স্বপ্নসদৃশ অনুষঙ্গ শিল্পের বিষয় হয়। কারণ, পরাবাস্তবতাবাদী শিল্পীরা ফ্রয়েড কথিত সেই মনোপ্রদেশের অবমুক্তিতে আগ্রহী ছিলেন, যেখানে মানুষের সমস্ত অভীপ্সা-জুগুপ্সা-গূঢ়ৈষা দ্বান্দ্বিকসূত্রে সমন্বিত থাকে। ব্রেতোঁ'র ভাষায়—

> Everything tends to make us believe that there exists a certain point of the mind at which life and death, the real and the imagined, past and the future, the communicable and incommunicable, high and low cease to be perceived as contradictions''. (Breton,1969: 123)

পরাবাস্তব কবিরা অতিবাস্তব দৃশ্য বা চিত্রকল্পে তাঁদের স্বপ্ন, দুঃস্বপ্ন, কামনা ও কল্পনার স্বতঃস্ফূর্ত উৎসারণে আগ্রহী ছিলেন। *প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে* কাব্যে 'সেই ঘোড়া'টা কবিতায় শামসুর রাহমানের পরাবাস্তব নিরীক্ষার প্রথম উন্মেষ ঘটেছিল। কিন্তু, বিদেশী কবিতা পঠন-পাঠনসূত্রে, বিশেষত, পরাবাস্তব আন্দোলনের নানা পর্যায়ের কবিতার সাথে সংযোগসূত্রে কবি উত্তরকালে আরো স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে ওঠেন চেতন-অবচেতনের জটিল খেলায়। তখন একটি বা দু'টি চিত্রকল্পে নয়, বরং ঘন-ঘন কবিতায় উঠে আসে স্বপ্ন ও বাস্তবের নানা তরঙ্গভঙ্গ—জটিল, দ্বান্দ্বিক, বিমূর্ত সব চিত্রকল্পে । অবচেতন মনের নানা গূঢ়ৈষা কবিতায় উঠে আসে ভাঙা-ভাঙা চিত্রে, দৃশ্যময়তায়, যা বাস্তবতার বিকৃতি ঘটিয়ে এক নতুন বাস্তবতার মুখোমখি করে তোলে পাঠককে। শব্দ-ভাষার উল্লম্ফনে কবি সেই বাস্তবাধিক নতুন বাস্তবতার ছবি এঁকে যান কবি স্বাধীনভাবে। শামসুর রাহমানের এই পর্যায়ের কবিতার নানা বৈশিষ্ট্যের মধ্যে স্মৃতি-স্বপ্ন-পরাবাস্তবতার এই লক্ষণটিই প্রধান। হুমায়ুন আজাদ এ পর্যায়ের কাব্যলক্ষণকে চিহ্নিত করেছেন 'বাস্তব ও পরাবাস্তবের সঙ্গম' শিরোনামে (হুমায়ুন, ২০০৪: ১১২)। মূলত, পরাবাস্তবতা স্বপ্নাদ্য, মনঃসমীক্ষণ ও অন্তর্বাস্তবতার রূপকল্প হলেও বাস্তববর্জিত

কোনো স্বপ্নদেশ পরিভ্রমণ নয়। অবচেতনের ভাষ্য মাত্রেই পরাবাস্তবতা নয়, বরং তা চেতন-অবচেতন জগতের মধ্যে শিল্পিত এক সেতুবন্ধ।

ত্রিশোত্তর আধুনিক কবিদের মধ্যে জীবনানন্দ দাশ ও বিষ্ণু দে তাঁদের কবিতায় পরাবাস্তবাদী কবিদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন এবং পরাবাস্তবতাকে আত্তীকৃত করেছিলেন নিজস্ব 'স্টাইলে'। বিষ্ণু দে প্রভাবিত হয়েছিলেন লুই আরাগেঁর মার্কসবাদী মতাদর্শ ও নন্দনচিন্তা দ্বারা। পরাবাস্তববাদী আন্দোলনের প্রথম ভাগে আরাগঁ ছিলেন আঁদ্রে ব্রেতোঁর ঘনিষ্ঠ সহযাত্রী। কিন্তু মতাদর্শগত বিরোধে আরাগঁ পরাবাস্তব আন্দোলন থেকে বিচ্যুত হন। মূলত, মতাদর্শের সাথে শিল্পের অভিমানী, রক্তাক্ত বিরোধের সে এক কাল বটে। দুই বিশ্বযুদ্ধের মাঝখানে শতাব্দীর কালবেলায় দাঁড়িয়ে শিল্প বড়, নাকি জীবন বড়, তা বেছে নেয়ার এক পরীক্ষা ছিলো শিল্পীদের জন্য। অধিকাংশ শিল্পীই বিশ্বব্যাপী নাৎসী শোষণে বিদ্রোহী হন। মার্কসবাদে বিশ্বাস স্থাপন করে তাঁরাও প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠেন মতাদর্শগত শিল্পযুদ্ধে। কিন্তু, এও সত্য যে, বিশ্বযুদ্ধের বাস্তবতায় জীবনের সামূহিক অপচয়, অবক্ষয়, হতাশা, মূল্যবোধচ্যুতি মানুষের অন্তর্জগতেও তুমুল অভিঘাত হানে। সেসব নগ্নভাবে প্রকাশ করতে শিল্পীর প্রয়োজন হয় অন্তর্বাস্তবতার উৎসারণ—কোনো নির্দিষ্ট মতাদর্শে সীমাবদ্ধ থেকে তার প্রয়োগ ছিল কঠিন। ব্রেতোঁ আর আরাগেঁর পথ সেখানেই দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়। বিষ্ণু দে'র কবিতার প্রথম পর্ব আর শেষ পর্বও শিল্প আর বিশ্বাসের দ্বন্দ্বে সমান্তর থাকে না আর। ডাডাবাদের সংশয় ও দ্রোহের আগুন স্পর্শ করে পরাবাস্তবতাবাদী আন্দোলনকে এবং সেই সূত্রে অন্তর্বাস্তবতা প্রকাশের দাবী সোচ্চার হয়ে ওঠে সব শিল্পে। সুতরাং, শিল্পীদের মধ্যে বিভক্তিও অনিবার্য হয়ে পড়ে। বাংলাদেশের কবি শামসুর রাহমান, যিনি ঊনসত্তরের গণ আন্দোলনে, সত্তরের দশকে স্বাধীনতা যুদ্ধে দেশের প্রতি আত্মিক দায়বদ্ধতায় প্রবল সক্রিয় ছিলেন তাঁর কবিতায় দেশচেতনার গানে, তিনি আশির দশকে অন্তর্লীন হন পরাবাস্তবতায়। এটিও ওই বৈশ্বিক বাস্তবতারই অনুসংস্করণ। বহির্বাস্তবের ক্ষমাহীন বৈরিতার প্রতিশোধ ও আত্মরক্ষার প্রয়োজনেই শামসুর রাহমান এ পর্যায়ে বহির্বাস্তব বিমুখ ও দুঃস্বপ্ন-বিলাসী। মূলত, বহির্বাস্তবতার প্রতিক্রিয়াকে কবি আরো বেশি নগ্ন ও প্রকটরূপে প্রকাশ করেন পরাবাস্তবতার আধারে। সংগতভাবেই বহির্বাস্তবতা থেকে অন্তর্বাস্তবতায় প্রস্থানের কৈফিয়ত দিতে গিয়ে কবি তাই বিপ্লবী, সাম্যবাদী কবি আরাগেঁর উদ্দেশ্যে নিরাশা আর অভিমান নিয়ে পত্র লেখেন—

আরাগঁ তোমার মতো আমিও একদা
শত্রু পরিবৃত শহরের হৃদয়ে স্পন্দিত হয়ে
লিখেছি কবিতা রুদ্ধশ্বাস ঘরে মৃত্যুর ছায়ায়
আর স্বাধীনতার রক্তাক্ত পথে দিয়েছি বিছিয়ে কত রক্তিম গোলাপ।

আরাগঁ তোমার কাছে লিখছি সে দেশ থেকে,
...
যেখানে শহুরে লোক, গ্রাম্যজন অনেকেই শাদাসিধে
প্রায় বেচারাই বলা যায় ; আমাদের হালচাল
সাধারণ, চাল-চুলো অনেকের নেই।
আমাদের মাস ফুরোবার অনেক আগেই হাঁড়ি
মড়ার খুলির মতো ফাঁকা হয়ে যায়, দীর্ঘ দুরন্ত বর্ষায়
গর্তময় জুতো-পায়ে পথ চলি, অনেকের জুতো নেই।
...
আরাগঁ তবুও জ্বলে গ্রীষ্মে কি শীতে
আমাদের স্বপ্ন জ্বলে খনি-শ্রমিকের দীপ্র ল্যাম্পের মতোই।
('আরাগঁ তোমার কাছে', *ইকারুসের আকাশ*)

শামসুর রাহমান স্বাধীনতা-উত্তর এই পর্বে তাঁর চির পরিচিত নগর ঢাকাকে হারিয়ে ফেলেন—নতুন ঢাকায় নিজেকে তাঁর আবারো মনে হয় এক আগন্তুক। *রৌদ্র করোটিতে*তে কবি মিশে গিয়েছিলেন নগর ঢাকার জনস্রোতে। ৭১' পর্বে অবরুদ্ধ স্বদেশের ভিতে সবার মত তিনিও ছিলেন স্বাধীনতার স্বপ্নকাতর এক নাগরিক। কিন্তু, স্বাধীনতা-উত্তর ঢাকার পথে-ঘাটে অনাহারীদের বিক্ষিপ্ত মিছিল, শ্রেণীবৈষম্য, কালোবাজারি, লুটেরাদের হল্লাসহ নব্যবাস্তবের নানা অভিঘাত কবিকে হতাশায়, ঘৃণায়, যন্ত্রণায়, অভিমানে করে তোলে বিবরবাসী, নিভৃত, অন্তর্চারী। তিনি কল্পনায় বা অবচেতনায় বস্তুজগতের রূপান্তরিত সত্যগুলোকে প্রত্যক্ষণ করেন এবং নানা পরাবাস্তব, অতিবাস্তব ও সম্প্রকাশধর্মী চিত্রকল্পের মধ্য দিয়ে সেই রুদ্ধ চেতনার বিনির্মাণ ঘটান। সমকালের স্বপ্নভঙ্গ কবির ভাবনাকে কেমনভাবে পরাবাস্তবপ্রবণ করে তোলে তা *উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ* কাব্যের রচনাসূত্র অনুসরণ করলেই বোঝা যায়। ঢাকার রাস্তায় উটের বহর আর ধর্মোন্মাদ এক দল মানুষের উটের মূত্র-পানের দৃশ্যদেখে হতবাক্ কবির চেতনা থেকে জন্ম নেয় 'উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ' পঙ্‌ক্তিটি (শামসুর, ২০০৪: ভূমিকা)। একটি বাস্তব ঘটনা এভাবেই কবির ভাবনায় পরাবাস্তবতায় রূপান্তরিত হয়। একইভাবে, কবির কল্পনায় স্বয়ং যিশু উচ্ছিষ্ট সন্ধানে আস্তাকুঁড়ে ভ্রাম্যমাণ, মেরি মা স্বেচ্ছায় দেহপোজীবিনী, রবিঠাকুর কালোবাজারির দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে, উপোস-কাতর নজরুল থালা হাতে দূরে দাঁড়িয়ে থাকেন অলৌকিক ভোজের আশায়। কবির কল্পনায় রজনীগন্ধার বন বিদীর্ণ করে বেরিয়ে আসে ভীষণ বুভুক্ষু সব মানুষের শীর্ণ, কঙ্কাল হাতগুলো—

রজনীগন্ধার বন ফুঁড়ে বেরোয় কেবলি শীর্ণ, প্রসারিত
হাত, অগণিত রিক্ত, মূক ও বধির।

হঠাৎ দুপুরে সন্ধ্যা, মানুষের ত্রাতা তাঁর পেরেক-চিহ্নিত
রক্তাপ্লুত হাতে খুঁজছেন খাদ্যকণা বারবার
কুকুর-শাসিত ডাস্টবিনে, তিনটি মলিন হ্রস্ব

নোটের বদলে মেরিমাতা নির্দ্বিধায়
রাত্তিরে হচ্ছেন ম্লান, হাতে উল্কি আঁকা, একচক্ষু
নাবিকের আস্তানায় এবং রবীন্দ্রনাথ কালোবাজারির
দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে ব্যাকুল
ভিক্ষা চাইছেন এঁটো কাঁটা মাথা নত করে আর
তিন দিন তিন রাত্রি উপোসের পরে ফুটপাতে
এক ভিড় লাশের পাশেই ভাঙা উজাড় থালায়
দেখছেন অলৌকিক ভোজ নজরুল ইসলাম!
('এখন আমার শব্দাবলি', *আমি অনাহারী*)

কবির চেতনার এই সম্প্রকাশ স্বভাব, দৃশ্য ও শ্রুতির নানা বিভ্রান্তি ও ত্রাস চেতন জগৎ থেকে তাঁকে বারবার আবর্তিত করে অতিচেতনের নানা অলিন্দে। ক্রমশ কবির অবচেতন-ভ্রমণ নৈমিত্তক বাস্তবতায় পরিণত হতে থাকে। সেই সূত্রে কবির কবিতার নান্দনিকতাও বিবর্তিত হতে থাকে পরাবাস্তবতার গহন পথে। *শূন্যতায় তুমি শোকসভা* কাব্যগ্রন্থের 'পারিপার্শ্বিকের আড়ালে' কবিতায় লক্ষ করা যায়, মধ্যরাতের ঢাকা তার অন্তর্বাস খুলে গণিকার মত অচেনা হয়ে যায় কবির কাছে। অন্ধকারের আচ্ছন্নতায় কবির চোখে ঢাকাকে মনে হয় এক নতুন পরা-শহর। কবি দেখতে পান উঁচু ঘাসে ছেয়ে যায় সাইনবোর্ডের বর্ণমালাগুলো, অতিকায় এক টেলিফোন নেমে আসে জনহীন রাস্তায় আর একজন পরী 'হ্যালো হ্যালো' বলে ডায়াল করতে থাকে অবিরাম। সে রাতে সেই স্বপ্নাচ্ছন্নতায়, কবির অবচেতনায় ঢাকার রাজপথ পরিণত হয় 'ঝলসিত সরোবরে', যেখানে স্পর্শাতীত জ্যোৎস্নারা ভেসে বেড়ায় হাঁসের মত। কবির মনে হয়, কবেকার দাঙ্গায় খোয়া-যাওয়া একটি চোখ নিয়ে এক বামন চার্চের চূড়ায় বসে চুরুট ফোঁকে—মনে হয় মধ্যরাতে বুড়িগঙ্গার বুকে অলৌকিক এক 'জলজ প্রাসাদ' জাগে, রেডক্রস চিহ্নিত বাড়ির ছাদে 'ফেরেশতামণ্ডলীর অলীক কনফারেন্স' চলে, অ্যাম্বুলেন্সে নাচে কোনো 'স্বর্গীয় মদ্যপ' আর টহলদার পুলিশ পরিণত হয় স্বর্গলোকের অর্ফিয়ুসে। কবি এই যে পারিপার্শ্বিকের আড়ালে নতুন দৃশ্যাতীত এক পরাবাস্তব পরিপার্শ্ব গড়ে নিলেন, এ পর্বে তাই তাঁকে 'সুর্‌রিয়ালিজমে'র পথে আবর্তিত করে। সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের মন্তব্যে—

> অতিকায় টেলিফোন যে মুহূর্তে নামলো রাস্তায়, আমরা যারা শামসুর রাহমানের পরাবাস্তবতার সঙ্গে পরিচিত, তারা ঐ পুরাতন দৃশ্যকল্পের দেখা পেয়ে যাই। আমরা অবশ্য জানি, এই পরাবাস্তবতা তাঁকে দেশকালের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে নিয়ে যাবে—মার্ক শাগালের সেই ভয়ানক পরাবাস্তব চিত্রকলাসমূহের মতো, যেখানে জন্তু, অট্টালিকা সবই ঊর্ধ্বগামী। শামসুর রাহমানের ঢাকা এইভাবে পরিবর্তিত হয়, অপ্রাকৃত হয়ে দাঁড়ায়, উন্নিদ্র মধ্য-যামিনীতে দৃশ্যপট আমূল বদলে যায়। তখন যে-চিন্তা জাগ্রত থাকে, তা থাকে পরাবাস্তবের অন্তঃস্থিত নান্দনিকতায় আচ্ছন্ন। (মনজুরুল, ২০০৬: ১৮২)

এমনি বিভ্রমে কবির লেখার টেবিলে চলে একের পর এক ইন্দ্রজাল—দৃশ্য-পরম্পরায় কখনো হঠাৎ জেগে ওঠে জলময় মায়াবী লেগুন, কখনো তিনি শুনতে পান জেব্রার পাল কিংবা গণ্ডার দলের উদ্দাম

ক্ষুরধ্বনি—বইয়ের আড়াল থেকে উঁকি দেয় কৌতূহলী জিরাফ, নির্ভয়ে পাশাপাশি শুয়ে থাকে সিংহ আর মেষ। প্রত্যক্ষের অতীত কোনো দুর্গম জগতের অদ্ভূত সব জীব তাদের সমস্ত শব্দ-ধ্বনি নিয়ে হঠাৎ আবির্ভূত হয়, আবার নিমেষে উধাও হয় দূরে কোথাও—যেন স্বপ্নের এলোমেলো ছবিগুলোর উপর দ্রুত আলোক প্রক্ষেপন চলে। ইন্দ্রিয়ের অবশতায় কবি সন্ধান পান ট্রয়ের কোনো বিবর্ণ প্রাচীর কিংবা তিনি অবলীলায় পর্যবেক্ষণ করেন পাশাপাশি বাংলার মাটিলেপা ঘর আর রাতের প্যারিসের পদ্যাক্রান্ত ক্যাফে। কবির স্বয়ংক্রিয় শব্দভাষ্যে—

মৃদু আলো-আঁধারিতে গৃহকোণে একা একা কাটে
প্রায়শ আমার বেলা। খেয়ালের বশে বাস্তবের
সঙ্গে খেলি কানামাছি—লেখার টেবিলে অকস্মাৎ
দেখে ফেলি ডোরাকাটা উদ্দাম জেব্রার দল কিংবা
গণ্ডারের একরোখা দৌড়, কখনো লেগুন নম্র
ওঠে জেগে আদিম জলের মায়া নিয়ে। স্নানার্থিনী
কটি থেকে ছেড়ে দেয় প্রাচীন বাকল, প্রেমবিদ্ধ
বংশীবাদকের সুরে পাথর, মরাল আসে ছুটে,
সিংহ আর মেষ থাকে শুয়ে পাশাপাশি, কখনো-বা
জিরাফ বাড়ায় গলা বইয়ের পাহাড় ফুঁড়ে, দেখি
বারংবার টেবিলের ইন্দ্রজাল : ট্রয়ের প্রাচীর
মশালের ঘর্মাক্ত আলোয় বড় বেশি নিঃস্ব, যেন
প্রেতপুরী ; এক কোণে বাংলার মাটিলেপা ঘর
প্রস্ফুটিত, অন্যদিকে পদ্যাক্রান্ত নিশি-পাওয়া কাফে।
('তবে মননেও', *আদিগন্ত নগ্ন পদধ্বনি*)

এভাবেই পরাবাস্তবতার সংশ্রয়ে কবির কবিতায় স্বপ্নের জায়গা জুড়ে নেয় দুঃস্বপ্ন, সুস্থতার পরিবর্তে উন্মত্ততা, আশার বিপরীতে নৈরাশ্য আর তাঁর আশৈশব দেখা মুখরিত শহর নিমেষেই রূপান্তরিত হয় কোন দগ্ধ গ্রাম কিংবা বিধ্বস্ত ভিয়েতনামে। কবির ভাষায়—

এবং টাইপ কেস তন্নতন্ন ক'রে আলো শব্দটি পাচ্ছি না খুঁজে আর
পাচ্ছি না কোথাও—
ছত্রিশ পয়েন্ট বোল্ড টাইপে অত্যন্ত দ্রুত শুধু
ভীষণ হাভাতে এক অন্ধকার বানিয়ে ফেলছি!
('অপরাধী', আদিগন্ত নগ্ন পদধ্বনি)

প্যারানয়ার রোগীর মতই কবির মনে হয় কোনো ভীষণ দানো সারাদিন তাড়া করে ফেরে তাঁকে। কারণে অকারণে নানা অলীক বীক্ষণে ভোগেন তিনি। হঠাৎ আশ্চর্য অসংলগ্ন সব দৃশ্যাবলি উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে তাঁর চোখের সামনে। পরাবাস্তব কবিতায় বস্তুর সাধারণ প্রতিকৃতির বিকৃত বা বিস্ফারিত রূপ প্রকাশ পায়। মাত্রাবোধ স্বেচ্ছায় বিঘ্নিত করেন কবি। বস্তুত, পরাবাস্তব রচনায় সামান্য পতঙ্গ বিরাটাকার মনুষ্য মূর্তি ধারণ করতে পারে কিংবা কাফ্‌কার উপন্যাসের গ্রেগর শামসা'র মত মানুষই

পতঙ্গে রূপান্তরিত হতে পারে অথবা যাজকের মুখে অনায়াসে বসে যেতে পারে গর্দভের মস্তক। সময়ের গণ্ডীকেও অনায়াসে গুড়িয়ে দিতে পারেন পরাবাস্তববাদী কবি বা শিল্পী। শামসুর রাহমান এ পর্বের কাব্যে তাঁর সেই অন্তর্গত উন্মত্ততাকেই নতুন এই শিল্পচেতনায় মুকুলিত করে চলেন। অন্তর্বাস্তবতাকে প্রকাশ করতে কবি সুররিয়লিস্ট চিত্রকরদের মত অদ্ভুত, অসংলগ্ন ছোট-ছোট চিত্র ও চিত্রকল্পের অবতারণা করেন—

প্লটিনাম চোখ নিয়ে অজস্র শেয়াল রাত্রিভর
আমার বিছানা নোংরা করে। স্বপ্নগুলো
দেয়ালে দেয়ালে ঝোলে সাটিনের পরদার মতন।
খুব হিংস্রতায়
একটি বিরাট কাঁচি সেসব পর্দার বুকে স্বেচ্ছাচারী হয়।
আফ্রিকার তিনটি মুখোশ অতি দ্রুত
কোরানের আয়াত আবৃত্তি
করতে করতে
আওড়ায় আদালতি বেবাক শপথ।

আমি কি উন্মাদ হয়ে যাচ্ছি ?
ঘরে রাশি রাশি টেলিগ্রাম
অচল নোটের মতো নির্লজ্জ ছড়ানো ইতস্তত
এবং সকল বার্তা উদ্ধার-রহিত। বিছানায় শুয়ে-শুয়ে
দেখি মস্ত ছায়ার ধারালো জিভ চাটছে আমাকে
বিশদ ক্ষুধায়।
মেড় সার মুণ্ড চতুর্ধারে নেচে ওঠে বারংবার ।
...

ঘরময় ট্রেন দুর্ঘটনা, লঞ্চডুবি, জুয়োর টেবিল ; অকস্মাৎ
আমার ডবল এসে আমাকেই পরায় লোহার হাতকড়ি,
চতুষ্পার্শে সূর্যমুখী, নতুন বাছুর, গয়লানি সাঁতরাচ্ছে,
শুধু সাঁতরাচ্ছে...
আমি কি উন্মাদ হয়ে যাচ্ছি ?
('উন্মত্ততা বয়স্য আমার', *আদিগন্ত নগ্ন পদধ্বনি*)

বস্তুত কবি তাঁর অন্তর্গত সব ডালপালা প্রকাশ্যে মেলে দেন। কবির অবচেতনের নানা বিচ্ছিন্ন অনুষঙ্গ, যেমন প্লাটিনাম চোখের শেয়াল, একটি বিরাট কাঁচি, আফ্রিকার তিনটি মুখোশ , দুর্বোধ্য টেলিগ্রামরাশি, বিভীষিকাময় মস্ত ক্ষুধার্ত ছায়া—এদের কোনোটির সাথে কোনোটির সম্পর্ক বা পরম্পর্য নেই—এদের ক্রিয়াকলাপ অযৌক্তিক, অতিরঞ্জিত কিন্তু অবিকল স্বপ্নের মত। ট্রেনদুর্ঘটনা, লঞ্চডুবি, কবির জমজ, সূর্যমুখী, নতুন বাছুর, গয়লানি এবং এদের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াসমূহ কবির অবচেতনার বিস্রস্ত ভাবনার প্রক্ষেপণ। কিন্তু, এসব অসংলগ্ন চিত্রের কিউবিক সংকলন কবির অন্তর্গত বিপন্নতাকে যেভাবে প্রকাশ করতে সক্ষম, অন্য কোনো মাধ্যমে তা সম্ভব নয়। 'কিউবিস্ট চিত্রকলার

পরাবাস্তব জ্যামিতির' মত চিত্রকল্পসহ অথবা শুধু চিত্রের সংযোজনে, কিংবা কেবল খণ্ড বাক্যে, শব্দ-ভাষায় অবচেতনার সারাৎসারকে এভাবেই শামসুর রাহমান উপস্থাপন করেন (মন্‌জুরুল, ২০০৬: ১৮৮)। চেতনার বিক্ষিপ্ততাকে সংহত অথচ স্বভাবজরূপে প্রকাশ করার জন্য, কবিতায় অবচেতনা বা স্বপ্নের নিয়ন্ত্রণকে প্রকট করে তোলার জন্য এবং স্বপ্নস্রোতের প্রবল গতিকে প্রকাশ করতে কবি ইতঃপূর্বে *রৌদ্র করোটিতে*তে এবং অন্যান্য কাব্যেও কিউবিজমকে কবিতায় প্রয়োগ করেছেন। কিন্তু, এ পর্যায়ের কবিতায় অবচেতনের দ্বন্দ্ববিক্ষুব্ধতা ও কবির ইন্দ্রিয়বৈকল্য প্রকট বলে, পরাবাস্তবতার ঘনিষ্ট ফর্ম 'কিউবিজম'—যে ধারার জনক ছিলেন কবির অন্যতম প্রিয় চিত্রশিল্পী পাবলো পিকাসো, সেই 'জ্যামিতির পরাবাস্তবতা'র যত বহুল ব্যবহার শামসুর রাহমানের এ পর্যায়ের কাব্যে ঘটেছে, তা তাঁর অন্য পর্যায়ের কবিতায় লক্ষ করা যায় না।

কবি স্বীকার করেন যে, দুরারোগ্য এক ব্যাধি আমাদের অস্থিমজ্জায় বাসা বেঁধেছে, যে রোগের লক্ষণ সামূহিক ইন্দ্রিয় বিপর্যাস—যার নিরাময়ে কোনো স্যানাটোরিয়াম নেই। আর দিনে-রাতে অসংলগ্ন হাজারো দৃশ্যাবলীর অলীক প্রত্যক্ষণের কবির সেই উন্মাদগ্রস্ততাকে কবি প্রকাশ করেন কিউবিক ক্যানভাসে, অবচেতনের দৃশ্যাবলির সংযোজনে—

> চৈতন্যের এলাকায় এ কেমন ওলট-পালট
> চলছে সর্বদা বেলা-অবেলায়—দেখি, সব বৃক্ষ ক্ষর বানে
> যাচ্ছে ভেসে শিকড়-সমেত ; পাখিগুলো মুখ থুবড়ে প'ড়ে আছে
> কাদা জলে।
> ...
> দীঘল ঘোমটা-টানা বউ-বরযাত্রী, সাপুড়ে, জুয়াড়ি আর
> ভবঘুরে ধোপা আর নব্য যুবা ইত্যাদি সমেত এক সাঁকো
> কোথায় তলিয়ে যায় অকস্মাৎ। দেবতুল্য মানুষের মুখ
> কুকুরের অবয়বে হতেছে বিলীন। বারবার অনুরূপ
> দৃশ্যাবলি ওঠে ভেসে চতুর্দিকে—এ রোগের এইতো লক্ষণ।
> ('স্যানাটোরিয়াম', *এক ধরনের অহংকার*)

উদ্ধৃতিটিতে ছোট-ছোট কিউবিক চিত্রগুলো 'সাইকেডেলিক' ধরনে বিবর্তিত হয়ে কবির অবচেতনের বিস্রস্ততাকে প্রবহমান করে তোলে। *শূন্যতায় তুমি শোকসভা* কাব্যে 'দেখার ধরন' কবিতায় কবি ব্যাখ্যা করেন তাঁর নিজস্ব নতুন এই অলৌকিক প্রত্যক্ষণ ও প্রকাশের ধরন। প্রাত্যহিকতার আচ্ছাদন হঠাৎ প্রবল বেগে বিস্ফারিত হলে যখন কবির জাগতিক অস্তিত্বের কিছু খোসা ঝরে যায়, তখন কবির দৃষ্টিপটে উদ্ভাসিত হয় প্যাঁচানো, জটিল, আশ্চর্য সব দৃশ্যাবলি—স্বপ্নের ছোট- ছোট স্লাইড যেন—আগুনের পাশে নর-নারীর যৌথ নৃত্য, অনেক মুখোশ, প্রাচীন প্রাসাদের কলরোল, কোনো সন্ন্যাসীর

খণ্ডিত মাথা কিংবা গীতরত কবির আপন ছিন্ন শির, ক্লিওপেট্রার কবর, ফসলের ক্ষেতে ডনজুয়ানের প্রস্তরিত হাত, 'প্যানের স্পন্দিত কর্ণমূল', কবির গতায়ু পিতার হাতে সেজানের আপেল, নগরীর কুকুরগুলোর অকস্মাৎ জলকন্যায় রূপান্তর, বাস টার্মিনাল, কলোনি, গিরিগিটির দীর্ঘশ্বাস ইত্যাদি। কোনো সংশয় থাকে না যে কবিতাটিতে কবি তাঁর অবচেতনার কুণ্ডলীকৃত নানা দৃশ্য ও অনুভূতি, ঐতিহ্য, অভিজ্ঞতাকে অবিকল উদ্ধৃত করেছেন। কবির অবচেতনায় এক ধরনের ক্রম রূপান্তর ঘটতে থাকে- একে একে দৃশ্যপট বদলায়। কবি তাঁর অবচেতন স্রোতকে, স্বপ্নকে চৈতন্যের কোনো শাসন ছাড়াই উন্মুক্ত করে দেন। এমনকি এলোমেলো কার্যকারণবিহীন, অসংলগ্ন স্বপ্নদৃশ্যগুলোকে সংকলনের কোনো তাগিদও অনুভব করেন না বরং শব্দ, বাক্যের বারংবার উল্লম্ফনে (juxtaposition) অবিকৃতরূপে তাদের ছড়িয়ে দিয়েছেন কবিতায়। শব্দ-ভাষার উল্লম্ফন কবির অবচেতনের অসম্বদ্ধতাকে প্রকটভাবে প্রকাশে সমর্থ হয়। অন্ধকার রাত্রির হৃৎপিণ্ডের ভেতর বসে কবি তাঁর আধাবাস্তব স্বপ্ন-কল্পনাকে এভাবে অবমুক্ত করেন। সে স্বপ্নের কোনো দেশ-কাল বা আলাদা ভূ-ভাগ নেই। কবির অবচেতনে গচ্ছিত নানা চিত্রের সাথে বাস্তব ও কল্পনা বিভিন্ন মাত্রায় মিশে চিত্রিত হয় কবিতায়—চিত্রকল্পে লক্ষ করা যায় অদ্ভুত ভূতগ্রস্ততা। শামসুর রাহমান এবং তাঁর পূর্বজ আধুনিক বাংলা কবি বিষ্ণু দে আরাগঁর মত মতাদর্শকেই সর্বস্ব জ্ঞান না করলেও তাঁর প্রথম পর্যায়ের নান্দনিকতার অনুসারী ছিলেন। বিষ্ণু দে আরাগঁ'র মত উল্লম্ফনের প্রয়োগ ঘটিয়েছেন তাঁর অনেক কবিতায়। বিষ্ণু দে মূলত ভাবের আপাত বিচ্ছিন্নতা ঘটাতে বাক্যের উল্লম্ফন ব্যবহার করতেন তাঁর কবিতায়। শামসুর রাহমান কবিতায় উল্লম্ফন প্রয়োগে অগ্রজ কবির চেয়ে অধিক স্বাধীন। মূলত স্বপ্ন ও অবচেতনের বিস্রস্ততা প্রকাশে রাহমান অনর্গল ব্যবহার করেছেন শব্দ, বাক্যাংশ ও বাক্যের নানা উল্লম্ফন। বিষ্ণু দে মূলত সচেতনভাবে বাক্যের উল্লম্ফন ঘটাতেন কবিতায়। বিষ্ণু দে'সহ ত্রিশোত্তর বাংলা আধুনিক কবিরা মূলত প্রথম পর্বের আধুনিক কবি এলিয়ট এবং ইয়েটস দ্বারাই প্রভাবিত ছিলেন অধিক। ইউরোপীয় কবিতায় বোদলেয়ার, মালার্মে, ভার্লেন, র‍্যাবো প্রমুখ কবির কবিতা দ্বারাও বুদ্ধদেব বসু ও ত্রিশোত্তর কবিদের অন্যান্যরা প্রভাবিত হয়েছিলেন বটে, কিন্তু তখন বিশ্ব কবিতায় পরাবাস্তবতার উন্মেষ ঘটেছে মাত্র । মূলত পরাবাস্তবতা আধুনিক কবিতারই একটি প্রপঞ্চ হলেও বিশ্ব কবিতায় পরাবাস্তববাদী আন্দোলনের সময়কাল বিংশ শতাব্দীর বিশের দশক থেকে পঞ্চাশের দশক পর্যন্ত । আঁদ্রে ব্রেতোঁর প্রথম মেনিফেস্টো প্রকাশিত হয় ১৯২৪ সালে। এরপর দ্বিতীয় ও তৃতীয় মেনিফেস্টো প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ১৯২৯ ও ১৯৩৯ সালে। যে কারণে, আধুনিকতার প্রথম ভাগের কবিদের কবিতায় পরাবাস্তবতার প্রয়োগ লক্ষ করা যায় কদাচিৎ, দু'একটি অনুষঙ্গে, একটি দু'টি চিত্রকল্পে। যেমন, টি. এস. এলিয়ট তাঁর "The love song of J. Alfred Prufrock"কবিতায়

সন্ধ্যায় সূর্যকে নিস্তেজ হতে দেখে যে চিত্রকল্পটি অঙ্কন করেন, তা পরাবাস্তবাশ্রয়ী। তিনি আসন্ন সন্ধ্যাকে আকাশের গায়ে অবসন্ন হতে দেখেন অপারেশন টেবিলের অবশ-দেহ কোনো রোগীর মত—

> Let us go then, you and I,
> When the evening is spread out against the sky
> Like a patient etherized upon a table;
> (Eliot, 1970: 3)

কিন্তু, আধুনিকতাবাদের উত্তর-পর্যায়ে পরাবাস্তবতাবাদী কবিরা উল্লম্ফন, 'অটোমেটিক রাইটিং' প্রভৃতির সূত্রে তাঁদের অবচেতন প্রবাহের স্বাধীনতাকে যেমন স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশ করেছেন, প্রথম পর্যায়ের আধুনিক কবিরা তাঁদের কাব্যে তেমন ব্যাপকভাবে তার প্রয়োগ করেননি। ১৯২৯ সাল থেকে দ্বিতীয় পর্বের পরাবাস্তব আন্দোলনে চিত্রকলা, নাটক ও চলচ্চিত্রের সাথে সংযোগসূত্রে কবিতায় অন্তর্বাস্তবতার চিত্রণে কবিরা আরো স্বাধীন ও স্বতঃস্ফূর্ত হন। অবচেতন মনকে অর্গলমুক্ত করে দেন তাঁরা। উল্টোপাল্টা চিত্রকল্পে তাঁদের অবচেতনার কল্পনালোককে দুঃসাহসী ভাষা-চিত্রে প্রকাশ করতে থাকেন। কিন্তু আধুনিক কবি বিশেষত এলিয়ট, ইয়েটস তাঁদের কল্পনাকে ওইভাবে অনাব্রু করেননি। সত্য বটে তাঁরাও চরিত্রের গলিঘুজিতে অনেক ঘুরেছেন, কিন্তু দুঃস্বপ্নের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করেননি। আধুনিক কবিদের মিথ ও প্রতীক-প্রিয়তা এবং কাঠামো ও ভাষার অতি সচেতনতাই তাদের স্বপ্ন-কল্পনাকে আলুলায়িত হতে দেয়নি। মূলত তাঁদের কবিতার সেই ভাস্কর্যসুলভ সংহত আঙ্গিক পরাবাস্তবতার অন্তরায় ছিল কখনো কখনো। আধুনিক কবিদের কবিতায় কোনো পরাবাস্তব চিত্রকল্পকেও একটি সমুন্নতি দেবার প্রয়াস লক্ষ করা যেত। পরাবাস্তব আন্দোলন আধুনিক কবিদের সেই যুক্তিবাদিতা ও কার্যকারণ শৃঙ্খলা ও সংহত বিন্যাসকে ভেঙে ফেলার সচেতন বিদ্রোহের প্রকাশ। শামসুর রাহমানের দীর্ঘ কবি জীবনে এই আদি ও উত্তর পর্বের পরাবাস্তব নিরীক্ষার নানা প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। পূর্বে উল্লেখিত তাঁর প্রথম পর্বের 'সেই ঘোড়াটি' কবিতায় পরাবাস্তবতার চিত্রণ যেমন ঊর্ধ্বমুখী হয়েও ভাবের ঘনত্বে একটি সমুন্নতি অর্জন করে, আশির দশকের কবিতায় তেমন সংহতি লক্ষ করা যায় না, বরং এ পর্যায়ে পরাবাস্তবতা ব্যাপ্ত ও দ্রবীভূত হয়ে কবিতার সত্তায় মিশে থাকে। শামসুর রাহমানের শেষ পর্বের কবিতায় আবারো পরাবাস্তবতা কল্পনার নানা মাত্রায় রূপান্তরিত ও একীভূত হয়ে কবির দেশচেতনার সাথে সম্পৃক্ত হয়। তবে, শামসুর রাহমানের কবিতায় মূলত কবির চেতন-অবচেতন, সমকাল-স্মৃতি-ঐতিহ্য, স্বদেশ ও বিশ্ব এবং বাস্তব-পরাবাস্তবতা বিভিন্ন মাত্রায় সমন্বিত হয়ে বিন্যস্ত থাকে।

ফ্রয়েড তাঁর মনঃসমীক্ষণ তত্ত্বে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন মানুষের 'লিবিডো' বা অবদমিত বাসনাকে। তিনি free association এবং সম্মোহনের মাধ্যমে মানুষের অবচেতন থেকে তুলে আনতেন তাঁর জৈবিক কামনার গুপ্ত সূত্রগুলো। যেহেতু, 'লিবিডো' বা কাম চেতনা সমাজসিদ্ধ নয়, এবং সচেতন মনের কাছে পরাস্ত এক চেতনা, ফলে, স্বপ্নে তার স্বাধীন প্রতিফলন ঘটে। ফ্রয়েডের তত্ত্বের অনুসারী পরাবাস্তববাদী শিল্পীরা স্বপ্নের এই আদিমতাকে কোনো রাখ-ঢাক ছাড়াই শিল্পে প্রকাশ করতে আগ্রহী ছিলেন। নিদ্রাকর্ষক কোনো ঔষধের মত পরাবাস্তবের আকর্ষণ কবিকে নিয়ে চলে তার মনোগহীনে। কখনো কখনো সেখানে তিনি নির্মাণ করেন কৃত্রিম স্বর্গলোক (Breton, 1969: 36)। প্রিয়তমার প্রতি অবদমিত কাম শামসুর রাহমানকে নিয়ে যায় এক স্বপ্নের ঘরের ভেতর—সেখানে কৈশোরের স্মৃতির সাথে তাঁর কামনা-বাসনা মিলে মিশে যায়। কবি খাপছাড়া চিত্রকল্পগুচ্ছে, স্বতঃস্ফূর্ত লেখনীতে তাঁর স্বপ্নের সেই রহস্যময় পরা জগৎকে চিত্রিত করেন—

এখন আমার ঘর কাঁটা চুলের স্তূপে নিমজ্জিত ; সেই স্তূপ
থেকে এইমাত্র উঠে এল এক নারী, যার গ্রীবায়
মীরার ভজনের ছায়া, দু'চোখে যমজ গোলাপ,
ওষ্ঠে চন্দ্রভস্ম। সে এক মাটির ঘরে প্রবেশ করে
আস্তে সুস্থে আমার অভিলাষকে উস্‌কে দিয়ে।
...
মেশ্‌কে আম্বরের অস্পষ্ট ঘ্রাণময় আতরদানি,
ফরশির দিঘল নল, পোষা পায়রা, তাকে-রাখা বিষাদসিন্ধু,
একজোড়া চোখ
আমার নানার কণ্ঠনিঃসৃত সুবে-সাদেকের মতো আয়াত,
নানির দীর্ঘশ্বাস সমেত
সেই মাটির ঘর এখন আমাকে
ভুলে-যাওয়া-যুগের কোনো রাগিণীর মতো ডাকে।
সেই ঘরের কথা ভাবতে গিয়ে আমি সে-ঘর আর দেখি না।
('সে এক মাটির ঘর', *উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ*)

কবির অবচেতন মানস-ভ্রমণ শৈশবের আঁতুড় ঘর থেকে শুরু হয়ে নানা বিস্মৃত অতীত অতিক্রম করে বিলুপ্ত জগতের ছোট ছোট অনুষঙ্গকে সাথে করে আবারো ফিরে আসে সেই মাটির ঘরে এবং অবশেষে সেই ঘরও অবলুপ্ত হয় । স্বপ্নের ভেতর মাটির ঘরটি কবির স্মৃতি-সত্তার প্রতীক হয়ে যায়। তাঁর যাপিত জীবনের এলোমেলো স্মৃতি-অনুষঙ্গ স্বপ্নের ভেতর এক অদ্ভুত জগৎ তৈরি করে, যেখানে কবির জন্ম, জৈবকাতরতা, গুচ্ছ-গুচ্ছ আশার মৃত্যু, আতরদানির গন্ধ, বিস্মৃত নানা সুর ও স্বর অনেক অতিপ্রাকৃত অনুষঙ্গের সাথে মিলে-মিশে বিরাজ করে। কবি স্বপ্নের চিত্রণের মাধ্যমে তাঁর সেই স্মৃতিকাতরতার প্রকাশ ঘটান।

পরাবাস্তবতা বাস্তব জগৎ ও স্বপ্নের মধ্যে সংযোগ সাধন করে। পরাবাস্তববাদী কবিরা এই রীতিতেই তাঁদের ভীষণ বিক্ষিপ্ত অন্তর্জগৎ, স্বপ্নলোককে দৃশ্যমান করে তোলেন—কখনো স্বপ্নকে অবিকল বসিয়ে দেন কবিতায়। মূলত তাঁরা অন্তর্জগতেরই অক্লান্ত পরিব্রাজক। ''চেতন ও অবচেতন মনের দুর্জ্ঞেয় রহস্যের অনুসন্ধান কবি ও শিল্পীদের ডাক দিয়ে যায় লজিকশাসিত চিন্তাজগতের বাইরে 'যেখানে পদ্মফুলের মাথায় সাপ আর ভ্রমর' যেমন খেলা করে তেমনি মানবমনের ব্যক্তিগত নরকগুলোর দরজাও হাট হয়ে খুলে যায়। নিঃসন্দেহে সে-জগৎ একই সাথে ভয়াল ও আকর্ষক, কুৎসিত ও সুন্দর, জ্ঞাত এবং অবাঙ্মানসগোচর'' (আশরাফ, ২০১৩: ১৭৯)। আধুনিক মানুষের জীবনে স্বপ্ন আর চৈতন্য, অবচেতন ও বাস্তব অবিচ্ছিন্ন প্রসঙ্গ। কারণ,আমাদের অবচেতন মনের চাওয়া-পাওয়া-অপ্রাপ্তি-অচরিতার্থতাই প্রতীকান্বিত হয় স্বপ্নে। আমরা চাই বা না চাই, আধুনিক মানুষ এই দুঃস্বপ্নের রজ্জুতে বাঁধা। তাই জীবনের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের সমাধান মেলে স্বপ্নে। চেতন জগতের চেয়ে স্বপ্নকে অধিক গুরুত্ব দেয়ার কৈফিয়তরূপে ব্রেতোঁ বলেন- '' Can't the dream also be used in solving the fundamental question of life? Are this questions the same in one case as in the other and, in the dream do this questions already exist? Is the dream any less restrictive or punitive than the rest?'' (Breton, 1969, 12) । কখনো স্বপ্নকেই সরাসরি কাব্যরূপ দেন কবি। যুক্তিগ্রাহ্য বাহ্যজগত অবদমিত থাকে অবচেতন সত্তার কাছে। ফলে অবচেতন মনের কল্পনাই কবিতার উপজীব্য হয়ে ওঠে। পরাবাস্তব কবিরা বিচরণ করলেন মানব মনের সেই গূঢ় প্রদেশে যেখানে বাস্তব-অবাস্তব, ইদ-ইগো নানা দ্বান্দ্বিকসূত্রে একীভূত থাকে। স্বপ্নই চেতন ও অবচেতনের দেয়ালকে দ্রবীভূত করে। তখন স্বপ্নই সমস্ত চৈতন্যের নিয়ন্ত্রক হয়। শামসুর রাহমান এ পর্বের কবিতায় তাঁর স্বপ্নের খাপছাড়া চিত্রগুলোকে পরাবাস্তবতার নানা ধরনে প্রকাশ করেন তাঁর কবিতায়। যেমন :

ইদানীং স্বপ্ন দেখি আমি বড় বেশি খাপছাড়া—
আমাকে শঙ্খিনী করে তাড়া
ভীষণ আক্রোশে ; লতাগুল্ম, ঝোপঝাড়
বারংবার
নানা ছদ্মবেশে
কেবলই এগিয়ে আসে আমার উদ্দেশে
কী অন্ধ হিংসা আর ঘুমের বড়ির চোরাবালি
আমাকে গোগ্রাসে গিলে ফ্যালে। এরেনায় করতালি,
ক্ষুধার্ত সিংহের মুখে আমার শরীর
অসহায়, কম্পমান।
...
কানে
ভেসে আসে অকস্মাৎ কেমন সুরেলা স্বর, গানে—

গুঞ্জরিত দিকগুলি, কী সুন্দর আদিমতা
হেসে ওঠে, হেরড়ের দরবারে অপরূপ লাস্যে বিদ্যুল্লতা
চমকায় ঘনঘন, সালোমের নাচের মুদ্রায়
বিভিন্ন বয়সী রাজপুরুষের শিরায় শিরায়
বয়ে যায় দুরন্ত সিমুম,
আমার খণ্ডিত মাথা রেকাবিতে ভীষণ নিঝুম।
সালোমে সালোমে বলে গান গেয়ে ওঠে
আমার মস্তক, ছিন্ন রক্তাক্ত এবং ক্রুর হাসি ফোটে নর্তকীর ঠোঁটে।
('ইদানীং স্বপ্ন দেখি', *ইকারুসের আকাশ*)

স্বপ্নের ভেতর ক্ষুধার্ত সিংহের মুখে কবি নিজের শরীরকে কম্প্রমান দেখতে পান আবার একটু পরেই রেকাবির উপর দেখতে পান তাঁর নিজের ছিন্ন মস্তক। বস্তুত ভয়, বিভীষিকা প্রথম থেকেই কবির সঙ্গী। কখনো প্রতীকে, কখনো প্রত্যক্ষরূপে ইতঃপূর্বে নানাভাবে তার প্রতিফলন ঘটিয়েছেন কবি তাঁর বিভিন্ন কাব্যে। এ পর্যায়ে কবি পরাবাস্তব মাধ্যমে দুঃস্বপ্ন, অলীক বীক্ষণ, অলীক শ্রবণ চিত্রণের মধ্য দিয়ে কিংবা নানা বস্তু বা প্রাণীর বিপুল, বিস্ফারিত, অস্বাভাবিক আয়তনে রূপান্তরকরণের মাধ্যমে তাঁর চেতন-অবচেতনের নানা ভয়কে ভাষায় প্রকাশ করেছেন। কখনো বস্তু জগতের বিভীষিকাই কবির স্বপ্নে রূপান্তরিত হয়েছে নতুন কোনো উদ্ভট, অস্বভাবী অনুষঙ্গে। কবি হঠাৎ অলীক বীক্ষণে লক্ষ করেন তাঁর ঘরের কোণের টববন্দী ফণিমনসার গাছটি এক অতিকায় মানবে রূপান্তরিত হয়—প্রবল হিংস্রতায় স্বৈরশাসকের মত দখল করে কবির ঘর ('একজন ফণিমনসা', *উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ*)। অকস্মাৎ অগ্নিবর্ণ ঝুটি নেড়ে কাকাতুয়া তেড়ে আসে কবির শয্যাপাশে, দেয়ালের টিকটিকি অতিকায় ডাইনোসরে রূপান্তরিত হয়ে ধেয়ে আসে, এমনকি উঠোনের গাছপালা প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে ওঠে, ক্রূর হয়ে ওঠে শান্ত বেড়ালও ('কে দেবে অভয়', *কবিতার সঙ্গে গেরস্থালি*)। 'হিচককী' কাকে হঠাৎ ভরে যায় কবির ঘর, কখনো পাংশু জ্যোৎস্নায় কবির মনে হয় শহর ছেয়ে যায় জয়নুলি কাকে ('জয়নুলি কাক', *মাতাল ঋত্বিক*)। কখনো আয়োনেস্কোর নাটকের মৃতদেহের প্রবর্ধমান পা দুটোর মত কবির চেতনায় কোনো নগন্য পিঁপড়ের ঝাঁক স্ফীত হতে হতে বিকটাকার রূপ ধারণ করে—কবি তাঁর জাগতিক চৈতন্য এবং দুঃস্বপ্নের ভেতর বন্দী হয়ে থাকেন সেই পিঁপড়ের দ্বীপে। বাস্তব-পরাবাস্তবের মিশ্রণে কবি নিম্নোক্ত সনেটটিতে তাঁর অনুভূতির সেই বিপন্নতাকে ব্যক্ত করেন,

অকস্মাৎ পিঁপড়ের ঝাঁক ধেয়ে
আসে চতুর্দিক থেকে। অতিকায় ওরা, টেলিফোন
তার, খাট, দেয়লের মাঠ, যেন অত্যন্ত গোপন
ষড়যন্ত্রে বুঁদ হয়ে, উঠছে চেয়ার বেয়ে বেয়ে।

পিঁপড়েগুলি চকচকে লাল গ্রেনেডের মতো,
যে-কোনো মুহূর্তে ওরা ভীষণ পড়বে ফেটে, ঘর
নিমেষে কাঠের গুড়ো হবে, জলপাইরঙ জিপে

চেপে এসে আমার হৃদিস কেউ পাবে না, আহত
আমি রইব ঢাকা ভগ্নস্তূপে, দুঃস্বপ্নের এ প্রহর
এত দীর্ঘ কেন ? কেন বন্দী আমি পিঁপড়ের দ্বীপে ?
('পিঁপড়ের দ্বীপ', *মাতাল ঋত্বিক*)

শামসুর রাহমানের তৃতীয় পর্বের *মাতাল ঋত্বিক* কাব্যগ্রন্থটি একটি সনেট সংকলন—কবির প্রেম কথার ঋগ্বেদ। কিন্তু, আশ্চর্যজনকভাবে সনেটের সংহত আঙ্গিক-বন্ধনেও কবি সঞ্চারিত করেন অদ্ভুত, ভুতুড়ে সব পরাবাস্তব চিত্রকল্পমালা—সেখানে কঙ্কাল গান গায়, মৃতদেহ সচল হয়ে ওঠে—তার নখগুলো দীর্ঘতর হতে-হতে অতিকায় ঈগলের চঞ্চুতে পরিণত হয়, জীবনানন্দের কবিতার মত সেখানে জেগে ওঠে পৃথিবীর অনেক মৃত সুন্দরীদের চোখ—

একজন মৃতদেহ পানপাত্রে তিনটি হীরক
হেলায় দিলেন ছেড়ে। পানপাত্র থেকে আস্ত পরী
তিনজন অকস্মাৎ উপচে পড়ল, কালো তরী
হ'ল সারা ঘর, জলদস্যুর দু'চোখ খুব ধক
ক'রে জ্বলে ওঠে, মৃতদেহটির সবগুলি নখ
বেড়ে বেড়ে অতিকায় ঈগলের চঞ্চু, নীল ঘড়ি
সোনাটার মতো বাজে, ক'জন কঙ্কাল চূর্ণ
জরি মুখের গহ্বরে পুরে গান গায়, 'এসো হে মড়ক'।

একটি ঘাসের মূর্তি, তুর্কি টুপি-পরা, ঘূর্ণি নাচে
মত্ত, মৃতদেহটিকে ঘিরে তীব্র গাইছে কাসিদা,
আরক করছে পান খ্রিষ্টপূর্ব পিপের ভেতরে
ডুবিয়ে সবুজ মাথা, সাপ দীর্ঘ বাজে দগ্ধ গাছে
বোগদাদি বণিকের তোরঙ্গে গচ্ছিত থরে-থরে
কতিপয় মৃত সুন্দরীর চোখ, চোখে তীক্ষ্ণ দ্বিধা।
('একজন মৃতদেহ', *মাতাল ঋত্বিক*)

বাস্তবের নানা ভয় ও অস্তিত্বের বিভীষিকাময় রূপান্তর লক্ষ করা যায় কবির এই কবিতায়। বাস্তবের নানা ভীতি ও সংকটের প্রতিফলন ঘটে মানুষের স্বপ্নে কিংবা দুঃস্বপ্নে আর সেসব স্বপ্নচিত্রকে রূপান্বিত করতে পরাবাস্তব শিল্পীদের অবলম্বন হয়েছিল সুররিয়ালিজম। বিশের দশকে পরাবাস্তববাদী কবিরা আকৃষ্ট হয়েছিলেন ফ্রয়েডের 'dream interpretation' তত্ত্বে এবং তাঁরা স্বপ্নকে 'প্যারাডিমে'র মত করে ব্যবহার করেন তাঁদের কবিতায়। স্বপ্ন ও বাস্তবতাকে পরাবাস্তববাদীরা একটি 'সংযুক্ত শিরা'র মত মনে করতেন, যার প্রবাহ অভিন্ন।

বাংলা কবিতায় জীবনানন্দ দাশের (১৮৯৯-১৯৫৪) কবিতায় পরাবাস্তবতার প্রকাশ সবচেয়ে বেশি। যদিও তিনি আধুনিক কবি, তবু, প্রথম থেকেই কবি নিঃসঙ্গ, স্মৃতিকাতর, মগ্নচেতন, ইতিহাস

ও স্বপ্নলোক-পর্যটক। ফলে, প্রথম থেকেই পরাজাগতিক অনুষঙ্গ, চিত্রকল্প ও নির্ভার শব্দ-খেলা তাঁর কবিতায় দুর্লক্ষ নয় । তবে, দুই বিশ্বযুদ্ধ-মধ্যবর্তী সময়ে লেখা জীবনানন্দ দাশের কাব্যগ্রন্থগুলিতে, বিশেষত *সাতটি তারার তিমিরে* বৈশ্বিক, দৈশিক বাস্তবতায কবির আরক্ত চৈতন্যকে প্রকাশ করতে তিনি ব্যবহার করেছেন জটিল পরাবাস্তব চিত্রকল্পসমুহ, অসংলগ্ন ভাবনাসমূহ, ইন্দ্রিয় বিপর্যাস, ভাষার উল্লম্ফন। যেমন, *সাতটি তারার তিমিরের* 'ঘোড়া' কবিতাটিতে ইন্দ্রিয় গন্ধ-মাখা ইতিহাস-ঐতিহ্য রূপান্বিত হয়েছে কবির চেতনা-লীন পরাবাস্তব প্রতিক্রিয়ায় :

আমরা যাইনি মরে আজও—তবু কেবল দৃশ্যের জন্ম হয় :
মহীনের ঘেড়াগুলো ঘাস খায় কার্তিকের জোৎস্নার প্রান্তরে,
প্রস্তরযুগের সব ঘোড়া যেন—এখনও ঘাসের লোভে চরে
পৃথিবীর কিমাকার ডাইনামোর' পরে।

আস্তাবলের ঘ্রাণ ভেসে আসে একভিড় রাত্রির হাওয়ায়;
বিষণ্ন খড়ের শব্দ ঝ'রে পড়ে ইস্পাতের কলে;
চায়ের পেয়ালা কটা বেড়ালছানান মতো—ঘুমে—ঘেয়ো কুকুরের
অস্পষ্ট কবলে
হিম হয়ে নড়ে গেল ওপাশের পাইস্ রেস্তোরাতে ;
প্যারাফিন-লণ্ঠন নিভে গেল গোল আস্তাবলে।
সময়ের প্রশান্তির ফুঁয়ে ;
এইসব ঘোড়াদের নিওলিথ-স্তব্ধতার জ্যোৎস্নাকে ছুঁয়ে।
(জীবনানন্দ, ২০০৬: ১৯-২০)

শামসুর রাহমানের এ পর্যায়ের কবিতায় লক্ষ করা যায় জীবনানন্দীয় কালচেতনা, ইতিহাস ও স্মৃতিময়তার বিচূর্ণীভবন। তাঁর কবিতায় ইতঃপূর্বে আমরা স্মৃতিচারণা লক্ষ করেছি, কিন্তু সেসব প্রত্যক্ষ স্মৃতিচারণ। পরাবাস্তবতাশ্রয়ী কবিতায় তাঁর অবচেতনে জমে থাকা এলোমেলো স্মৃতির ভগ্নাংশকে বিস্রস্ত চেতনার সূত্রে কবিতায় তরঙ্গিত করার রীতিটি এই পর্বে নতুন। কখনো কবির চোখে স্মৃতিরা ভেসে ওঠে অকস্মাৎ 'মৃত মাছে'র মত, কখনো কবির অস্তিত্বের গূঢ় সত্তায় 'অলৌকিক পদ্মের মত' জেগে উঠতে চায় 'খ্রিষ্টপূর্ব সভ্যতার মত কিছু প্রবল প্রতীতি' অথবা বিস্মৃত কোনো দূর অতীত। বস্তুত কবি যেন সময়ের এক দীর্ঘ 'টানেলে' বসবাসরত। সেই টানেলে বাস্তবের নানা অভিঘাত, আতঙ্ক, বিহ্বলতা কবিকে অতীত অভিসারী করে। কবি অবচেতনে সেই টানেল বেয়ে চলে যান কোনো বিস্মৃত নানা সভ্যতায়, অতঃপর স্বপ্নের নিয়ন্ত্রক হয়ে তিনি ঘুরে বেড়ান ইতঃস্তত—সেখানে সময়ের কোনো যৌক্তিক সীমারেখা থাকে না, কল্পনায় উন্মার্গগামী কবির লিবিডো জাগতিক নারীকে ছেড়ে আবর্তিত হয় পিকাসোর ছবির ত্রিমুখী রমণীকে ঘিরে অথবা ডিভানে শায়িতা কোনো নারীর শরীরকে তিনি কল্পনা করেন পিকাসোর ছবির অভিজাত রমণীরূপে। এভাবে ইতিহাস, স্বপ্ন, বাস্তব পরাবাস্তব কবির চেতনায় অবিভাজ্য হয়ে ওঠে। কবির ভাষায়—

কখনো-কখনো
মনে হয়, কী যেন কিসের ঘোরে চলে গেছি সূদুর কোথাও
স্বপ্নচর পাখির পাখায় ভর ক'রে কাছে আসে
বাহাদুর শাহ জাফরের গজলের মতো এক
বিরান বাগান আর মোগল মিনিয়েচর কিছু অন্তরাগে কান্নারুদ্ধ
রক্তাভ চোখের মতো পুরাণসম্ভব।

অপরাহ্নে ডিভানে শায়িতা
মহিলা আমাকে ডেকে পিকাসোর ত্রিমুখী রমণী হয়ে যান
চোখের পলকে আমি তার স্তনদ্বয়, অভিজাত নাভিমূল,
রমণীয়, উল্লসিত যোনি থেকে দূরে ক্রমশ অনেক দূরে
চলে যেতে থাকি; তিনি কবিতার পঙক্তির মতন
কেবলই ওঠেন বেজে অস্তিত্বে আমার।
('টানেলে একাকী', *কবিতার সাথে গেরস্থালি*)

এভাবে, স্মৃতিস্রোত নিয়ে কবি ঘোরেন মনুষ্য সমাজে। স্তব্ধ মধ্যরাতে সূদুর গ্রিসের কথা ভাবা কিংবা 'স্বপ্নের অসীম ঝিলে' স্মৃতিময় বাতাসে কবির ছিপছিপে নৌকা বাওয়া চলে। জীবনানন্দ দাশের মত বিলুপ্ত সভ্যতার 'কমলা রঙের রোদে'র মধ্যে বিচরণ করে বেড়াতে কবির ভালো লাগে। কবি যখন তাঁর অর্ধজাগ্রত চেতনায়, স্বপ্নের ভেতর অথবা নিদ্রাহীন জ্যোৎস্নাচ্ছন্ন কোনো রাতে নানা বিমূর্ত জগতে ঘুরে বেড়ান একা একা, তখন তাঁর নানা স্মৃতির পুরু স্তর ভেদ করে হঠাৎ উঠে আসে ইতিহাসের মৃত কোনো অধ্যায়ের চূর্ণ অনুষঙ্গ—আংশিক বিকৃতরূপে, কিংবা পরাবাস্তব সত্তা নিয়ে। প্রায়শই কোনো স্পষ্ট সত্তা নিয়ে নির্দিষ্ট কাল-ইতিহাস-ভূখণ্ডের বলে তাদের চেনা যায় না, শুধু অনুভব করা যায়, তারা দূর, বিস্মৃত কোনো শতাব্দীর কোনো নাবিক, প্রচণ্ড প্রতাপ কোন রাষ্ট্রনায়ক অথবা প্রাচীন সুন্দরী রমণী কোনো। যেমন:

কতিপয় বিষণ্ন নাবিক
নুনমাখা দাড়ি আর রাঙা চোখ নিয়ে দিগ্বিদিক
করেছিল ছুটাছুটি, খুব ক্লান্ত হয়ে

নিরাশায় ম্লান করে সর্বদা গন্তব্যহীনতায় ধুধু ভয়ে
শুয়েছিল মাটিতে সটান, তারপর
ওঠেনি কখনো—বহু দূরে কিছু বালির কবর, এলোমেলো দাঁড়

দেখে যদি কেউ কোনোদিন
থমকে দাঁড়ায়, তবে করুণ সংগীত, ভায়োলিন
কিংবা অন্য কোনো বাদ্যযন্ত্র থেকে নয়,
প্রকৃতির থেকে জেগে উঠবে সহসা, মনে হয়।
('দীর্ঘ কেঁদে যায়', *কবিতার সঙ্গে গেরস্থালি*)

এ পর্বের কবিতায় কবি প্রায়শই যে কোনো প্রেক্ষাপটে স্মৃতি-বিস্মৃতিকে কম্প্রমান করে তোলেন ঢেউয়ের মত। অবচেতন মনে স্মৃতিকে জাগিয়ে তোলেন। বিস্মৃতির অতল থেকে টেনে তোলেন স্মৃতির ভগ্নাংশ। প্রাচীন বিস্মৃত কাল কবেকার সুপ্তি থেকে আড়মোড়া ভেঙে জেগে ওঠে তাঁর কবিতায়, আবার যেন হৈ-চৈয়ের শব্দে প্রবল বিরক্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। এভাবে কখনো কাল-শৃঙ্খলাকে ভেঙে দিয়ে কবি সময়কে চলিষ্ণু করে তোলেন—অতীত-বর্তমান ভবিষ্যতসঞ্চারী একটি আবহ তৈরি করেন। তা সর্বদাই পরাবাস্তব মাত্রা না পেলেও কখনো-কখনো স্মৃতি ও স্বপ্ন কবির অবচেতনায় 'রমণলিপ্ত' হয় অবলীলায়।

শামসুর রাহমান তাঁর এক সাক্ষাৎকারে বলেন যে, বাংলা কবিতার ত্রিশোত্তর কবিদের মধ্যে তিনি সবচেয়ে বেশি অনুরক্ত ছিলেন জীবনানন্দ দাশের প্রতি। প্রকৃতি, ভাষা-জগৎ ছাড়াও তাঁর কবিতায় অবচেতনরোকের বহিঃপ্রকাশ ও পরাবাস্তবতার নানা নিরীক্ষার প্রতি আকর্ষণ বোধ করতেন শামসুর রাহমান (শামসুর, ২০১১: ২৫-২৬)। সেই সূত্রেই হয়তো শামসুর রাহমানের সাথে জীবনানন্দ দাশের শেষ পর্বের পরাবাস্তব চিত্রণের মধ্যে কয়েকটি সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। উভয়েই সময়ের অস্থিরতাকে চিত্রিত করতে বাস্তবতার সাথে বিভিন্ন মাত্রায় পরাবাস্তবতার প্রয়োগ ঘটিয়েছেন, উভয়ের কাব্যেই বিভিন্ন স্বপ্ন, বিলুপ্ত ইতিহাসের চূর্ণ অনুষঙ্গ, ইঙ্গিতপূর্ণভাবে বিচিত্র পশুর উল্লেখ, উল্লম্ফন রীতিতে নানা অসংলগ্ন দৃশ্যের সংযোজন, চিত্রকলার উল্লিখন প্রভৃতি লক্ষ করা যায়। যেমন *সাতটি তারার তিমির* কাব্যে জীবনানন্দ দাশের একটি কবিতায়—

কুকুরের ক্যানারির কান্নার মতন:
তাজা ন্যাকড়ার ফালি সহসা ঢুকেছে নালি ঘায়ে।
ঘরের ভিতর কেউ খোয়ারি ভাঙছে ব'লে কপাটের জং
নিরস্ত হয় না তার নিজের ক্ষয়ের ব্যবসায়ে,
আগাগোড়া গৃহকেই চৌচির করেছে বরং ;
অরেঞ্জপিকোর ঘ্রাণ নরকের সরায়ের চায়ে
ক্রমেই অধিক ফিকে হয়ে আসে ; নানারূপ জ্যামিতিক টানের ভিতরে
স্বর্গ মর্ত্য পাতালের কুয়াশার মতন মিলনে
একটি গভীর ছায়া জেগে ওঠে মনে ;—
অথবা তা ছায়া নয়—জীব নয় সৃষ্টির দেয়ালের 'পরে।
আপাদমস্তক আমি তার দিকে তাকায়ে রয়েছি ;
গগ্যাঁর ছবির মতো—তবু গগ্যাঁর চেয়ে গুরু হাত থেকে
বেরিয়ে সে নাকচোখে ক্বচিৎ ফুটেছে টায়ে-টায়ে ;
নিভে যায়—জ্বলে ওঠে, ছায়া, ছাই, দিব্যযোনি মনে হয় তাকে।
স্বাতীতারা শুকতারা সূর্যের ইস্কুল খুলে
সে মানুষ নরক বা মর্ত্যে বহাল
হতে গিয়ে বৃষ মেষ বৃশ্চিক সিংহের প্রাতঃকাল
ভালোবেসে নিতে যায় কন্যা মীন মিথুনের কূলে।
(জীবনানন্দ, ২০০৬, ৪১)

জীবনানন্দ দাশের মত ইতিহাস চেতনা ও স্মৃতি অনুষঙ্গ, বৈশ্বিক ও দৈশিক রাজনৈতিক প্রসঙ্গের উল্লেখ প্রভৃতি শামসুর রাহমানের এ পর্বের কবিতার অন্যতম লক্ষণ। মূলত, স্বপ্ন বা অবচেতনকে কবি যখন চিত্ররূপ দিতে যান, তখন ওই সব স্মৃতিচূর্ণ, বা কালভাবনা স্বতঃস্ফূর্তভাবেই চলে আসে। কারণ, কবির মগ্নচেতনার নানা স্তরে সেসব জমা থাকে বহুদিন ধরে। জীবনানন্দ দাশের কবিতার মত শামসুর রাহমানের কবিতায়ও লক্ষ করা যায় ইতিহাসের দূরাগত অশ্বক্ষুরধ্বনি, কামানের ধূম, পৃথিবীর রণরক্তোন্মত্ততার ইতিহাস। জীবনানন্দের মত কবিও কখনো কখনো পরাবাস্তবতার ঘোর ভেঙে হঠাৎ সচকিত হয়ে উপলব্ধি করেছেন 'পৃথিবীর গভীর, গভীরতর অসুখে'র ক্ষমাহীন বাস্তবতা—

দ্বৈপায়ন বণিক বেড়াতে
এসে দূর দেশে মশলার ঘ্রাণে গড়ে রাজ্যপাট।
দিগ্বিজয়ী বীরের অশ্বের পদাঘাতে চতুর্ধারে
ঘন-ঘন ওঠে হাহাকার, নিমেষে উজাড় ত্রস্ত পথঘাট—
মড়কে এমনই হয়, সবাই পালায় ঊর্ধ্বশ্বাসে বনবাদাড়ে।

অনেক শহর পোড়ে, ভাঙে গ্রাম, গ্রন্থের পাতায়
প্রমত্ত অশ্বের বিষ্ঠা জমে, খোঁড়া তৈমুর অথবা হিটলার
সবাই সোৎসাহে ক্রুর জামার হাতায়
নাচায় কঙ্কাল, নগরের আগুনে তুমুল সেঁকে হাত আর
দেয় ছুড়ে অন্ধকূপে কিংবা গ্যাস চেম্বারে তাদের,
যারা কাড়ানাকাড়ার তলে রাজরাজড়ার সুরে
ওঠে না যান্ত্রিক নেচে, বোঝে যারা কুটিলতা নানান ফাঁদের।
চিরকাল খেলা একই, পাল্টায় খেলুড়ে।
('এরকমই হয়', *আদিগন্ত নগ্ন পদধ্বনি*)

ইতিহাস, কালভাবনা, অন্তর্লীন ঐতিহ্যচেতনাকে বাস্তব-পরাবাস্তবতার মিশ্রণে প্রকাশের নান্দনিক সাদৃশ্যের সাথে-সাথে জীবনানন্দ দাশ এবং শামসুর রাহমান উভয়েই যাঁর যাঁর সময়ে অবস্থান করে ধ্বস্ত পৃথিবীকে মননে-ভালোবাসায়-সৌহার্দ্যে পুনর্নির্মাণের স্বপ্ন দেখেছেন। জীবনানন্দ দাশ শেষ পর্যন্ত 'তিমির হননের গান' গেয়েছেন, 'অনুসূর্যের গান' গেয়েছেন—পৃথিবীকে নতুন প্রেমে, শক্তি-সাহসে উজ্জীবিত করতে চেয়েছেন। অগ্রজ কবির মত শামসুর রাহমানও তাঁর শেষ পর্যায়ের কাব্যগুলোতে ভীষণ 'কৃষ্ণপক্ষ' থেকে 'পূর্ণিমা' অভিসারী ছিলেন—'অন্ধকার' থেকে 'আলোক' অভিমুখী হওয়ার ঐকান্তিক বাসনা পোষণ করেছেন। কিন্তু, তৃতীয় পর্যায়ে শামসুর রাহমানের এই যুদ্ধপরবর্তী কবিতাগুলোতে সেই আশাবাদ প্রবলভাবে ব্যক্ত হয় না। শামসুর রাহমানের এ পর্যায়ের কবিতায় সেই আশ্বাস দুর্লক্ষ্য বরং উদ্ভট উটের পিঠে চলে প্রিয় স্বদেশ আর তার 'টুপির মত ফাঁকা ভবিষ্যত-কল্পনা'য় কবি কেঁপে ওঠেন। এই কালপর্বের প্রথমার্ধে *আমি অনাহারী*, *বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে* কাব্যে কখনো কখনো কবি আশাবাদী হতে চেয়েছেন—কবিতায় পূর্বের মত স্বদেশের প্রতি, বিশ্বের প্রতি ঐকান্তিক

দায়বদ্ধতায় স্পষ্টভাষী হতে চেয়েছেন—''হে আমার আপন করুণ বিউগল / বাজো, বেজে ওঠো এ বিশদ সূর্যাস্তের ক্ষণে গভীর আশ্বাসে,/ চেয়ে দ্যাখো শতাব্দীর বিদীর্ণ হৃদয় থেকে রক্তবিন্দু ঝরে অবিরল'' (শতাব্দীর বিদীর্ণ হৃদয় থেকে, *বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে*)। কিন্তু, বাস্তবের রূঢ় আঘাতে কবির সে বিউগল আর আগের মত গভীর স্বপ্ন, আশ্বাসে বেজে ওঠেনি। **১৯৭১'** এর মুক্তিযুদ্ধের অনপনেয় স্মৃতির উৎপীড়ন, স্বাধীন দেশে স্বপ্নভঙ্গের বেদনা, বৈশ্বিক যুদ্ধক্ষুব্ধতা কবিকে অবচেতনলোকের শরণার্থী করে তোলে এবং পরাবাস্তবতায় ভ্রাম্যমাণ হন তিনি। কবি তখন দৃশ্যলোকের অন্তরালে অন্তর্বাস্তবের প্রকট সত্যগুলো প্রকাশের নান্দনিকতায় নিবিষ্ট হন। ফলে, বিংশ শতাব্দীর পরাবাস্তববাদীদের মত রাহমানও অবচেতনের টানেলে বসে স্বপ্ন-আশা-যুক্তি-শৃঙ্খলা বিপর্যস্ত এক পরাজাগতিক সন্ত। কখনো তিনি আধা বাস্তব-আধা স্বপ্নের জগতে অবদমিত আকাঙক্ষার আস্বাদে ধন্য, আবারো আফিমখোর বেতো ঘোড়াটার মত নির্জীব, কখনো খোঁয়ারি ভেঙে অবরুদ্ধ। অব্যক্ত শব্দ-ভাষাকে প্রকাশের স্বাধীনতায় তিনি স্বতঃস্ফূর্ত লেখনীকে অবলম্বন করেন। কিন্তু প্রথম পর্বের মত কবি আর তাঁর বেতো ঘোড়াটাকে নতুন স্বপ্নে নীলিমায় পাখা মেলতে দেন না। কল্পনাকে ঊর্ধ্বগ না করে কবি করে তোলেন গহীন সঞ্চারী। বস্তুতই কবি প্রতিপণ্ন হন এক 'অসুস্থ ঈগল'রূপে। কবি তাঁর কবিতা সম্পর্কে বলেন—

আমার কবিতা পথপ্রান্তে দুঃখীর মতো
চোখ মেলে চেয়ে থাকে কার পায়ের ছাপের দিকে,
গা ধোয় ঝরনার জলে। স্বপ্ন দ্যাখে, বনদেবী তার
ওষ্ঠে ঠোঁট রেখে হুহু জ্বলছেন সঙ্গম-লিপ্সায়।'
('নিজের কবিতা-বিষয়ে কবিতা', *ইকারুসের আকাশ*)

তবে, এই অনন্য নিরপেক্ষ পথ চাওয়া, স্বপ্নের-কল্পনা জলে গা-ধোয়া, আদিম উন্মত্ততা, কিংবা আপাতদৃষ্টিতে যা অসুস্থতা, তাকে অস্বীকার করা মানে জীবনের খণ্ডিত প্রকাশ। কারণ, বহির্বাস্তবতার চেয়ে অন্তর্বাস্তবতার আধিপত্যই আধুনিক জীবনের নৈমিত্তিক পরিচয়। কবির অবচেতনে, স্বপ্নে বাংলাদেশের অরাজকতার যে বিমূর্ত রূপ নির্মিত হয়, সেই নতুন বাস্তবতাকে প্রকাশের জন্য তাই কবিকে অবলম্বন করতে হয় পরাবাস্তবতা । সদ্য অতিক্রান্ত মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিপুঞ্জ কবির বর্তমানকে পরাবাস্তব বিহ্বলতায় বিস্রস্ত করে তোলে—কবির চোখের সামনে গাছে-গাছে ঝুলে থাকে কাটা মুণ্ড, একাত্তর কবির স্মৃতিতে ভেসে ওঠে গুলিবিদ্ধ লাশের প্রতীকে। কবির ভাষায়:

অকস্মাৎ এ কেমন
পরাবাস্তবের লীলা শহরের আনাচে-কানাচে?
মাঝে-মাঝে মনে হয়, আমার চোখের রেটিনায়
কী ব্যাপক বিভ্রমের ছায়া নাচে বেলা-অবেলায়।

নইলে কেন গাছে-গাছে সদ্য কাটা নরমুণ্ড দেখি,
দেখি দিনদুপুরেই শেয়াল শকুনে ছেয়ে গেছে
পৌরপথ। এমনিতে মোটামুটি ভালো থাকি, মানে
খাই দাই, প্রত্যহ কামাই দাড়ি। হঠাৎ আবার
সবকিছু উল্টাপাল্টা, আমার দৃষ্টিতে বারংবার
একাত্তর ভেসে ওঠে গুলিবিদ্ধ লাশের মতন।
('গুলিবিদ্ধ লাশের মতন', *কবিতার সঙ্গে গেরস্থালি*)

মূলত, পরাবস্তবতাও বাস্তবতা প্রকাশের কল্পনাত্মক এক মাধ্যম। কবির চেতন-অবচেতনে এই কল্পনার আধিপত্য নানা মাত্রায় ঘটে থাকে এবং তার প্রকাশও বিচিত্র রকমের হতে পারে। কল্পনা, তন্ময়তা বা অবচেতনলোক কবির উপর সওয়ার হলে কবি দেখতে পান 'উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ' কিংবা দেয়ালে ঝোলানো কোনো সুনীল ব্লেজারের দিকে তাকিয়ে কবি অবচেতন তন্ময়তায় অনুভব করেন ব্লেজার যেন সহসা অপর কোনো কবি হয়ে ওঠে এবং প্রাণময় কোনো পুরুষের মতই সে তার মগ্নচেতনাকে মেলে ধরে। তার, অর্থাৎ ওই সুনীল ব্লেজারের কৌতুহলী কল্পনা পরিভ্রমণ করে রবীন্দ্রনাথ-কাদম্বরী দেবীর গোপন প্রণয় থেকে শীতার্ত পোল্যান্ডের ধর্মঘট, গেরিলার স্টেনগান, উদ্ভট উটের পিঠে আরূঢ় বাংলাদেশে কিংবা সাইপ্রেস ছাড়িয়ে সুদূর নীলিমায়। আর, এভাবে দেয়ালে ঝোলানো জড় এক ব্লেজারের অভিনব মানস-সন্তরণকে উপলক্ষ করে কবি তাঁর অবচেতন কল্পনার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ ঘটান—

কখনো ব্লেজার কৌতূহলে
দ্রুত জেনে নিতে চায় তরুণ রবীন্দ্রনাথ কাদম্বরী দেবীকে কখনো
তীব্র চুমো খেয়েছেন কি না জোড়াসাঁকোর ডাগর অভিজাত পূর্ণিমায়,
নব্য কবিসংঘ কী পুরাণ নিয়ত নির্মাণ করে মেধার কিরণে আর
শীতার্ত পোল্যাণ্ড আজ ধর্মঘটে রুদ্ধ কি না কিংবা কোন
জলাভূমিতে গর্জায়
গেরিলার স্টেনগান, হৃদয়ের মগ্নশিলা, আর্ত চাঁদ
ইত্যাদিও জানা চাই তার।
...
গালিবের জোব্বা,
দিল্লির সূর্যাস্ত যেন, রবীন্দ্রনাথের আলখাল্লা অনুপম,
মৌলনা রুমির খিরকা, বোদলেয়ারের মখমলি
কালো কোট দুলে ওঠে আমার সুনীল ব্লেজারের কাছাকাছি।
('উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ', *উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ*)

পরাবাস্তববাদী কবিরা শব্দ, বাক্য বা চিত্রকল্পের উল্লম্ফন ব্যবহার করে অবচেতনার অসংলগ্ন দৃশ্যগুলোকে একত্রিত করেন। উদ্ধৃত কবিতাংশে সুনীল ব্লেজারের সূত্রে কবির অবচেতনায় ঘটে চলা নানা চিত্রকল্প, নানা দৃশ্যান্তর কবি উল্লম্ফন প্রবাহে অতিক্রম করে গেছেন এবং শেষ স্তবকে কিউবিক পদ্ধতিতে জুড়ে গেছেন পারম্পর্যহীন টুকরো অনুষঙ্গগুলো—গালিবের জোব্বা, রবীন্দ্রনাথের

আলখেল্লা, রুমির খিরকা, বোদলেয়ারের কালো কোট, প্রভৃতি। প্রকৃতই শামসুর রাহমানের অবচেতন সূত্রায়িত হয় 'কিউবিস্ট চিত্রকলার পরাবাস্তব জ্যামিতির মত'। উল্লম্ফনসূত্রেই কবি হঠাৎ আমদানী করেন দু'একটি দুর্বোধ্য, রূপান্তরিত চিত্রকল্প, পরাবাস্তব চিত্রকলায় যেমন লক্ষ করা যায়—'মানুষের মুখগুলি/অতি দ্রুত হয়ে যাচ্ছে শিম্পাঞ্জির মুখ' কিংবা 'উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ'। একথা অনস্বীকার্য যে পরাবাস্তব কবিতা রোমান্টিক কবিতারই উত্তরসূরী, কিন্তু রোমান্টিক কবিতায় পাঠক যে সুর-সঙ্গতির আস্বাদে বিমোহিত হতেন, তাকে ভীষণভাবে ক্ষুণ্ন করে পাঠককে চরম অসঙ্গতির মুখোমুখি করে তোলাই পরাবাস্তব কবিতার শিল্পিতা। পরাবাস্তব কবি এই অসঙ্গতি সৃষ্টি করেন স্বেচ্ছায়—কবির বা কোনো চরিত্রের অবচেতনের উল্লম্ফনকে অবিকৃতভাবে চিত্রণের জন্য। সেখানে চেতনাই নিয়ন্ত্রণ করে কবিতার গতি। কখনো কখনো রোমান্টিক কবিদের মত একটি সমুন্নতিতে পৌঁছে যায় পরাবাস্তব কবিতা, যেমন, উপর্যুক্ত কবিতার সুনীল ব্লেজারটি শেষ পর্যন্ত তাঁর চেতনার সামুহিক অনস্তিত্ব থেকে কল্পনায় ঊর্ধ্বগামী হতে চায়—

নষ্ট হয়ে যাবে
ভেবে মাঝে-মাঝে আঁতকে ওঠে, টুপির মতন ফাঁকা
ভবিষ্যৎ-কল্পনায় মূর্ত হয় কখনো-কখনো,
কবরের অবরুদ্ধ গুহা তাকে চেটেপুটে খাবে
কোনোদিন, ভাবে সে এবং নীল পাখি হয়ে দূর
সিমেট্রিক মিশকালো সাইপ্রেস ছেড়ে পলাশের রক্তাভায়
ব'সে গান গায়।
('উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ', *উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ*)

কিন্তু, পরাবাস্তব কবিতায় সর্বদাই এই সমুন্নতি, উদ্ভাসন বা কল্পনার কোনো একটি শীর্ষবিন্দু নাও থাকতে পারে। বিশেষত, পরাবাস্তবতার উত্তরপর্বে কবিরা এই সমুন্নতি অপেক্ষা অবচেতনের বৈচিত্র্য ও বিক্ষিপ্ততার চিত্রণ ঘটিয়েছেন বেশি। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের আধুনিক কবি ও চিত্রকল্পবাদী কবিদের সাথে পরাবাস্তব কবিদের শিল্পায়ণ কৌশলের পার্থক্যও সূচিত হয় এই সূত্রেই।

পরাবাস্তবতা চেতন-অবচেতনার সংযোগসূত্রে জীবনকে শিল্প আর শিল্পকে জীবনধর্মী করে তোলে। অবাস্তব সব চিত্রকল্পে কবিতাকে চিত্র বা চলচ্চিত্রের মত দৃশ্যমান করে তোলে। বাস্তব জীবনের চালচিত্রের উপর অবচেতনার অসংগতির দৃশ্য বা রূপকে চাপিয়ে দিয়ে পরাবাস্তবতা তৈরি করে তোলে জগৎ ও জীবনের এক ধরনের আপাত অসম্বদ্ধতা, স্বপ্নের সাথে প্রবহমান ধরাছোঁয়ার বাইরে এক স্পর্শাতীত জগতকে প্রত্যক্ষ করে তোলে। বিংশ শতাব্দীর বিশের দশকে পরাবাস্তব কবিতা ছিল অপ্রথাগত শিল্প অর্থাৎ anti-poetry বা anti-literature । ডাডাবাদের

ধারাবাহিকতায় তার উন্মেষ ঘটে। জীবনের সম্পূর্ণ রূপান্তরে বিশ্বাসী ছিলেন পরাবাস্তব কবিগণ। শিল্পের একটি সামূহিক পরিবর্তন ছিল তাঁদের কাম্য।

পরাবাস্তব কবিকে সচেতন থাকলে চলে না, বরং তাঁকে থাকতে হবে খানিকটা সম্মোহিত, বিবশ, তরঙ্গায়িত, স্বপ্নালু, মদির-তন্ময়। কারণ, কবিতায় পরাবাস্তবতা সৃষ্টির জন্য কবির প্রয়োজন হয় এক অতিপ্রাকৃত দৃষ্টিশক্তির (supernatural vision) (Fowlie, 1950: 25)। অন্তর্স্বভাবী, স্বতঃস্ফূর্ত এক প্রেক্ষণর প্রয়োজন হয় তাঁর, যেন তিনি শব্দের জাদুময়তার বিস্ময় সৃষ্টি করতে পারেন—যেন মূর্ত-বিমূর্ত মিলে শব্দ-ভাষার আপাত দুর্বোধ্যতা সঞ্চার করতে পারেন কিংবা ভাষাকে অধরা ও নির্ভাররূপে প্রকাশ করতে পারেন। শাসনহীন চেতনার স্বয়ংক্রিয় প্রকাশই পরাবাস্তব চিত্রকল্পের স্বভাব। কবিতায় পরাবাস্তবতা চিত্রণের উদ্দেশ্য চেতন-অবচেতন জগতের মধ্যে সেতুবন্ধ নির্মাণ। তবে, অবচেতনের ভাষ্যমাত্রেই পরাবাস্তব কবিতা নয়; কবির নান্দনিকতা তাঁর অবচেতনের শব্দভাষ্যকে যথাযথ শিল্পিতা প্রদান করে তাঁর নিমগ্ন চৈতন্যের ধারাকে ব্যাহত না করেই।

ব্রেতোঁ পরাবাস্তব চিত্রকল্পগুলোকে বলেছেন 'আফিম চিত্রকল্প' (opium images) যেগুলোর উপর মানুষের নিয়ন্ত্রণ থাকে না বরং আফিম-চিত্রকল্পগুলোই আধিপত্য করে তাদের উপর, সে আবেশ কাটানো তার পক্ষে সম্ভব হয়না—ইচ্ছাশক্তি সেখানে অকার্যকর প্রতিপণ্ন হয় (Breton, 1969: 36)। পরাবাস্তব কবিতার অন্যতম উপাদান এই মায়বী চিত্রকল্পগুলোর স্বতঃস্ফূর্ত উৎসারণ। মূলত এগুলোই কবির সম্মোহিত চৈতন্য প্রকাশের একমাত্র অবলম্বন। পরাবাস্তব চিত্রকল্পগুলো অতিপ্রাকৃত,অতিবাস্তব, অলীক, সংবেদী, সচল এবং খাপছাড়াও। শামসুর রাহমানের এ পর্যায়ের কাব্যে এরূপ সংবেদী বিচ্ছিন্ন চিত্রকল্প কিংবা চিত্রকল্পগুচ্ছের দৃষ্টান্ত অসংখ্য। যেমন :

ক. সন্ধ্যার খালুই থেকে লাফিয়ে উঠেছে চাঁদ দূরে
বহুদূরে
('সন্ধ্যার খালুই থেকে', *কবিতার সঙ্গে গেরস্থালি*)

খ. গোর-খোদকের শক্ত হাতে
হঠাৎ লাফিয়ে ওঠে গন্ধরাজ, মাধুর্যে সুস্মিতা,
তুমি কি আসবে ফের সান্নিধ্যে আমার?
('তুমি কি আসবে ফের', *উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ*)

গ. অকস্মাৎ
একরাশ গন্ধরাজ কাঠ
দীর্ণ ক'রে প্রস্ফুটিত দেরাজের ভেতরে। খরগোশ
কোমল তাকায় ক্যালেন্ডারের রঙিন
তরুণীর দিকে

আমার টেবিলে ব'সে। কবেকার লাল ঝরাপাতা
চমৎকার উড়ে আসে খাতার পাতায়,
মিশে যায় যুবতীর ডাগর স্তনের
কিশমিশ, বেলা-পড়ে-আসা সান্দ্র প্রহরে আহত
টিয়ের পালক আর আস্তিনের ঘ্রাণসহ নেভিব্লু কালিতে।
('আশি দশকের পদাবলী', *কবিতার সঙ্গে গেরস্থালি*)

চিত্রকল্পগুলো অধিকাংশক্ষেত্রে জটিল, দ্বান্দ্বিক, অপ্রত্যক্ষ, ছদ্মবেশী, বিমূর্তস্বভাবী, বাস্তব জগতের বিকৃত অবয়বে মূর্ত। পরাবাস্তব চিত্রকল্প সমপর্কে ব্রেতোঁ বলেছিলেন—

> the image is a pure creation of the mind. It cannot be born from a comparison but it from a juxtaposition of two more or less distant realities. The more relationship between the two juxtaposed realities is distant and true, the stronger the image will be– the greater it's emotional power and poetic reality… (Breton, 1969: 20)|

অর্থাৎ, পরাবাস্তব চিত্রকল্প কবির অন্তর্লোক-উদ্গাত বিশুদ্ধ সৃষ্টি। কোনো তুলনাসূত্রে এর জন্ম নয় বরং স্বল্প বা দূরসম্পর্কিত দু'টি বাস্তবতার উল্লম্ফনসূত্রে এর উদ্ভব হয়। আবেগের গভীরতা ও কাব্যিক বাস্তবতা যত বেশি হবে চিত্রকল্প ততই অন্তর্গাঢ় হবে। যেহেতু প্রচলিত চিত্রকল্পের তুলনা প্রবণতা এখানে অপরিহার্য নয়, ফলে, চিত্রকল্পমালা (imagery) এবং উল্লম্ফনধর্মিতা পরাবাস্তব কবিদের অন্যতম বয়ান-কৌশল—যা দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন বাস্তবতাকে জোড়া দিয়ে-দিয়ে কবি তার অবচেতনার কোলাজ রচনা করে যান। শামসুর রাহমানের এ পর্বের কবিতায় সে রূপদক্ষতার দৃষ্টান্ত দুর্লক্ষ নয়। যেমন :

করি ঘষামাজা
পঙ্‌ক্তিমালা কবিতায়, জানালায় মেফিস্টোফিলিস
হাসে, পা দোলায় ঘনঘন, তার উত্তোলিত ভুরু
সর্বক্ষণ জপে মৃত্যু, কখনো-বা হঠাৎ দাঁড়িয়ে
আমাকে তত্ত্ব শোনায় রাশি রাশি। ভেনাসের ঊরু
অকস্মাৎ উদ্ভাসিত কিংবা প্ল্যাটো দিলেন বাড়িয়ে

তাঁর মগজের কোষে-কোষে। বেহুলা কখন
আসে লখিন্দরময় ভেলা নিয়ে খলখলে জলে,
নিজেই বিস্মিত হই। চিত্রকল্প যখন-তখন
নেচে ওঠে চতুষ্পার্শে, দেয়ালের থেকে কত ছলে
হঠাৎ বেরিয়ে আসে চিত্রমালা, শূন্য থেকে আসে,
যেমন মেঘের পরে মেঘ জমে।
('কবির ডায়েরি', *প্রতিদিন ঘরহীন ঘরে*)

প্রকৃতপক্ষে, অসংখ্য বৈপরীত্যকে এক সুতোয় গাঁথার ক্ষেত্রে উল্লম্ফন এক অপূর্ব কৌশল। ফলে, মেফিস্টোফিলিস, ভেনাস, প্লেটো, বেহুলার মত দূরসম্পর্কিত একেকটি চরিত্রের অযৌক্তিক

কার্যকলাপ, যেগুলো কবির অবচেতনায় বাস্তবাতীত সত্যে বিরাজ করে, সেগুলোকে যূথবদ্ধ করার নান্দনিকতায় কবির অবলম্বন করেন চিত্রমালা ও চিত্রকল্পের লাগামহীন উল্লম্ফন। উদ্ধৃত কবিতাংশের শেষ ক'টি পঙ্‌ক্তিতে কবি সচেতনভাবে তাঁর সেই এলোমেলো অলীক চিত্রকল্পের উৎসের কথা ব্যক্ত করেছেন তুলনাসূত্রে। কবি তাঁর অবচেতন স্রোতের নানা বিভঙ্গকে একত্রিত করেন এই পদ্ধতিতে। যেমন, মধ্যরাতে কবির কবিতা বিদ্ধ যেসাসের মত ঝুলে থাকে কলোনির ফ্ল্যাট থেকে, কখনো কবির টেবিল, দেরাজ, ঘর ভরে যায় বিচিত্র অতিবাস্তব যত ক্রিয়াকলাপে—জড়বস্তুরা জেগে উঠে নড়াচড়া করে—মধ্যরাতে ফুটপাতে ব্যাকুল হয়ে ডেকে ওঠে আশির দশকের পদাবলী।

তৃতীয় পর্বের কবিতায় শামসুর রাহমান স্বপ্ন-অবচেতনার প্রতিফলনের সাথে-সাথে মিথ-প্রতীক ও প্রতিরূপকের মাধ্যমে তাঁর আত্মতাকে (persona) উপস্থাপন করেন বিচিত্রভাবে। আত্মতার উপস্থাপনে কবির এ পর্যায়ের মিথ-চিত্রণ অনেকটা লিরিক-স্বভাবী। মূলত, তা মিথ-কথনের সূত্রে কবির স্বগতকথনেরই প্রয়াস। সমালোচক যথার্থই বলেন, '' তাঁর কবিতার বিষয়ভাবনায় পুরাণকাঠামো বা mythical way পদ্ধতিটি ব্যবহারে এলিয়টীয় টেকনিকচর্যা নেই। বরং আছে রোম্যান্টিক কবিতার মত কল্পোক্তি করার আঙ্গিক (আকতার, ২০১৪: ৩০)। 'ইকারুসের আকাশ' অমরত্বের বাসনায় কবির শিল্পিত চেতনার দুর্গম অভিযাত্রার মিথ-ভাষ্য। 'ডেডেলাস' কবিতায় ডেডেলাসের পিতৃ-সত্তা ও শিল্প-সত্তার দ্বৈরথে শিল্পের চিরঞ্জীবিতা কবির নিজেরই নন্দন-দর্শন। 'ট্যান্টালাস' কবিতায় ট্যান্টালাসের অভিশপ্ত জীবনে প্রতিস্থাপিত হয় কবির যন্ত্রণাকাতর শিল্প-চৈতন্য। 'চাঁদ-সদাগরে' দেশ-কাল-সংক্ষুব্ধতায় বাংলার প্রাকৃত-মিথের সমান্তর করে তোলেন কবি তাঁর যুযুৎসা-ক্লান্ত অথচ পরাভব-বিমুখ ক্ষমাহীন জিজীবিষু শিল্প-সত্তাকে। 'ইলেক্ট্রার গানে' অ্যাগামেমনন-তনয়ার শোক-সংকট-সংকল্পের মধ্য দিয়ে কবি ৭৫'এর জাতির-জনকের বর্বরোচিত হত্যার দুঃসহ স্মৃতিতে তাঁরই আত্মিক বেদনার অনুভব ব্যক্ত করেন, বিলাপের মত করে।

কবির চেতনাকে মিথ বা প্রতিরূপকের মত কোন ভিন্ন রূপ বহিরাশ্রয়ে প্রতিস্থাপন করে সমরূপতা সৃষ্টি একটি শ্রমসাধ্য শিল্পবিন্যাস। মিথ-কথার মোড়কে কবির সত্তাকে প্রবিষ্ট করে একটি অদ্বৈত চেতনার উৎসারণ ঘটানোর মত জটিল অন্তর্বয়ন রীতি প্রতীকবাদী কবিদের প্রিয় কৌশল ছিল। শামসুর রাহমান পূর্বাপর মিথ ও প্রতীক-প্রিয় কবি। এ পর্যায়ে মিথের একেকটি চরিত্রকে কবি তাঁরই অপ্রতিদ্বন্দ্বী চেতনার প্রতিনিধিরূপে পুনঃসৃজন করেন। *ইকারুসের আকাশ* কাব্যের নাম কবিতায় আমৃত্যু শিল্পজীবী, সূর্যাভিসারী কবি তাঁর বহ্নুন্মুখ যাত্রার আত্ম-প্রতীকায়নে অবলম্বন করেছেন ভীষণ

অদম্য অথচ পতনপ্রবণ ইকারুসের ট্রাজিক মিথকে। গ্রিক মিথে ডেডেলাস ছিল এক কুশলী কর্মকার ও শিল্পী। দেবী এথেনা নিজে তাঁকে দীক্ষা দিয়েছিলেন। ডেডেলাসের পুত্রই ইকারুস, যার ধমনীতে প্রবাহিত শিল্পীর শোণিত। মাইনস রাজার নির্দেশে কারাভোগের পর ডেডেলাস পুত্রকে নিয়ে ক্রিট দেশ থেকে অন্য কোথাও পালিয়ে যাওয়ার অভিপ্রায়ে পাখির পালকের দুই জোড়া পাখা তৈরি করেন। ইকারুসের ডানাগুলো তার কাঁধের সাথে মোম দিয়ে জোড়া দেয়া ছিল। নীলিমায় গা-ভাসানোর পূর্বেই ডেডেলাস ইকারুসকে সতর্ক করে দেয় যে, সে যেন খুব উপরে কিংবা খুব নিচে কখনো না যায়। তাতে সূর্যের তাপে তার পাখার মোম গলে যাবে অথবা ডানাগুলো ভিজে যাবে জলে। কিন্তু ঊর্ধ্বাকাশের বায়ুমণ্ডল ভেদ করে ইকারুস যতই উপরে উঠতে থাকে, এক অননুভূতপূর্ব আনন্দের মত্ততা ততই পুলকিত ও বিভ্রান্ত করে তোলে তাঁকে। সূর্য-বহ্নি-মুগ্ধ ইকারুস সেই মুহূর্তে ভুলে যায় পিতার নিষেধ। উড়ে চলে সেই প্রদীপ্ত রশ্মির সম্মোহনে। সূর্যের আগুনের অমেয় তেজে গলে যায় ইকারুসের পাখার মোম। শূন্য থেকে সমুদ্রে পতিত হয় সেই মুগ্ধ বালক। সমুদ্রে ভেসে ওঠে ইকারুসের নিথর দেহ (সুধাংশু, ১৯৬০, ৩৪০-৩৪১)। ডেডেলাস-তনয় ইকারুস উত্তরাধিকারসূত্রে তার পিতার সংতরাশ সত্তার অধিকারী ছিল কিনা, সেকথা পুরাণে উল্লেখিত নেই। কিন্তু, সূর্যের দীপ্তিময় রশ্মির সম্মোহনে পিতার নিষেধ ভুলে সেই লক্ষ্যে ইকারুসের এই উড্ডয়ন আধুনিক কবির কাছে তাঁর আমৃত্যু আত্মবিনাশী শিল্প-সাধনার যথার্থ প্রতীক হয়ে ওঠে। যুগে-যুগে মহৎ কবিরা তাঁদের পতনের সম্ভাবনা ভুলে এভাবেই সূর্যকে তাঁদের অভীষ্ট গন্তব্য বলে জেনে ইকারুসের মত অভিযাত্রী হয়েছেন শিল্পের পথে । মহাকাশে জ্যোতির্ময় সূর্য তাঁদের সেই সাধনার উৎকর্ষ-বিন্দু। এ কবিতায় পিতা ডেডেলাস পূর্বসূরী কবিদের প্রতিনিধি। কবি পারতেন সেই ধীমান পিতার নিষেধ মেনে জলপাই, বৃষমাংস আর মদিরার সহজ আকর্ষণে প্রলুব্ধ হতে—পারতেন নিরুদ্বেগ, ভাবনাহীন জীবনে সহজেই অভ্যস্ত হতে। কিন্তু, জীবনের হাতছানি উপেক্ষা করে তিনি শুরুতেই বেছে নিয়েছিলেন তাঁর কাঙ্ক্ষিত গন্তব্য। সেই প্রথম কবিতায় ল্যাজারস-কবি দু'টুকরো রুটির নিরিবিলি ভোজ আর রূপালি-স্নানকে উপেক্ষা করে তাঁর গন্তব্য নির্ধারণ করে নিয়েছিলেন। গোঁড়াতেই নিষেধের তর্জনী উদ্যত ছিল, অনেক বেনামী প্রেত আর শকুনের কর্কশ আওয়াজে নিজের নিশ্চিত বিনাশী পরিণাম জেনেও কবি প্রবল উড়ে চলেন শিল্পের সৌরকরোজ্জ্বল অম্বরে—পরিণামকে তুচ্ছ ভেবে প্রবল কেন্দ্রাতিগ টানে আমৃত্যু সূর্যের অভিমুখে উড়ে চলবার অভিপ্রায়ে। অমরত্ব আকাঙ্ক্ষী সৃজনশীল কবির কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যের প্রতীক ওই সূর্য। ডব্লিউ.বি.ইয়েটস তাঁর 'মিউজ দে বজার্ট' কবিতায় মৃত্যুঞ্জয়ী কবিদের জীবনব্যাপী সাধনার অসহনীয় ক্লেশ ও তাঁদের অভ্রান্ত পরিণামকে ব্যক্ত করতে ইকারুসের মিথের অবতারনা করেছিলেন তাঁর কবিতায়—

About suffering they were never wrong,
The Old Masters;

…

In Brueghel's Icarus for instance: how everything turns away
Quite leisurely from the disaster; the ploughman may
Have heard the splash, the sun shone
As it had to on the white legs disappearing into the green
Water; and the expensive delicate ship that must have seen
Something amaizing, a boy failed out of the sky,
Had somewhere to get to and sailed calmly on.

(Mendelson, 1979: 79-80)

ইয়েটস তাঁর কবিতায় অত্যন্ত নিরাসক্তভাবে উপস্থাপন করেন ইকারুসের সেই পতনদৃশ্যটি। ইকারুস যখন আকাশ থেকে খসে সমুদ্রে পতিত হয়, তখন অদূরে কোনো চাষী হয়ত তার পতনের শব্দে উৎকর্ণ হয় মাত্র। সূর্য নির্বিকারভাবে তার পদযুগলকে প্রশস্ত করে দেয় সমুদ্রের জলে আর দূরগামী কোনো অভিজাত জাহাজ আকাশ থেকে কোনো বালককে পতিত হতে দেখে মুহূর্তের জন্য বিস্মিত হয়ে আবার ধীরে পাল তুলে যাত্রা করে সামনের দিকে। শামসুর রাহমান তাঁর *ইকারুসের আকাশ* কাব্যের মূল মিথ প্রতিমাটি গ্রহণ করেছিলেন অডেনের এই কবিতা থেকে, এ কথা তিনি নিজেই স্বীকার করেন (মন্‌জুরুল, ২০০৮: ১৪৩) কিন্তু, ইয়েটসের মত নৈর্ব্যক্তিক, নিরাসক্ত নয় কবির ভাষ্য। কবি তাঁর নিজস্ব সত্তাকে পরম মমতায় প্রতিস্থাপন করেছেন ইকারুসের মিথ-প্রতিমায় আবেগপ্রবণ শব্দ-ভাষায়, গীতমর্মরে। কবি তাঁর নিজের সৌন্দর্য-পিপাসার আকাঙ্ক্ষাকে প্রত্যক্ষ করেছেন ইকারুসের রক্ষাকবচবিহীন দ্বিধাহীন উড্ডয়নে। অকাল অবলুপ্তির বিনিময়ে কবি তাঁর নিজের অমরত্বের বাসনাকে স্পন্দিত হতে শুনেছেন পতনোন্মুখ ইকারুসের মৃত্যুঞ্জয়ী স্বপ্নিল অন্তরে—

কখনো মৃত্যুর আগে মানুষ জানে না
নিজের কী-ইবা পরিণতি। পালকের ভাঁজে
সর্বনাশ নিতেছে নিঃশ্বাস
জেনেও নিয়েছি বেছে অসম্ভব উত্তপ্ত বলয়
পাখা মেলবার, যদি আমি এড়িয়ে ঝুঁকির আঁচ
নিরাপদ নিচে উড়ে-উড়ে গন্তব্যে যেতাম পৌঁছে
তবে কি আমার নাম স্মৃতির মতন
কখনো উঠত বেজে রৌদ্রময় পথে জ্যোৎস্নালোকে
চারণের নৈসর্গিক, স্বপ্নজীবী সান্দ্র উচ্চারণে ?
সমগ্র জাতির কোনো কাজে লাগবে না
এই বলিদান, শুধু অভীপ্সার ক্ষণিকের গান
গেলাম নিভৃতে রেখে ঝাঁ ঝাঁ শূন্যতায়।
অর্জন করেছি আমি অকাল বিলুপ্তির বিনিময়ে
সবার কীর্তনযোগ্য গাথা,
যেহেতু স্বেচ্ছায় '

করেছি অমোঘ নির্বাচন
ব্যাপ্ত, জ্বলজ্বলে ক্ষমাহীন রুদ্র নিজস্ব আকাশ।
('ইকারুসের আকাশ', *ইকারুসের আকাশ*)

একথা সর্বজন স্বীকৃত যে, কবির শিল্প-অভিসারী মনে 'বিত্তের ঝলসানি', 'রমণীর ভালোবাসা'—সবকিছুর ঊর্ধ্বে বিরাজ করে এক অন্তহীন 'শব্দ-তৃষা'। কবিতার সাথে তাঁর জীবন-মৃত্যু-অমরত্বের শাশ্বত সম্বন্ধ। তাই, মৃত্যুর বিনিময়ে তিনি বেছে নেন তাঁর 'ব্যাপ্ত, জ্বলজ্বলে ক্ষমাহীন রুদ্র আকাশ'। 'ইকারুসের আকাশে'র অনুষঙ্গী আরেকটি কবিতা 'ডেডেলাসে' পিতা ডেডেলাসের হৃদয়ে পুত্র হারানোর আক্ষেপ ছাপিয়ে শেষ পর্যন্ত জয়ী হয় শিল্পের শাশ্বত ভুবনে তাঁর পুত্রের মৃত্যুঞ্জয়ী সত্তার অধিষ্ঠনের গৌরব। ডেডেলাস নিজেও একজন শিল্পী। সে অনুভব করতে পারে শিল্পের ক্ষেত্রে জীবনের চেয়ে অমরত্বের মূল্য অধিক। যখন আকাশের বিপদ সীমা পেরিয়ে ব্যগ্র, অস্থির, উজ্জ্বল তাঁর পুত্র উড়ে চলেছিল শিল্পের ভরসায়, প্রকৃত শিল্পীর মত মুগ্ধ ডানা মেলে বিপদকে ভ্রূকুটি করে, তখন ডেডেলাস শঙ্কিত অথচ মুগ্ধ নয়নে চেয়ে ছিল নির্বাক তাঁর তরুণ পুত্রের মুখের দিকে। যদিও সেই মৃত পুত্রের স্মৃতি অহর্নিশ তার চেতনায় মোমের মত গলে-গলে ঝরে, তবু পিতৃ-সত্তা সান্ত্বনা পায় শিল্পের সেই অমৃত উচ্চারণে—

পিতা আমি, তাই সন্তানের আসন্ন বিলয় জেনে
শোকবিদ্ধ, অগ্নিদগ্ধ পাখির মতন দিশেহারা ;
শিল্পী আমি, তাই তরুণের সাহসের ভস্ম আজ
মৃত্যুঞ্জয় নান্দনিক সঞ্চয় আমার।
('ডেডেলাস', *ইকারুসের আকাশ*)

ল্যাজারস, ইকারুসের পর গ্রিক পুরাণের শাপভ্রষ্ট ট্যান্টালাসের 'ট্র্যাজিক সাফারিংসে'র কাহিনিতে কবি সংবাহিত করেছেন তাঁর যন্ত্রণাময় শিল্প-অনুভবকে। *বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখের* ট্যান্টালাস' কবিতায় গ্রিক পুরাণের দেব-বিদ্রোহী ট্যান্টালাসের অভিশপ্ত জীবনের অনিঃশেষ হাহাকার আর কবির জীবনব্যাপী শিল্পিত যন্ত্রণার নিয়তি—এই দুই অবিচ্ছেদ্য হয়ে ওঠে অসাধারণ নান্দনিক মিথস্ক্রিয়ায়। গ্রিক পুরাণে জিউস-পুত্র ট্যান্টালাস একবার দেবতাদের উদ্দেশ্যে ভোজ-সভার আয়োজন করেন। দেবতারা যেন নিন্দিত ও পতিত হয়, সেই উদ্দেশ্য ট্যান্টালাস তাঁর ঔরসজাত আপন পুত্রকে রান্না করে দেবতাদের সামনে পরিবেশন করেন। দেবতারা তাঁর অভিসন্ধি বুঝতে পারে এবং দেবরাজ জিউস শাস্তিস্বরূপ তাঁকে নিক্ষেপ করেন পাতালের একটি নিঃসঙ্গ জলাশয়ে।হ্রদের জল স্বচ্ছ, সুপেয়। ফলভার নত বৃক্ষ-শাখা ঝুলে থাকে হ্রদের জলে—হাত বাড়ালেই সে ফল ট্যান্টালাসের করতলগত হওয়ার কথা। অথচ, ভীষণ তৃষ্ণার্ত ট্যান্টালাস জলের দিকে আঁজলা বাড়ালে জল শুকিয়ে যায়, ক্ষুধার্ত হয়ে ফলের দিকে হাত বাড়ালে ফল চলে যায় নাগালের বাইরে। মৃত্যুও যেন প্রতিহত করে তাকে।

দেবতার অভিশাপে জীবনভর ক্ষুধা-তৃষ্ণার বিপরীতে এই মরীচিকার পিছনে ছুটে চলাই ছিল ট্যান্টালাসের নিয়তি। শামসুর রাহমান তাঁর 'ট্যান্টালাস' কবিতায় ট্যান্টালাসের মতই শুষ্ক, কাতর সত্তা নিয়ে জলাশয়ের দিকে, বৃক্ষশাখার পানে উদ্বাহু। নিজেকে তাঁর ট্যান্টালাসের মতই শাপভ্রষ্ট ও পতিত মনে হয় কোনো শিল্পের 'পুশিদা' জলাশয়ে। জীবনব্যাপী কবির নিঃসঙ্গ অস্তিত্বের ক্ষমাহীন যুদ্ধকে তিনি সমান্তর করে তোলেন ট্যান্টালাসের অপ্রতিরোধ্য নিয়তির বাস্তবতার সাথে—

দাঁড়িয়ে রয়েছি তীরে একা
সেই কবে থেকে, পদযুগ ভেজা খুব, ফুটিফাটা
পথ সারা বুক, ওষ্ঠে কেবল শুকোয় রক্তধারা।
ভীষণ তৃষিত চোখে জলাশয় ; শুধু জলাশয়
নাচে নক্ষত্রের মতো। কী কাতর অস্তিত্ব আমার!
আমার অনেক দীর্ঘশ্বাস, অনিদ্রার রক্তজবা
করেছি অর্পণ এই জল-দর্পণে। বহুক্ষণ
ঝুঁকে থাকি নিস্পলক, কখনো দাঁড়াই, ফিরে আসি
পুনরায়, তীরবর্তী ফল ছুঁতে গিয়ে দেখি ওরা

লাফিয়ে শতেক দূরে স'রে যায়। আমার যন্ত্রণা
দেখে-দেখে পানি আসে গাছের পাতার চোখে আর
কুঞ্চিত ফলের চোখ, পাথরের নিচে শত কীট
ভীষণ শিউরে ওঠে। ওষ্ঠ রাখি জলাশয়ে, তবু
পারি না করতে পান এক বিন্দু জলও। বার বার
এরকম প্রতিহত হব আমিড়এই তো নিয়তি।
('ট্যান্টালাস', *বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে*)

'চাঁদ সদাগর' কবিতায়ও কবির ব্যক্তিগত জীবন, শিল্প-অন্বেষার দুর্গম, জটিল দুঃসাহসী অভিযাত্রা প্রতিরূপকান্বিত হয়েছে দেশ-কালের দ্বান্দ্বিক, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে। অজ্ঞতা, অন্ধতা আর প্রতিহিংসা পরায়ণ পুরাণ-প্রতিমা মনসা শামসুর রাহমানের কবিতায় পরিণত হয় উপদ্রুত বাংলার সমসাময়িক নানা রাজনৈতিক-সামাজিক অপশক্তির রূপক চারিত্র্য আর সেই বাস্তবতায় কবির আত্মতা (persona) সঞ্চারিত হয় মনসার চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী অনম্য, অপরাজিত পুরুষ চাঁদ সদাগর চরিত্রে। সর্পাকীর্ণ চম্পক নগর সমগ্র বাংলার প্রতিরূপক হয়ে ওঠে 'চাঁদ-সদাগর' কবিতায়। তবে, সে নতুন সর্পিল জনপদ চম্পক নগরের মত বাহ্যত সর্প-উপদ্রুত নয়। ভীষণ নৈরাজ্যে, নানা দেশীয় অপশক্তির কুটিল মন্ত্রণায়, স্বার্থ হাসিলের ষড়যন্ত্রে বাংলার পথ-ঘাট-জনজীবন রূপকার্থে সর্পিল ও সন্ত্রাস-তাড়িত হয়ে ওঠে—''এমনকি প্রত্যেকের মগজের কোষে-কোষে দোলে ফণা, নিত্য দিন-দুপুরেই পথিক লুণ্ঠিত হয় জনাকীর্ণ চৌরাস্তায়''। কবির রূপকায়িত শব্দ-ভাষ্যে অপ্রত্যক্ষ থাকে না ৭৫' পরবর্তী বাংলার দৈনন্দিন চিত্রপট—

সৎ অসতের ভেদাভেদ লুপ্ত, মিথ্যার কিরীট
বড় বেশি ঝলসিত দিকে-দিকে, লাঞ্ছিত, উদ্ভ্রান্ত
সত্য গেছে বনবাসে। বিদ্বানেরা ক্লিন্ন ভিক্ষাজীবী,
অতিশয় কৃপালোভী প্রতাপশালীর। নব্য কত
ক্রোড়পতি করে ক্রয় সাফল্যের অন্দর বাগান,
দরিদ্র অধিকতর দরিদ্র হবার ফাঁদে প'ড়ে
কাঁদে, করে করাঘাত দিনরাত সন্ত্রস্ত কপালে,
নীতির বালাই নেই, ঔদার্য, মহত্ত্ব ইত্যাদির
কানাকড়ি মূল্য নেই আর। আদর্শ বিনষ্ট ফল
যেন, নর্দমায় যাচ্ছে ভেসে ; মতিভ্রম স্ফীতোদর
সফল বণিক, নগ্ন ক্ষমতার লড়াই চৌদিকে
উন্মুখর ভয়ঙ্কর উৎসবের মতো আর দ্বৈত
শাসনের খাঁড়া ঝোলে দিনরাত মাথার ওপরে।
আন্ধার প্রথার কাছে আনুগত্য করেছে স্বীকার
স্বেচ্ছায় সবাই প্রায়, অদ্ভুত আচার, কুসংস্কার
মেলেছে অদৃশ্য ছাতা সুবিশাল, শিবিরে শিবিরে
ভীষণ বিভক্ত আজ বিপন্ন মানুষ।

('চাঁদ সদাগর', *উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ*)

৭৫' পরবর্তী সময়ে নব গঠিত স্বাধীন দেশে আততায়ীদের হাতে জাতির জনককের নির্মম হত্যা সংঘটনের পরের স্বৈরশাসনের কালটি প্রকৃতই বাংলাদেশের জন্য এক মাৎস্যন্যায়ের কাল। যখন নিহত জনক অ্যাগামেমনন কবরে শায়িত', তখন গণতন্ত্র নির্বাসিত; পথে-ঘাটে নির্বিকার ত্রাসের রাজত্ব। নতুন পুঁজিবাদী সমাজে এখানে-ওখানে শ্রেণীবৈষম্যের নানা নগ্ন হিত্র ছড়ানো-ছিটানো পড়ে থাকে। রাতারাতি বিত্ত লাভের আশায় উগ্র, অন্ধ, অনৈতিক প্রতিযোগিতায় মত্ত তখন অনেকেই। সাধারণ মানুষের স্বপ্নভঙ্গ, হতাশা, নিরুপায় ক্লীবত্ব আর ধর্মান্ধতার অন্ধকারে নিমজ্জিত হয় দেশ। ক্ষমতাসীন, বিত্তশালীদের মদদপুষ্টদের বিক্ষিপ্ত বিচরণে আবারো তছনছ হয় 'শিল্পের কমলবন'। 'চাঁদ সদাগর' কবিতায় চম্পক নগরের একশীর্ষ, বহুশীর্ষ নাগ প্রকৃতপক্ষে সমকালীন বাংলার এইসব হিংস্র, অসৎ, স্বার্থান্বেষী, শোষক, চাটুকার, মধ্যসত্ত্বভোগী, শিক্ষিত ভিক্ষাজীবীদের প্রতিনিধি। চম্পক নগরের প্রবল অন্ধকারাচ্ছন্ন সমাজ জ্ঞানহীন, অন্ধ আচার, কুসংস্কারের কাছে ভীষণ নত আমাদেরই সমাজের প্রতিরূপ। চম্পক নগরের মূর্খ আর বিপ্লবী মানুষের দ্বন্দ্বের অদ্বৈত প্রতীক হয়ে ওঠে রাজনৈতিকভাবে দ্বিধাগ্রস্ত বাংলার মানস। এই বাহ্যিক ও অন্তর্গত যুদ্ধে আপাত ধ্বস্ত, সর্বস্বশান্ত অথচ প্রবল সংগ্রামী, আপোষহীন চাঁদ বণিক আসলে নানা আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক বাস্তবতায় বিপর্যস্ত অথচ আমৃত্যু প্রত্যয়ী কবির পৌরাণিক প্রতিভূ হয়ে ওঠে। সমূহ সর্বনাশ সত্ত্বেও চাঁদ সদাগরের মুখে যে প্রবল আত্মপ্রত্যয়, দেশপ্রেম ও নতুন উদ্যমে সমাজ-গঠনের অমিত প্রত্যয় ব্যক্ত হয়, তা পুনরায় স্বপ্নবান, উদ্যমী, দেশ-প্রেমিক কবিরই আত্মিক সংকল্প—

লাঠি আছে হাতে, আছে
ধমনিতে পৌরুষের কিছু তেজ, যতদিন ঠোঁটে
আমার মুহূর্তগুলি ঈষৎ স্পন্দিত হবে, চোখে
নিমেষে উঠবে ভেসে কোনো শোভাযাত্রার মশাল,
করব না আন্ধারের বশ্যতা স্বীকার ততদিন,
যতই দেখাক ভয় একশীর্ষ, বহুশীর্ষ নাগ,
ভিটায় গজাক পরগাছা বারংবার, পুনরায়
ডিঙার বহর ডোবে ডুবুক ডহরে শতবার,
গাঙুড়ের জলে ফের যাক ভেসে লক্ষ লখিন্দর।
('চাঁদ সদাগর', *উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ*)

প্রকৃতই ''শামসুর রাহমানের এ পুরাণ-প্রতীতিজাত জীবন আসলে একটি অবরুদ্ধ, নির্বাক, অশুভ শক্তির শাসনামলে ক্রান্তিকালের বাংলাদেশের মানুষের বাকরুদ্ধ উচ্চারণ''(বায়তুল্লাহ্, ২০১০: ১৫৭)। এ পর্যায়ের কবিতায় কবির সেসব বিবিক্তির কিছু ব্যক্ত হয়েছে পরাবাস্তব চিত্রণে, কিছু প্রকাশিত হয়েছে মিথ-প্রতীক-প্রতিরূপকের আশ্রয়ে।

শামসুর রাহমানের কবিতায় যৌনতা পূর্ব থেকেই স্বীকৃত। 'লালচক্ষু তৃষিত কোকিলে'র মত তিনি আড়চোখে দেখে নেন মৃত বন্ধুর রোরুদ্যমানা স্ত্রীর 'ব্লাউজ-উপচে-পড়া কম্প্রমান স্তন', এমনকি ভিখারীর নগ্নতাকেও। পরস্ত্রীর সাথে সংগম করে ঘেমে নেয়ে উঠতে পারেন তিনি। অবদমিত কাম অথবা প্রত্যক্ষ কামনার স্বীকারোক্তিতে কবি অকপট প্রথম থেকেই। প্রকৃতই এইসব কবিতা লিখে শামসুর রাহমান ''চিন্তার কতগুলো আড়ষ্টতা ভেঙে দিয়েছেন; কয়েকটি দেয়াল সবল হাতে চুরমার করে দিয়েছেন''(রশীদ, ২০০৬: ৬৭), যা রোমান্টিক প্রেমের বিরুদ্ধে ত্রিশোত্তর কবিদের বিদ্রোহকে স্বীকৃতি দিয়েও আরো বহুদূর পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যায় প্রেম ও যৌনতাকে । দেহ ও মনকে কবি কখনোই বিচ্ছিন্ন ভাবেননি । বরং, শরীরী প্রেম সম্পর্কে ত্রিশোত্তর কবিদের যে সচেতন বিদ্রোহ ছিল তা অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই প্রতিষ্ঠা অর্জন করে শামসুর রাহমানের কবিতায়। কখনো কখনো শরীরী প্রেম সম্পর্কে কবি বিশ্লেষণপ্রবণ। কবির বিশ্লেষণে সংগম-কাল নর-নারীর এক আত্মবিস্মৃতির মুহূর্ত। সঙ্গম শেষে দ্বিখণ্ডিত সেতুর ন্যায় তারা অবিন্যস্ত পড়ে থাকে পাশাপাশি অথচ সুবিন্যস্ত রয় তাদের প্রেম। প্রেমের জৈব-তৃষ্ণা ও অন্তর্গত এষণার অভিন্নতাকে কবি এভাবেই বিধ্বস্ত সেতুর চিত্রকল্পে ব্যক্ত করেন। মূলত, নাগরিক প্রেমের নানা মাত্রাকেই কবি অভিজ্ঞতাসূত্রে প্রকাশ করেন নানাভাবে। যেমন 'তাঁর চোখে আমি' কবিতায় তিনি অবলম্বন করেন কোনো নাগরিক রমণীর পরিণত প্রেক্ষণ, যিনি হয়ত কবি-পত্নীরই প্রচ্ছায়া। এই কবিতায় রমণীর আত্মকথনে কবি বয়ান করেছেন নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবনের খাপছাড়া দাম্পত্য, যেখানে সংগম শেষে শরীর পড়ে রয় অবিন্যস্ত, অথচ সে অভ্যস্ত প্রেম

একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায় না। দাম্পত্য বিচ্ছিন্নতায় অভ্যস্ত হয়ে যাওয়া নাগরিক নারীর যৌনতা ও প্রেমের জটিল অনুভবকে কবি উন্মোচিত করেন মনঃবীক্ষণিক শব্দ-কুশলতায়—

পাশাপাশি শুতে হয়, এটাই তো রীতি চিরদিন ;
আমাকে জড়িয়ে ধ'রে হয়তো সে দিকচিহ্নহীন
কেমন অদৃশ্য পথে ঘোরে ঘুমঘোরে, ভাবে অন্য
কারও কথা. হয়তো আবৃত্তি করে কারুর শরীর। আমিও কি অতি বন্য
স্বপ্নের ঝালর নিয়ে চোখে হুহু শূন্যতায় শুনি আর কার
পদধ্বনি ? তখন দেখলে কেউ আমাদের বলবে, প্রগাঢ়
ছাপ নিয়ে রহস্যের খাটে প'ড়ে আছে দু'টি মৃতদেহ। এমন কন্দর
আড়ালেই থাক; আমি তো বেহুলা নই, সে-ও নয় লখিন্দর।
('তার চোখে আমি', *এক ধরনের অহংকার*)

দাম্পত্য প্রেমের ক্ষয়িষ্ণুতাকে কবি নতুন মাত্রায় উপস্থাপন করেন কবিতায়। তবু এ কথা অসংগত নয় যে, আধুনিক কবিদের মত ক্ষয়িষ্ণু প্রেমের চিত্র অঙ্কন করতে চাননি শামসুর রাহমান। লিলি-ডলু-সুরেশের মত ফাঁপা প্রেমকে উপস্থাপন করতে চাননি । সত্য যে, মাঝে-মাঝে টি.এস.এলিয়টের মত রাহমানও তাঁর 'পারসোনা'কে কোনো চরিত্রের মধ্যে প্রবিষ্ট করে দিয়ে ওই চরিত্রের মনের অবদমিত আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ ঘটিয়েছেন, যেমন পার্কের নিঃসঙ্গ খঞ্জের অচরিতার্থ কামের প্রসঙ্গে কিংবা সূর্যাস্তের ক্রম বিবর্ণতায় অবদমিত কাম তিন বেকার যুবকের 'রাশেদা ভাবীর ম্লান ঠোঁট' কল্পনার প্রসঙ্গে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, প্রথম থেকেই মূলত ব্যক্তিগত প্রেমের চরিতার্থতা-অচরিতার্থতায় নিবদ্ধ কবি। এ পর্যায়ের কাব্যগুলোতে কবি তাঁর প্রেমের জৈবিক-রোমান্টিক নানা সংবেদনার প্রকাশ ঘটিয়েছেন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সূত্রেই। অনেকটা সুধীন্দ্রীয় ধরনে শরীরী প্রেমকে অস্বীকার না করেই সারাক্ষণ প্রেমের একটি রোমান্টিক আচ্ছন্নতার মধ্যে, বিচিত্র অনুভাবনার মধ্যে বাস করেন কবি। দিনপঞ্জির মত করে কবি তাঁর প্রেমের অনুভূতিগুলোর অকপট স্বীকারোক্তি দিয়ে গেছেন। অপেক্ষার প্রহরগুলোকে কবি স্মৃতি ও কল্পনায় সর্বদা উর্বর রেখেছেন। সুধীন্দ্রনাথ প্রেমের ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়বাদী হয়েও শেষ পর্যন্ত স্মৃতি-তাড়িত। ফলে, তাঁর 'ক্ষণিকা' শেষ পর্যন্ত পরিণত হয় 'শাশ্বতী'তে। রাহমানের এ পর্যায়ের প্রেমে স্মৃতি-কাতরতা, কল্পনা-মাধুরী থাকলেও মূলত তিনি শরীর-মন দিয়ে প্রতি মুহূর্তের প্রেমের অভিজ্ঞতাকে উপভোগ করতে চেয়েছেন। স্মৃতির অনুরণন, মিলন-সম্ভোগের মাধুরী-যাপন, বিরহ-বিশ্রম্ভালাপের সমস্ত পর্বগুলো কবি উপভোগ করেন এবং সেসব ব্যক্ত করেন কবিতার শব্দ-বিন্যাসে, নানা সময়ে নানা আঙ্গিকে—চতুর্দশপদে, বাস্তব অথবা পরাবাস্তবের আব্রু খুলে দিয়ে, শব্দ-ভাষার সমান্তরালতায়, চিত্রকল্পে, প্রতিমায়, প্রতীকে, গদ্যছন্দে, স্বাভাবিক ছন্দে, সমিল মাত্রার মেলবন্ধনেও। যদিও ইতঃপূর্বে রাহমানের বিভিন্ন পর্বের নানা বিষয়ের কবিতার নানা নিরীক্ষার উৎকর্ষ তাঁর প্রেমের কবিতার ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায় না , তবে এ কথা অনস্বীকার্য যে প্রেমই তাঁর কবিত্বশক্তির প্রধান

নিয়ামক। ইয়েটসের 'মড' কিংবা আরাগোঁর 'এলসা'র মত দয়িতারা তাঁর বেঁচে থাকার ও লেখার প্রেরণা—কখনো 'স্বরময়ী', 'ধ্বনির প্রতিমা', 'বারংবার ধ্বনিপুঞ্জ'। এ পর্যায়ে চল্লিশোর্ধ কবির প্রেম ভাবনা যেমন পরিণত, তাঁর প্রকাশও তেমনি বৈচিত্র্যময় ও মুখর । প্রেম সম্পর্কিত কবির ব্যক্তিগত নানা জটিল অনুভবের গদ্যময় প্রকাশ ঘটেছে তাঁর উপন্যাসগুলোতে নানা চরিত্রের মধ্য দিয়ে। কবিতার মত উপন্যাসে এবং অধুনা সংগৃহীত কবির ব্যক্তিগত প্রেমপত্রসমুহে তাঁর ব্যক্তিগত প্রেমের গোপন ও অকপট নানা প্রকাশ ঘটেছে। যাপিত জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ের নানা প্রেম—'সনকার আগে' চাঁদ সদাগর কবির গোপন প্রণয়, সনকার সাথে সংসার কিংবা তারও পর আরো প্রণয়ের কথা স্বীকার করেছেন কবি অকপটে। কিন্তু, তাঁর ব্যক্তিগত চিঠিপত্রের সূত্রে এবং উত্তর-চল্লিশ এ পর্যায়ের কবিতায় কবির অদম্য প্রেম ও তার অনিরুদ্ধ, চঞ্চল প্রকাশ-বৈচিত্র্যে এটা স্পষ্ট যে, আশির দশকে কবি উজ্জীবিত হন এক নতুন ব্যক্তিগত প্রেমে, যা তাঁর কবিতাকে করে তোলে প্রেমকথার 'ঋগ্বেদ' আর কবি হয়ে ওঠেন এক মাতাল ঋত্বিক—'' তোমার উদ্দেশে আমি যখন যা করি উচ্চারণ, / সে-ধ্বনি তোমার কানে সকল সময় হোক গান; / মাতাল ঋত্বিক আমি, প্রেমকথা আমার ঋগ্বেদ। শামসুর রাহমান বরাবরই আঙ্গিক-সচেতন কবি। তাঁর এ পর্যায়ের প্রেমের কবিতাগুলো প্রেমানুভবের মৌহর্তিক নানা প্রকাশ সত্ত্বেও নান্দনিক ও বৈচিত্র্যময়।

চিত্রকলার সাথে শামসুর রাহমানের কবিতার সখ্য কারো অবিদিত নয়। এ পর্যায়ের কবিতায় কখনো প্রেমের ক্ষেত্রে কবির বাসনার উদ্দীপক হয় চিত্রকরের আঁকা বিশেষ চিত্র-প্রতিমা। 'ওডেলিস্ক' কবিতায় চিত্রির ক্যানভাসে উৎকীর্ণ নগ্ন ওডেলিস্ককে লক্ষ্য করে কবির মোহন কাম আবর্তিত হয় তার প্রিয়তমার প্রতি। ওডেলিস্ক তুরস্কের এক সুলতানের হারেমে তার ইন্দ্রিয়-সুখের আয়োজনে নিয়োজিত সুন্দরী সেবাদাসী নারী। ঊনবিংশ শতাব্দীতে 'ওরিয়েন্টলিজম' প্রপঞ্চের উত্থানে যখন চিত্রকলায় নগ্নতাকে প্রত্যক্ষ করার আয়োজন চলছিল এবং সেই লক্ষ্যে প্রচুর 'ন্যুড আর্ট' অঙ্কিত হয়, তখন ওডেলিস্ককে মডেল কল্পনা করে অনেক চিত্রশিল্পীই তাঁর নগ্ন-সৌন্দর্যকে বিচিত্রভাবে তাঁদের ক্যানভাসে চিত্রিত করেন। সেগুলোর মধ্যে ১৮১৪ সালে ফরাশি চিত্রশিল্পী জ্যাঁ অগাস্ট ডোমিনিকের আঁকা ছবিটিতে ওডেলিস্কের নগ্নতার শুভ্র ভঙ্গিটি ছিল জগদ্বিখ্যাত। বর্তমানে চিত্রশিল্পটি বিখ্যাত ল্যুভর জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। সেই ওডেলিস্কের নগ্ন-সৌন্দর্যকে কবি সঞ্চারিত করেন তাঁর প্রিয়তমার দেহবল্লরীতে। ওডেলিস্কের নির্বাক, নিরাব্রু, মোহিনী সৌন্দর্যের উদ্দীপনায় কবি তাঁর প্রিয়তমার প্রতি উপগত হওয়ার স্মৃতি ব্যক্ত করেন। কবির ইন্দ্রিয়ঘন নান্দনিক সংবেদনায়, তাঁর কামের স্মৃতিতে

ওডেলিস্ক আর প্রিয়তমা অভিন্ন হয়ে ওঠে। শব্দ-ভাষায়-কল্পনায়, স্মৃতি-অভিজ্ঞতায়, উপমায়-চিত্রকল্পে, প্রত্যক্ষ ভাষণে কবি তাঁর সেই ব্রহ্মাস্বাদনের অভিজ্ঞতাকে ব্যক্ত করেন—

সে-রাতে তুমিই ছিলে ঘরের মিয়ানো অন্ধকারে
বিছানায় উন্মোচিত। তোমার বিশদ
ডাগর নগ্নতা আমি আকুল আঁজলা ভ'রে পান
ক'রে বারবার
মৃত্যুকে তফাত যাও বলবার দীপ্র অহংকার
অর্জন করেছিলাম। নিপোশাক তোমার শরীর
জ্যোৎস্না-কমান ধোয়া মসজিদের মতো
তখন বস্তুত
আমার চোখের নিচে। স্তনপল্লি জ্বলে,
যেমন সন্তের জ্যোতিশ্চক্র অবলীলাক্রমে আর
তৃষ্ণাতুর ওষ্ঠ রেখে নাভির লেগুনে
ভেবেছি তোমার
সুদূর প্রপিতামহী কেউ এমনি সাবলীল নগ্নতায় ভেসে
কারুর চোখের আভা করেছে দাবি।

তোমার শরীর
কোথাও নিরালা পথ, মসৃন অথবা তরঙ্গিত,
কোথাও-বা সুরভিত ঝোপ, আমার ওষ্ঠ-পথিক
ক্রমাগত আঁকে পদচিহ্ন সবখানে। কে জানত
এমন পুরনো গাঢ়, প্রায় আর্তনাদের মতোই
ডাক, শিখাময় ডাক মাংসের আড়ালে থাকে, থাকে
লুকানো এমন বিস্ফোরণ!
('ওডেলিস্ক', *আদিগন্ত নগ্ন পদধ্বনি*)

এভাবেই চেতন-অর্ধচেতনের আশ্চর্য কৌশলে কবি 'ওডেলিস্ক' কবিতায় চিত্রের নগ্ন-সুন্দরী ওডেলিস্কের মদির দেহ-লাস্যে নিজ প্রণয়িনীর ইন্দ্রিয়-সৌন্দর্যকে প্রতিস্থাপিত করে স্মৃতি-কল্পনায় আকণ্ঠ পান করেন তার শরীরী-সুধা। বস্তুত এ পর্যায়ে কবি ব্যক্তিগত বলে তাঁর প্রেমের অনুভূতিকে অপ্রকাশ্য রাখেন না আর। ফলে, কবিরই 'কৃপায়' গোপন থাকে না তাঁর প্রিয়তমার চোখ, চুল, বুক, হৃৎস্পন্দনের ঢেউ ('তোমার নীরবতার কাছে', *শূন্যতায় তুমি শোকসভা*)। কখনো প্রেম উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলে কবি উপমা চিত্রকল্পের প্রবাহে, শব্দ-পুনরাবৃত্তিতে মনোহর 'ক্যাটালগিংয়ে' ব্যক্ত করে চলেন অনিঃশেষ স্তবমালা তাঁর প্রিয়তমার প্রতি। আবার প্রিয়তমার নীরবতার কাছে কবির অপ্রতিরোধ্য কথামালা হয়ে পড়ে ভীষণ অসহায়, 'পতনপ্রবণ ইকারুসে'র মত। বস্তুত, প্রিয়ার সঙ্গ-নিঃসঙ্গতায় যেমন কাটে কবির প্রহর-প্রহরান্ত, তার বিচিত্র ছায়াপাত ঘটে কবিতায়। শামসুর রাহমানের এ প্রেমের কবিতাগুলো অধিকাংশক্ষেত্রেই তাঁর হৃদয়ের অনিরুদ্ধ আবেগের সরল প্রকাশলিপি—মূলত ব্যক্তিগত প্রেমের স্মৃতি ও অনুভূতির মধ্যে জীবনযাপনের চালচিত্র। ফলে, কবি যখন যেভাবে ইচ্ছে, সেভাবেই

ব্যক্ত করেছেন তাঁর এই নির্জন অন্তরানুভূতির দিনলিপি। প্রিয়তমার সান্নিধ্য, ঔদাস্য কিংবা অনুপস্থিতি—সবই যাপন করেন কবি এবং কবিতাই হয়ে ওঠে তাঁর সেইসব অনুভূতির দর্পন। কবির ভাষায়—''তুমিহীনতায় প্রতিদিন আমার কবিতাবলি / তুমিময় হয়, সেখানেই রোজ খুঁজবো তোমাকে, / দেখব দু'চোখ ভরে বহুবর্ণ বাক্যের ওপারে। / কি উপমা কি উৎপ্রেক্ষা অথবা প্রতীক ইত্যাদির / পরপারে তুমি আছ হৃদয়ের পরগনা জুড়ে ''('তোমার ঔদাস্য', *প্রতিদিন ঘরহীন ঘরে*)। যদিও এ পর্যায়ের পরাবাস্তবতাময় অথবা মিথাশ্রয়ী কবিতাগুলোর মত কবির সচেতন কোনো শিল্প প্রত্যয় লক্ষ করা যায় না প্রেমের কবিতাগুলোর বিন্যাসে। তবু কবির শিল্পিত সত্তা থেকে উৎসারিত কথামালা কোনো না কোনো শিল্পিতাকে আশ্রয় করেই তো মঞ্জরিত হয়। তেমনি বিচিত্র প্রকাশ লক্ষ করা যায় শামসুর রাহমানের এ পর্যায়ের কবিতায়। যেমন, কবি তাঁর প্রেমিকার সাথে সাময়িক বিচ্ছেদকে শিল্পে অনুপম ও প্রত্যক্ষ করে তোলার জন্য কামিংসে'র মত কখনো শব্দকে ভেঙে দেন—

আমরা আবার বিধ্বস্ত সেতুর দুই অংশের মতো হয়ে যাই
আ লা দা
আ লা দা
আ লা দা
আ লা দা
সু দূ র আ র আ
লা
দা
সু দূ র
আ লা দা
বি ষ ম
আ লা দা
('তোমার সঙ্গে', *আমি অনাহারী*)

এ পর্যায়ের কবিতায় চেতন-অবচেতনের স্বঃতস্ফূর্ত উৎসারণ, স্মৃতিময়তা, পরাবাস্তবতার মূল প্রবণতাগুলো লক্ষ করা যায় কবির প্রেমের কবিতাগুলোর ক্ষেত্রেও।''একদা তোমার জন্য'' কবিতায় কবি তাঁর প্রেমের স্মৃতি-সন্তরণের সূত্রে প্রেমিকাকে প্রতিস্থাপন করেন দেশ-কাল-সময় অতিক্রান্ত এক বিশ্বজনীনতায়। রোমান্টিক কবিদের মত কবির এ বিশ্বজনীনতা নয় বরং কবির স্মৃতিতে সঞ্চিত নানা অভিঘাতকে বিস্রস্ত সময়-স্রোতে, এলোমেলো অবচেতন-প্রবাহে কবি উপস্থাপন করে চলেন এক অনন্য কৌশলে—কবি তাঁর প্রেমিকাকে পঁচিশে বৈশাখের কোনো স্মৃতি থেকে তুলে নিয়ে ব্যাপক উল্লম্ফনে তাকে দেখতে চান ঊনসত্তরের গণ অভ্যুত্থানে, একাত্তরের ধ্বংসস্তূপে, আলজিরিয়া-ফিলিস্তিন-চেকোস্লভাকিয়ার যুদ্ধ-ক্ষুব্ধতায়—

তোমাকে দেখেছি আমি দূর ঊনসত্তরের
পদধ্বনিময় দিনে, করেছি আবৃত্তি
তোমার উজ্জ্বল মুখ, চকচকে চোখ, কালো চুলের গৌরব,
মধ্যরাতে বৈমাত্রেয় পরিবেশে কবিতা লেখার ফাঁকে-ফাঁকে।
একাত্তরে গুলিবিদ্ধ ঈগলের মতো রক্তাপ্লুত
বিধ্বস্ত শহর থেকে সবুজ গ্রামের অভ্যন্তরে
পলাতক হয়েছি যখন,
তখনো তোমার কথা হৃদয়কে বলেছি নিভৃতে
দীর্ঘশ্বাসসহড়ুযে উতল দীর্ঘশ্বাসে মিশ্র স্মৃতি ,
পঁচিশে বৈশাখ, চৈত্রপাতা, বৃষ্টিপাত, ধূ ধূ মাঠ,
প্রেতায়িত ঘোড়াদের লাফ,
ধ্বংসস্তূপ, সেতারের ব্যাকুল বেহাগ, দেয়ালের
কী বিমূর্ত দাগ, ছত্রভঙ্গ মিছিলের প্রজ্জ্বলিত আর্তনাদড়
মাছরাঙা পাখি, মাছ, শাপলা শালুক দেখার সময়।
এখন কেমন আছো তুমি? এখন তো
আঁধার চিৎকার করে অগ্নিদগ্ধ ঘোড়ার মতন।
যখন আলজিরিয়া যুদ্ধক্ষুব্ধ ছিল, জমিলাকে
নেকড়ের পাল ছিঁড়ে-খুঁড়ে মেতেছিল খুব পৈশাচী উল্লাসে
ফিলিস্তিনি লায়লাকে ঝাঁক-ঝাঁক ডালকুত্তা তুমুল তাড়িয়ে
বেড়িয়েছে রাত্রিদিন, তখন কোথায় ছিলে তুমি?
যখন চে গুয়েভারা ছিলেন কাদায় প'ড়ে বলিভিয়ার জঙ্গলে তাঁর
নিঃসাড় তর্জনী রেখে মুক্তি ও সাম্যের দিকে, দীপ্র
সূর্যোদয়ের উদ্দেশে
তখন কোথায় ছিলে তুমি ?
('একদা তোমাকে আমি', *উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ*)

দেশ-কাল বিভিন্নতায় নানা যুদ্ধ ও বিপন্নতায় কবির প্রেম আবর্তিত হয়। ইতিহাস আর স্মৃতির ভগ্নাংশের ভেতর অতীত-বর্তমানের ভেতর, সমানভাবে সঞ্চারিত করেন কবি তাঁর প্রিয়তমাকে। কবির মিশ্র স্মৃতির ভেতর, ধূসর অবচেতনলোকে কৈশোরের মাছরাঙা, শালুকের সাথে জড়িয়ে থাকা উপদ্রুত স্বদেশ ও বিশ্বের সাথে অভিন্ন সম্পর্কে জড়িয়ে যায় তাঁর প্রিয়তমাও, কবির কল্পনায়। কবি বর্তমান থেকে স্মৃতিতে, এক স্মৃতি থেকে অন্য স্মৃতিতে যেমন ছুটে চলেন উল্লম্ফনে, তেমনি আবার সেই স্মৃতি থেকে হঠাৎ একই কৌশলে অবতরণ করেন বাস্তবতায় প্রিয়তমার সান্নিধ্যে চায়ের টেবিলে অথবা পাওয়া না পাওয়ার অতল তরঙ্গে। বাক্যের উল্লম্ফনকে কবি তাঁর প্রেমের স্মৃতি, স্বপ্ন ও বাস্তবের মাঝখানে এক অলৌকিক তরঙ্গভঙ্গরূপে প্রয়োগ করেন কখনো—

তুমি
জ্যোৎস্নার অধিক স্নিগ্ধতায় স্বপ্ন হয়ে আছ, দেখি
আমি দেখি।
জ্যোৎস্নার নেকাব ছিঁড়ে মাঝে-মাঝে কাক উড়ে যায়।
...
প্রস্তর যুগের স্তব্ধতার মতো অনুচ্চার থেকে যায়, জানি
অন্তর্গত বাসনার বসন্ত আমার
পুষ্পিত হবে না কোনোদিন।

জ্যোৎস্নার নেকাব ছিঁড়ে মাঝে মাঝে কাক উড়ে যায়।
('একদা তোমাকে আমি', *উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ*)

কবির বাসনা আর বাসনা-ভঙ্গের বেদনার মাঝখানে চরম নিরাসক্তিতে অবস্থান করে উল্লম্ফনকৃত বাক্যটি—'জ্যোৎস্নার নেকাব ছিঁড়ে মাঝে-মাঝে কাক উড়ে যায়'। বাক্যের এই সচেতন অসংলগ্নতা আসলে কবির সত্তার বিস্রস্ততাকে বাস্তবোচিতভাবে প্রকাশের পরিপূরক এক নান্দনিকতা। মূলত, এ পর্যায়ে বর্তমান-বাত্যাহত, বিবরবাসী কবির অবচেতনলোকও সুন্দর ও উদগ্রীব হয়ে উঠতে চায় প্রিয়তমার প্রত্যাবর্তনের আশায়। হুমায়ুন আজাদ যথার্থই বলেছেন যে, এ পর্যায়ের কবিতায় শামসুর রাহমান তাঁর সমকালের যে উন্মত্ততায় আক্রান্ত, উদ্ভট দুঃস্বপ্ন ও অলীক দৃশ্যাবলি দেখতে অভ্যস্ত, ব্যক্তিগত প্রেমের সংস্পর্শে চতুর্দশপদী কবিতায় 'সে ব্যাধির দংশন' থেকে মুক্ত হন তিনি। একারণেই *মাতাল ঋত্বিক* এ পর্যায়ের কাব্যগুলোর মধ্যে 'পরিচ্ছন্নভাবে পৃথক'—এর সনেটগুচ্ছতে 'মত্ততার সংক্রাম কম' (হুমায়ুন, ২০০৪: ১২৫)। 'মাতাল ঋত্বিকে'র অধিকাংশ কবিতাই প্রেমের। কবি কাব্যটি উৎসর্গ করেছেন তাঁর প্রিয়তমার প্রতি, যাকে তিনি মনে করেন তাঁর 'স্বপ্ন, অন্নজল, অস্তিত্বের গান'। এই কাব্যে কবি তাঁর প্রেমকথা প্রকাশ করেছেন চৌদ্দ পঙ্‌ক্তির সনেটে। বস্তুতই, ''*মাখা* (মাতাল ঋত্বিক) আকর্ষণীয় প্রৌঢ় প্রেমিকের আবেগসংরাগের সংহত প্রকাশের জন্যেই। এগুলোতে তরুণ প্রেমিকের উন্মাতাল আবেগের ঝড়-ঝঞ্ঝা নেই; এবং এগুলো যেহেতু উৎসারিত হয়েছে বাস্তব উদ্দীপকের সাড়ারূপে, তাই নেই এগুলোতে প্রেম-দার্শনিকতা : আদর্শ প্রেম ও শাশ্বতীসন্ধান, ও তৎজাত দহন। এ গুচ্ছ যথার্থই 'পুষ্পাকুল বসন্তের কাছে শ্রান্ত হেমন্তের দাবি' ('তুমি তো এসেই বললে') ; এবং এ-দাবি হার্দ্য, অনুত্তেজিত, মনোরম'' (হুমায়ুন, ২০০৪, ১২৭)। কবির প্রেমের মৌহর্তিক অনুভূতি এবং স্মৃতিময়তা, আত্মকথনের পঙ্‌ক্তিমালা এই সনেটগুলো। তাতে মিশে থাকে কবির স্বপ্ন-কল্পনা এবং তাঁর পরিপার্শ্ব। বস্তুত, পরিপার্শ্বের প্রভাবে কখনো কবির মনে জাগে সমরূপী কোনো প্রেমানুভূতি কিংবা কবি তাঁর ঔদাস্যকে সঞ্চারিত করেন কখনো প্রকৃতিতে, কিংবা পরিপার্শ্বের বিপরীত কোনো অনুভাবকে প্রকাশ করতে চান কবি। যেমন, 'একটি অনুপস্থিতি' কবিতায় যখন সুন্দর সজীব ভোরবেলা নতুন মাছের মত কেলিপরায়ন', প্রফুল্ল সারস ওড়ে নীলাকাশে আর ''নিশুত নিশীথে স্বপ্ন আসে / পরাবাস্তবের হরিণের মত স্মৃতির আভাসে,/ ছাদের কার্নিশে একা পাখি ডাকে গভীর সুরেলা'', তখন বিষন্ন কবির কাছে নৈঃসঙ্গ সর্বৈব হয়ে ওঠে—

পৃথিবী আনন্দময় বস্তুত এখনো। সুর কাটে
মাঝে-মধ্যে, তবু এক দীপ্তিমান উল্লসিত সুর
বয়ে যায় সবখানে। শুধু আমি মানুষের হাটে

একাকী বিষণ্ন ঘুরি এবং যখন যেখানেই
যাই, সত্তা জুড়ে বাজে সর্বক্ষণ আর্ত অশ্বক্ষুর,
কেননা আমার বিশ্বে আজ আর সে নেই, সে নেই।
('একটি অনুপস্থিতি', *মাতাল ঋত্বিক*)

কবি পরিপার্শ্বের সম্পন্নতার বিপরীতে তাঁর অন্তর্গত নৈঃসঙ্গকে সুরেলা ও প্রতিধ্বনিময় করে তোলার জন্যই কৌশলটি ব্যবহার করেন মাতাল ঋত্বিকের কিছু সনেটে। এভাবেই কবি ষষ্টকে অংকিত পরিপার্শ্বের সূত্রে অতি দ্রুত অষ্টকে উপনীত হন তাঁর অনুভূতির শীর্ষবিন্দুতে এবং ভালোবাসার একটি দাবি বা আর্তিকে সোচ্চার বা তীব্র করে তোলেন অষ্টকের শেষ পঙ্‌ক্তিগুলোতে। কবি তাঁর সনেটে পরিপার্শ্বের চিত্ররাশিকেও এমনভাবে সাজান কিংবা কল্পনায় এমনভাবে নির্মাণ করেন যেন, সেই ধারাবাহিকতায় তাঁর মৌহর্তিক সংবেদনা প্রকট হয়ে মূর্ত হতে পারে। যেমন, 'আমার ক্ষুধার্ত চক্ষুদ্বয়' কবিতায় যখন রাত্রি 'তপোক্লিষ্ট বিমর্ষ নানের পোশাকের মত' আর 'সুদূর কোথাও অস্থায়ী ধূমল আস্তানায় আস্তে ঝরছে শিশির, ' নিশীথ রপ্তানি করে প্রসিদ্ধ সুরভি বাগানের দূর-দূরান্তরে', এমনকি দয়িতা তাঁর 'দেশান্তরে সুখান্বেষী', তখন অনিদ্র কবির চক্ষুদ্বয় ক্ষুধার্তের মত জেগে রয় সারারাত ক্লান্ত মগজে তাঁর 'পুরনো গোরস্তানে'র শিহরিত ঘাস, ডোরাকাটা বাঘ, জেব্রা আর 'ঝিলঘেঁসা হরিণের ভিড় নিয়ে গাঢ়'(আমার ক্ষুধার্ত চক্ষুদ্বয়, *মাতাল ঋত্বিক*)। কবির শূন্যতাকে প্রগাঢ় করে তোলার এ এক রোমান্টিক 'টেকনিক', যা তাঁর সনেটগুলোর সংহত আয়তনেও জাগায় এক অপূর্ব দ্যোতনা, এক অপ্রত্যক্ষ সুরময়তা।

একইভাবে, মিলনের আকুতিকে তীব্র করে তোলার জন্য কবি কখনো স্মৃতির ভস্মে আগুন জ্বালেন, কিংবা, দুর্বহ স্মৃতিকেই অলীক চিত্রমালায় সাজিয়ে দয়িতার সাথে তাঁর মিলনের আগ্রহকে তীব্র করে তোলেন—

স্মৃতির ভেতর ঘুরে-ঘুরে একটি মরাল কাঁদে,
পায়ে তার নুড়িগুলি অথবা কাঁকর চুমো খায়
অত্যন্ত নির্দয়ভাবে। রক্ত ঝরে আর কৃশকায়
অলবড্যে লোক কতিপয়, খুনখুনে বুড়ো, কাঁধে
ঢাক নিয়ে খুব ঢক্কা নিনাদে চাদ্দিক অবসাদে
ভ'রে তোলে ক্রমান্বয়ে। স্মৃতির ভেতরে গান গায়
শহুরে কোকিল, যার চক্ষুদ্বয় অন্ধ ; অসহায়
আমি ভাবি—তার সঙ্গে দেখা হবে কতদিন বাদে ?
('স্মৃতির ভেতরে', *মাতাল ঋত্বিক)*

কবির স্মৃতির ভেতর একলা মরাল আর অন্ধ কোকিল যদি এইভাবে না কাঁদতো এবং গান না গাইত, তবে কবির বিরহ প্রকট হতো না এতো একটি মাত্র পঙ্‌ক্তিতে—"তাঁর সঙ্গে দেখা হবে কতদিন বাদে?" কখনো অবদমিত কবির অবচেতনের কামনা ঘরের কঠিন দেয়ালে হাতড়ে খোঁজে প্রিয়তমার শরীরের ত্বকের স্পর্শ। বুভুক্ষু সত্তা নিয়ে কবি মূক দেয়ালের খাঁজে অনুভব করতে চান তার প্রেমিকার শরীরের যুগল স্তনের আভা ('কুয়াশায় নিমীলিত', *মাতাল ঋত্বিক*)। কবির বুভুক্ষার তীব্র মাত্রাকে প্রকাশ করতে যে কৌশলে তিনি জড়, মৌন দেয়ালের অনুবর্তী হন, তা বাংলা কবিতায় অদৃশ্যপূর্ব। ফলে, *মাতাল ঋত্বিকের* প্রেমের সনেটগুলো কবির মৌহর্তিক প্রেমানুভূতির সৎ ও অন্তর্গাঢ় উপস্থাপন সত্ত্বেও নান্দনিকতায় অনবদ্য। কবির এই প্রেমার্ত অনুভূতিগুলো সনেট-সংহত হয়েও প্রকাশের সামর্থ্যে ও বৈচিত্র্যে গীতিময়, বর্ণিল, আত্মিক।

বাংলা কবিতায় যৌনতাকে শামসুর রাহমান নতুন মাত্রায় ও শিল্প-চেতনায় উপস্থাপন করলেও তা যৌনতা-সর্বস্ব নয়। শামসুর রাহমানের অধিকাংশ প্রেমের কবিতা তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার শিল্পিত প্রকাশ। প্রেমে পড়েই তিনি প্রেমের কবিতাগুলো লিখেছেন। ফলে, প্রেমের সমস্ত ভাব-বিভাবই কবিকে যথার্থ প্রেমিকের মতই আন্দোলিত করেছে। তাছাড়া, কবি পূর্বজ আধুনিক কবিতা ও তারও পূর্বে রোমান্টিক কবিতায় প্রেমের আদর্শ, প্রকাশভঙ্গি ও শব্দ-ভাষার স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কেও অভিজ্ঞ । সুতরাং, বাংলা কবিতায় প্রেমকে কোন আদর্শ ও নান্দনিকতায় তিনি প্রতিষ্ঠা করবেন, তার একটি অন্তর্গত প্রস্তুতি ছিল কবির । শামসুর রাহমান যৌনতাকে তাঁর কবিতায় গ্রহণ করেন অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে—আধুনিক কবিদের মত তারস্বরে নয়। আবার প্রেমের শাশ্বত অভিজ্ঞতা প্রকাশে রোমান্টিকতা যদি স্বতঃস্ফূর্ত ও অপরিহার্য হয়, তবে তাকেও অস্বীকার করেননি—বরং, সে রোমান্টিকতাকে নিজের শব্দ-ভাষায়, কাব্যস্বভাবে প্রাতিস্বিকতা দেয়ার চেষ্টা করেছেন—নানা আঙ্গিকে যখন যেমন খুশি, তার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। তাই শামসুর রাহমানের কবিতায় দয়িতার শরীর-পর্যটন কেবল সম্ভোগলিপ্সায় সমাপ্ত নয়। দেহ ও মনকে কবি অদ্বয় সত্তা বলে মনে করেছেন—দয়িতার উদ্দেশে বলেছেন—''শরীর এবং আত্মা দু'টি পাখি ব'সে একই ডালে/ গান গায় প্রীতিবশে ('স্থগিত বাসনা', *মাতাল ঋত্বিক*)। বাংলাদেশের কবিতায় ষাট দশকের প্রেম-মনস্তত্ত্ব আলোচনা প্রসঙ্গে বেগম আকতার কামাল শামসুর রাহমানের প্রেম-মনস্তত্ত্বের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, '' সহস্র বছরের নির্জ্ঞান সংস্কার ও জাতিগত ঐতিহ্যের প্রতীক-স্বর ব্যক্তি কখনো বর্জন করতে পারে না। তাই প্রেমের ক্ষেত্রে যে আত্মনিবেদনভঙ্গি, স্মৃতিকাতরতা ও অবশেষে শরীর ভোগের ঊর্ধ্বে অমর্ত্য আবেগের মধ্যে চলে যাওয়ার মনস্তাত্ত্বিক ধরনটি প্রোথিত সেই শিকড় থেকে বিচ্ছিন্ন হয় না কবির উদ্বেজিত চিত্ত।

প্রমাণ স্বয়ং শামসুর রাহমানের কবিতা'' (আকতার, ২০১৩: ২৭৩)। ফলে, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বাস্তবতায় প্রিয়তমার প্রতি কবির যৌন-প্রবর্তনার প্রকাশ ঘটেছে এ পর্যায়ের অনেক কবিতায়, কিন্তু সার্বিকভাবে, পরিপূর্ণরূপে সম্ভোগবাসনার প্রকাশ সেখানে লক্ষ করা যায় না। বরং, শামসুর রাহমানের এই প্রেমের কবিতাগুলো তাঁর যাপিত জীবনের বিচিত্র প্রেমানুভূতির চরিতার্থতা-অচরিতার্থতা, বিরহ-বিলাপ, স্বপ্ন-স্মৃতিময়তার, থরথর আবেগের উজ্জ্বল, প্রোজ্জ্বল, গীতল আত্মপ্রকাশ। একইসাথে, ''গোলাপ-কাঁটার অবিনশ্বর দংশন ও পথেপ্রান্তে ফোঁটা নতুন ফুলের নশ্বর ঘ্রাণ শামসুর রাহমানের কবিতার প্রাণ'' (হুমায়ুন, ২০০৮: ১৪৩)।

শামসুর রাহমান ১৯৭৪ থেকে ১৯৮৩ কালপর্বে এমনকি শেষ পর্যন্ত প্রবলভাবে তাঁর ব্যক্তিগত প্রেমের একনিষ্ঠ সাধক; যথার্থই একজন 'মাতাল ঋত্বিক'। কিন্তু, তৃতীয় পর্যায়ের কাব্যে আংশিক বা বিবর্তিতভাবে প্রায়শই কবি তাঁর অবচেতনার পরালোক দ্বারা শাসিত, কবিতার শব্দ-ভাষা ও বিন্যাসেও কবি পরাবাস্তবতার অনুসারী। কখনো কখনো বহির্জগতের সাথে অন্তর্জগতের দ্বন্দ্বে কবি বৃদ্ধ চাঁদসদাগরের মত নিঃসঙ্গ, যুযুৎসা-ক্লান্ত। ফলে, শামসুর রাহমানের এ পর্যায়ের কবিতা সর্বোতভাবে পরাবাস্তব নয়, কখনো আংশিক পরাবাস্তব, অর্থাৎ বাস্তব-পরাবাস্তবের সংমিশ্রণ, কখনো মিথ-প্রতীক-প্রতিরূপকাশ্রিত। সমকালীন নানা সংকট এই পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ নানা নান্দনিকতায়, কবির আত্মতা ও শিল্পচেতনায় সমন্বিত হয়ে কালোত্তীর্ণতা অর্জন করে।

সহায়ক গ্রন্থ :

আকতার কামাল বেগম (২০১৩) *কবির চেতনা : চেতনার কথকতা*, ধ্রুবপদ, ঢাকা

আকতার কামাল বেগম (২০১৪) *শামসুর রাহমানের কবিতা: অভিজ্ঞান ও সংবেদ*

আশরাফ হোসেন খোন্দকার (২০১৩) *রোমান্টিক ও আধুনিক কবিতার অক্ষ-দ্রাঘিমা*, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা

জীবনানন্দ দাশ (২০০৬) *জীবনানন্দ-রচনাবলী*, তৃতীয় খণ্ড, ঐতিহ্য সংস্করণ, বাংলাবাজার, ঢাকা

বায়তুল্লাহ্ কাদেরী (২০১০) ''শামসুর রাহমানের কবিতার বিষয় ও প্রকরণ'', *শামসুর রাহমান স্মারকগ্রন্থ* [সম্পা. শামসুজ্জামান খান ও আমিনুর রহমান সুলতান] বাংলা একাডেমী, ঢাকা পৃ. (১৫২-১৬৮)

মনজুরুল ইসলাম সৈয়দ (২০০৬) ''শামসুর রাহমানের শহর'', *নির্জনতা থেকে জনারণ্যে : শামসুর রাহমান* [সম্পা. ভূঁইয়া ইকবাল ও রেজাউল করিম সুমন] মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা পৃ. (১৮১-১৯০)

মনজুরুল ইসলাম সৈয়দ (২০০৮) ''শামসুর রাহমানের কবিতা: কালের আখরে লেখা'', *শামসুর রাহমান স্মারক গ্রন্থ* [সম্পা. আনিসুজ্জামান ও অন্যান্য] অন্যপ্রকাশ, ঢাকা পৃ. (১৪৩-১৪৭)

রশীদ করীম (২০০৬) ''শামসুর রাহমানের কবিতা'', *নির্জনতা থেকে জনারণ্যে* [সম্পা. ভূঁইয়া ইকবাল ও রেজাউল করিম সুমন] মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা পৃ. (৬০-৮৫)

শামসুর রাহমান (২০১১) ''শামসুর রাহমানের মুখোমুখি হুমায়ুন আজাদ'' [সাক্ষাৎকার], *কবিকথন : শামসুর রাহমানের নির্বাচিত সাক্ষাৎকার* [সম্পা. আহমদ মাজহার, পিয়াস মজিদ], শুদ্ধস্বর, ঢাকা, পৃ. (১৩-৩৮)

সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ (১৯৬০), *গ্রীকপুরাণ কথা*, তুলি-কলম, কলকাতা

হুমায়ুন আজাদ (২০০৪) *শামসুর রাহমান : নিঃসঙ্গ শেরপা*, আগামী প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা

Breton Andre (1969), *Menifestoes of Surrealism* [trans. Seaver Richard and Lane Helen R.] University of Michigan Press, U.S.A

Eliot T.S (1970) *Collected poems 1909-1962,* Harcourt, Brace & World Inc., New York

Fowlie Wallace (1950) *Age of Surrealism*, The Swallow Press & William Morrow & Co, U.S.A

Mendelson Edward [ed.] (1979) *W.H. Auden: Selected Poems*, Vintage books, New York

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ ও আয়রনিঃ সমকালীন রাজনৈতিক চেতনার প্রতিফলন

শামসুর রাহমান পূর্বাপর নন্দন-সচেতন কবি। তিনি আপাতদৃষ্টিতে নির্বিপ্লবী কিন্তু দৈশিক কিংবা বৈশ্বিক কোনো সংকটে তিনি যে নান্দনিকতার গজদন্তমিনারে বসে থাকেননি, সে দৃষ্টান্ত পূর্বেই লক্ষ করা গেছে। কোনো সৎ কবির পক্ষেই তা যে সম্ভব নয়। পৃথিবীর অনেক বিপ্লবী কবিদের আত্মত্যাগের ইতিহাস তার সাক্ষ্য। শামসুর রাহমান একক সম্পন্নতায় তাঁর চেতনায় ধারন করেন সমকাল-মহাকাল, স্বদেশ-বিশ্ব, অন্তর্জগত ও বহির্জগতকে। তিনি সমকাল-চেতন, বৈশ্বিক, প্রগতিশীল ও মানবতার আত্মীয়। ফলে, সমাজ দায়বদ্ধতা তাঁর চেতনার সহজাত ধর্ম, কোনো বিশেষ দার্শনিকতার প্রভাব নয়। কবির ভাষায়—

> আমার কবিতায় আমি আমার কাল আর আমার স্বদেশকেই লিপিবদ্ধ করেছি। আমার সমকাল যে-মহাকালের অংশ, তাকেও বিস্মৃত হইনি। আমার স্বদেশ যে-বিশ্বের একখণ্ড জমিন, ধরতে চেষ্টা করেছি সেই বিপুল বিশ্বের অপার হাসি-কান্নাকেও। এবং এই বিশ্বে বরাবরই দুই শ্রেণীর মানুষ ছিল। একটি শ্রেণী মানবতা ও প্রগতির পক্ষে; অন্যটি বিপক্ষে। বিশ্বে যা-কিছু মহৎ, তা প্রথম শ্রেণীটিরই দান। দ্বিতীয় শ্রেণীটি বরাবরই তার বিরোধিতা করেছে। এই পশ্চাৎপদ শ্রেণীটির বিরুদ্ধে আমার কবিতা সোচ্চার ছিল। এই শ্রেণীটি কবিতার ভাষা কদাচিৎ বোঝে। তাই কখনও-কখনও আমাকে গদ্যেও প্রতিবাদ করতে হয়েছে। তবে আমি মনে করি, প্রেমই হচ্ছে অপ্রেমের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় প্রতিবাদ...আমার কবিতা সেই প্রেম ও মানবতার প্রতিশব্দ (শামসুর, ২০০৪: ভূমিকা)।

চতুর্থ পর্যায়ের কাব্যে শামসুর রাহমান বিশ্বব্যাপী স্বৈরশাসন, যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী। ফলে, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-আয়রনির খরশানে ও জ্বলজ্বলে কথামালায় তাঁর এ পর্বের কাব্যের নান্দনিকতা নতুন মাত্রা লাভ করে।

১৯৮৪ থেকে ১৯৯০ কাল পর্বে লেখা শামসুর রাহমানের কবিতাগুলোতে কবির নান্দনিক বীক্ষা নিম্নগামী—এমন অভিযোগ উঠেছিল সমকালে। কবির লেখনী বারংবার প্রশ্নবিদ্ধ হয় সে-সময়ে নতুন নান্দনিকতা সৃষ্টির ব্যর্থতার অভিযোগে (মনজুরুল, ২০১০: ১০৩)। সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম আশি ও নব্বই দশকে রাহমানের কবিতার শিল্পমান সম্পর্কে এইসব অভিযোগ অমূলক বলে প্রতিপন্ন করেন এবং এলিয়ট, ইয়েটস, পাউন্ড প্রমুখ বড় কবিদের কবি-জীবনের আপাত ক্ষয়িষ্ণুতার অন্তরালে যে বৈচিত্র্যময়তা ও পুনর্নির্মাণের (remaking) ব্যক্তিগত প্রত্যয় ছিল, শামসুর রাহমানের উত্তর-

পর্বের কাব্যগুলোর নন্দন-স্বভাবেও সেই বৈশিষ্ট্যটি চিহ্নিত করেন এবং সর্বোপরি শামসুর রাহমানের এই পর্বের কাব্য সম্পর্কে উপর্যুক্ত সমালোচনাগুলো প্রকৃতপক্ষে কবিরই নানা পর্বের সৃষ্টিকর্মের তুল্যমূল্য আলোচনায় দ্বান্দ্বিক ও প্রশ্নবিদ্ধ করে তোলার উদ্দেশ্যমূলক প্রবণতা বলে মন্তব্য করেন—

> পঞ্চাশ ষাটের শামসুর রাহমানের সাথে বাঙালির প্রেম ছিল, ষাটে বাঙালি তাঁর কবিতার সাথে মধুচন্দ্রিমা যাপন করেছে। সেই স্মৃতি, সেই আচ্ছন্নতা আমাদের কাটেনি। তাই এখনো ওই শামসুর রাহমানকে আমরা চাই। কিন্তু তাঁর কবিতা চল্লিশ বছরের পথ পেরিয়েছেড়্লানা অবয়ব ধরেছে, তাঁর ভিতরে এসেছে বৈচিত্র্য। সে কবিতা আর আগের মতো কেন থাকবে ? কারো কি থাকে? (মনজুরুল, ২০১০: ১০৫)

বস্তুত শামসুর রাহমান আশির দশকের এ পর্যায়টিতে ব্যক্তি, সমাজ, রাজনীতিতে নিজেকে আবারো সম্পৃক্ত করেছেন। শতাব্দী-সন্ধির ক্রান্তিকালে বিশ্বজুড়ে মানবতার সামুহিক সংকট—সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শের পরাভব, নানা দেশে স্বৈরাচারী শোষকের উত্থান, লেবানন-ভিয়েতনামে আমেরিকার উপর্যুপরি বোমা বিস্ফোরণ, আকাশে-বাতাসে পারমাণবিক বোমার তেজস্ক্রিয়তার ক্ষতিকর প্রভাব, ইথিওপিয়ার দুর্ভিক্ষ-কবলিত শত-শত শিশুর আর্তনাদ প্রভৃতি বিচলিত করে কবিকে। দৈশিক পর্যায়ে চেনা ঢাকায় ভীষণ বাণিজ্যিকীকরণ, শ্রেণীবৈষম্য, ক্ষুধা-দারিদ্র্য-প্রাকৃতিক দুর্যোগ, কুসংস্কার ও ধর্মাচ্ছন্নতার প্রতাপ, রাজনীতিতে সামরিকতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্রের দোর্দণ্ড প্রতাপে গণতন্ত্রচেতন মানুষের ভীষণ অবরুদ্ধতা এবং অবশেষে রক্তাক্ত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে স্বৈরাচার-পতনের প্রেক্ষাপটে কবি কবিতার পর কবিতায় সহজ-সরল ভাষায় ব্যক্ত করে যান তাঁর নানা অভিজ্ঞতা-ক্ষোভ-দ্রোহ-জ্বালা-অক্ষমতার অনুভব। কবি স্বেচ্ছায় অবদমিত রাখেন তাঁর এযাবৎ কালের নান্দনিক বোধের ঐশ্বর্যকে, বর্জন করেন গোলাপ-বনদোয়েল-পূর্ণিমা চাঁদ খচিত লালিত্যময় পদ্যসম্ভার। শব্দ-ভাষার প্রসাধন ও পরিচর্যায় নিরাসক্ত তিনি এপর্যায়ে। কবির ভাষায়—

স্বীকার করি, ছিঁচকাঁদুনে পদ্য দেখলেই আমার মাথায়
ইদানীং খুন চড়ে যায়, ইচ্ছে হয় এক থাপ্পড়ে
ফেলে দিই নর্দমায় এবং
যেসব পদ্যরাশি হিজড়ের মতো অঙ্গভঙ্গি করে,
দাঁত দিয়ে আঙুল চেপে ধরে পাছা দুলিয়ে
চোখ মারে, তাদের
রঙবেরঙের ছৈলছাবিলা ঢঙ দেখলে
আমার ভীষণ বিবমিষা জাগে।
যেসব পদ্য সস্তা প্রসাধনে ঝকঝকে হয়ে
অশ্লীল ইশারায় জোটায়
দু'ঘণ্টার নাগর , তাদের মুখে
থুথু ছিটোতে পারলে শান্তি পাই।
('আত্মা ছুঁড়ে দিই', *বুক তার বাংলাদেশের হৃদয়*)

একদিকে নানাভাবে ধ্বস্ত পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের মানুষের আর্তনাদ ও দুঃস্থতা, অপরদিকে দৈশিক পর্যায়ে গণতন্ত্র-নির্বাসিত স্বৈরাচারী সমাজে এবং পুরোদস্তুর বাণিজ্যিক 'উটকো' নগরীতে ধর্মান্ধতা ও সাম্প্রদায়িকতা আক্রান্ত নৈমিত্তিক জীবনে 'গোঁজামিল দেয়া বেঢপ সাংস্কৃতিক চণ্ডীমণ্ডপে' অবস্থান করে কবি বারবার প্রতিবাদ করেছেন, অভিমানী হয়েছেন, বিচলিত বোধ করেছেন। বস্তুত, এ পর্যায়ে কবির নিকট বাস্তব ও অধিবাস্তব সমার্থক হয়ে ওঠে। ফলে, স্বপ্ন-কল্পনা ও বাস্তবতার পার্থক্য বিলুপ্ত হয়ে তাঁর কবিতা হয়ে ওঠে প্রত্যক্ষ। এ পর্যায়ে তিনি স্বপ্ন-অবচেতনার গহীন পরাবাস্তব জগত থেকে বেরিয়ে শতাব্দীর সন্ধিকালের নানা যুদ্ধধ্বস্ততা ও সারা পৃথিবীব্যাপী স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে সরাসরি প্রতিবাদ জানিয়েছেন। অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে যখন কোনো কবি সরাসরি প্রতিবাদ করেন, তখন তাঁকে সাহসী ও সোচ্চার হতে হয়। স্বভাবতই তখন তাঁর কাব্য-ভাষা কৃত্রিমতা বর্জন করে, প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। যেহেতু কবির লেখনীই তাঁর প্রতিবাদের মূল আয়োজন, ফলে, তিনি তাঁকে উন্মুক্ত করে দেন নানা প্রতিষঙ্গে। সর্বদা ফর্ম-সচেতন কবি এ পর্যায়ে সত্যভাষণের তাগিদে নির্মোহ নান্দনিকতায় স্বেচ্ছায় অবতরণ করেন। সমকালের পাঠক-সমালোচকের নিকট সমালোচিত হলেও শামসুর রাহমান তাঁর এই নতুন অভিপ্রায়ে অনড় ছিলেন। সচেতনভাবেই কবিতার মধ্য দিয়ে সমাজ-বদলের প্রত্যয় ব্যক্ত হয় কবির কণ্ঠে—

যখন ওরা বলে নন্দনতত্ত্বের গলায় পা রেখে
চটকাচ্ছে তাকে, যেমন আধপোড়া সিগারেটটাকে
পিষে ফেলে জুতোর তলায়,
তখন আমি সাক্ষী মানি রজনীগন্ধা এবং কোকিলকে।

আমি কি কখনো বন্দনা করি নি রজনীগন্ধার?
রক্তচক্ষু কোকিল বলবে নির্দ্বিধায়,ড়
'লোকটা আমারই মতো গলায় রক্ত তুলে গান গায়'
এবং মেঘের গর্জন
আমার সপক্ষে সাক্ষ্য দেবে এই বলে ,
কী করবে সে গোলাপ, বনদোয়েল আর
পূর্ণিমা চাঁদ নিয়ে যখন ক্যালেন্ডারের প্রায়
প্রত্যেকটি তারিখ থেকে বয়
হাভাতের দীর্ঘশ্বাস, সাহসী মানুষের রক্তধারা,
ঝরে এতিমের অশ্রুকণা ?
...
আমি আমার আত্মা ছুড়ে দিই ডুমুরের ডালে,
মজে-যাওয়া খালে, স্বপ্নের চাতালে, শৌচাগারের
অকথ্য বুলিভর্তি দেয়ালে আর
তোমাদের অভিযোগের নাকের তলায়।

('আত্মা ছুড়ে দিই', *বুক তার বাংলাদেশের হৃদয়*)

বস্তুত, কবি এ পর্যায়ে একজন মতবাদী কবির মতই প্রবল সোচ্চার তাঁর কবিতায়, যদিও সমাজতান্ত্রিক কবিদের মত নয় তাঁর প্রকাশের ধরন। কারণ, বলা যায়, বাংলাদেশের রক্তক্ষয়ী রাজনৈতিক ইতিহাস পরিক্রমায় ৫২'র ভাষা আন্দোলন, ৬৯'এর গণ অভ্যুত্থান, ৭১' এর মুক্তিযুদ্ধ ও আশির দশকজুড়ে স্বৈরাচার পতন আন্দোলনের' নানা পর্যায়ের মধ্যে কবি সবচেয়ে বেশি সক্রিয় ছিলেন এই শেষোক্ত গণতন্ত্রকামী আন্দোলনে। ১৯৮৭ তে গণঅভ্যুত্থান যখন তুঙ্গে, তখন দেশের প্রগতিশীল আন্দোলনের সাথে জড়িত হযে পড়ায় সরকার কবির প্রতি ক্রমাগত বিরূপ হয়ে ওঠে। সরকারী হুকুমে কবির কার্যালয় 'দৈনিক বাংলা'র অফিসে কবিকে কার্যত নিষ্ক্রিয় করে রাখা হয়। কবি স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ 'দৈনিক বাংলা'র প্রধান সম্পাদকের পদ থেকে স্বেচ্ছায় ইস্তফা দেন। জীবিকাকে তুচ্ছ করে কবির এই আত্মত্যাগ ছিল যথার্থই ঝুঁকিপূর্ণ। কবির রোজনামচায় দৈশিক বাস্তবতার সাথে-সাথে তাঁর সে সময়ের আত্মিক সংকট প্রকাশ পায়—

> 'দৈনিক বাংলা' থেকে পদত্যাগ করতে হবে কয়েকদিনের মধ্যে। স্বৈরাচারী এরশাদ সরকারের সঙ্গে সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠানে আমি ক্ষীণতম সূত্রে যুক্ত থাকব, এটা আর মেনে নিতে পারছি না। জনগণের ওপর নির্বিচারে গুলি চালানো হচ্ছে, ধরপাকড় চলছে পুরোদমে। জরুরি অবস্থার পরোয়ানার বদৌলতে কণ্ঠরোধ করা হয়েছে সংবাদপত্রের। মানুষের মৌলিক অধিকার ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে। কেউ টু-শব্দটি পর্যন্ত করতে পারবে না। এরশাদী গণতন্ত্রের নমুনা দেখে অন্তরাত্মা বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে।... 'দৈনিক বাংলা'/ 'বিচিত্রা' থেকে পদত্যাগ আমাকে করতেই হবে। জানি আর্থিক অসুবিধার সম্মুখীন হবো, সংসার চালানো মুশকিল হয়ে পড়বে। তবু ইস্তফা আমাকে দিতেই হবে (শামসুর, ২০০৭: ৩০৯)।

সুতরাং, বলা যায়, শামসুর রাহমান প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে পড়েছিলেন বাংলাদেশের স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে। আশির দশকে 'জাতীয় কবিতা উৎসবে'র প্রধান আয়োজক হিসেবে কবি উৎসবগুলোর স্লোগান নির্ধারণ করেছিলেন অসাম্প্রদায়িক চেতনার উত্তরণ ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আহ্বানে—''শৃঙ্খল মুক্তির জন্য কবিতা'', ''স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে কবিতা'', ''সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে কবিতা'' এবং ''সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে কবিতা'', ''গণতন্ত্রের পক্ষে কবিতা'' শিরোনামে (মীজানুর, ১৯৯১, ৩৫৬-৩৫৭)। স্পষ্টতই এ পর্যায়ে কবি কবিতাকে আয়ুধরূপে গ্রহণ করেছেন। একবিংশ শতাব্দীর দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে অনেকেই যখন কলাকৈবল্যবাদী কবিতায় মত্ত, তখন কবি সামিল হতে চেয়েছেন রাজপথের স্বৈরাচার-বিরোধী জন-তরঙ্গের দৃপ্ত মিছিলে ('একবিংশ শতাব্দীর দোরগোড়ায়', *গৃহযুদ্ধের আগে*)। কবি প্রেরণা পান পৃথিবীর মুক্তিকামী কবি—লোর্কা, নেরুদা, নাজিম হেকমত প্রমুখের বিপ্লবী গাঁথা-গানে। কবি উজ্জীবিত হন সিকান্দার আবু জাফরের 'আতশবাজির মত জ্বলে ওঠা' স্বাধীনতার বিদ্রোহী পঙ্‌ক্তিমালায়—

আজ যখন জনগণনন্দিতা দুই বন্দিনীকে
মুড়ে রেখেছে নিঃসঙ্গতা,
স্বৈরাচারীদের লোহার হাত স্বদেশকে দিচ্ছে ঠেলে
ক্রমাগত জাহান্নামের আগুনে,
ঘাতকদের মসৃণ পথে-প্রান্তরে, মুখে শান্তির বুলি
আর ড্রাগনের দাঁতের মতো অশান্তির বীজ বপন করছে
অষ্টপ্রহর, তখন আমার অতীতের মূঢ়তা
ভেংচি কাটে আমাকে।

এখন মনে হয়, সেই কবির
জনতার সংগ্রাম চলবেই পঙ্‌ক্তিটি তেজী মাছের মতো
লাফিয়ে উঠছে ঘন ঘন, কবিতার
দাড়িপাল্লা আর বাটখারার অনেক
উপরে উঠে
প্রবল হাসছে, যেন সূর্যমুখী।
('ছিলেন এক কবি', *মঞ্চের মাঝখানে*)

বিপ্লবের মতই দ্রুত ধাবমান পঙ্‌ক্তি—'জনতার সংগ্রাম চলবেই'কে কবি রৌদ্রকরোজ্জ্বল সূর্যমুখীর উপমায় এবং ঝাঁপিতে থাকা তেজী মাছগুলোর প্রবল উল্লম্ফনের চিত্রকল্পে তুলনা করেছেন এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের ইতিহাস থেকে প্রেরণা সঞ্চয় করেছেন।

দৈশিক রাজনৈতিক বাস্তবতায়, সময়ের দাবিতে সচেতনভাবে কবি পরিবর্তন ঘটান তাঁর কবিতার নান্দনিকতার। ব্যতিক্রমীভাবে উপযোগিতা হয়ে ওঠে তাঁর কবিতার শব্দ-ভাষার মূল উপজীব্য। নিজের কবিতার এই বিবর্তন কবিই ঘোষণা করেন স্বকণ্ঠে এক দীর্ঘ 'মেনিফেস্টো'র মত করে—

আমার কবিতা আমি ঘোষণা করছি,
কখনো স্বৈরাচারী শাসক, নষ্ট মন্ত্রী, ভ্রষ্ট রাজনীতিবিদ,
কালোবাজারী আর চোরাচালানীদের
সঙ্গে ফুলের তোড়া সাজানো এক টেবিলে ডিনার খেতে
প্রবল অনাগ্রহী,
...
আমার কবিতা গণ অভ্যুত্থানের চূড়ায় নূহের
দীপ্তিমান জলযান, আমার কবিতা বলিভিয়ার জঙ্গলে
চেগুয়েভারার বয়ে যাওয়া
রক্তের চিহ্ন গায়ে নিয়ে হেঁটে যায় মাথা উঁচিয়ে
যারা ডুগডুগি বাজিয়ে
যখন ইচ্ছে গণতন্ত্রকে বাঁদর-নাচ নাচায়
তাদের পাকা ধানে মই দ্যায় আমার কবিতা ফুঃ বলে
উড়িয়ে দ্যায় দুর্দশার মুষলপর্ব।
আমার কবিতা নাজিম হিকমতের মতো জেলের নীরন্ধ্র

কুঠুরীতে বসে মুক্তির অক্ষরে লেখে আত্মজীবনী।
('শুচি হয়', *মঞ্চের মাঝখানে*)

কবি তাঁর কবিতায় হয়ে ওঠেন এক মূল্যবোধ-তাড়িত, আপোষহীন কলম-সৈনিক। বিশ্বের ঐতিহাসিক বিপ্লবগুলোর সাথে বাংলাদেশের স্বৈরাচার-বিরোধী আন্দোলন কবির চেতনায় সমান্তর হয়ে যায়। 'জ্বলজ্বলে কালো বাঘের মত/ নেলসন মেণ্ডেলার বন্দী জীবন কবিকে বিপ্লবী হতে শেখায় (নীরবতা, *গৃহযুদ্ধের আগে*)। নেরুদা, নাজিম হিকমতের মত কবি তাঁর কবিতাকে জনসমুদ্রের গর্জন করে তুলতে চান। বিপ্লবী গানে নতুন প্রজন্মকে সুন্দর সময়ের স্বপ্ন দেখাতে চান—

আমি চাই
আমার কবিতা যেন নেরুদা অথবা
নাজিম হিকমতের মতো মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে
দুরন্ত হাওয়ায়, খোলা পথে, সবুজ মাঠে, সড়কদ্বীপের
জনসমুদ্রে, যেন সামিল হতে পারে সুস্থ, সবল সোনার টুকরো
আগামী প্রজন্মের কাতারে, আজকের
মানুষকে স্বপ্ন দেখাতে পারে নিষ্কলুষ নতুন সভ্যতার।
('গৃহযুদ্ধের আগে', *গৃহযুদ্ধের আগে*)

শামসুর রাহমানের কবিতা এ পর্যায়ে যুগপৎ দৈশিক ও বৈশ্বিক সংকটকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। শতাব্দী-সন্ধিতে দাঁড়িয়ে কবি সারা বিশ্বব্যাপী এক চরম নৈরাজ্য অনুভব করেন। বিশ্বব্যাপী নানা দেশে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির আক্রমণ, সমাজতন্ত্রের প্রস্থান, গণতন্ত্রের অপলাপ, সুবিধাবাদী শ্রেণীর উত্থান, সাম্প্রদায়িক উন্মাদনা, যুদ্ধধ্বস্ত পৃথিবীর আর্তনাদ, দুর্ভিক্ষ, হতাশা এ সব কিছু কবিকে এক নতুন বাস্তবের মুখোমুখি করে তোলে। ম্যানিলায় জাপানী সৈন্যদের নির্মম হামলায় সুসংস্কৃত ফিলিপিনো জাতির পরাভব, সমাজতন্ত্রকামী ভিয়েতনামী জনতার প্রতি আমেরিকার প্রচণ্ড শক্তির পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণে হাজার হাজার শিশুর বিকলাঙ্গতা, আড়াই দশক ধরে লেবাননের গৃহযুদ্ধের বিপর্যস্ততা, ইথিওপিয়ার দুর্ভিক্ষের মর্মন্তুদ সব ছবি দেখে কবির মনে হয়েছে, জগৎজুড়ে কতিপয় বিরাটাকার 'টিনোসোরাসে'র মত আধিপত্যবাদী প্রাণীর সাম্রাজ্য দখলের তাণ্ডব ও ধ্বংসযজ্ঞে লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে নানা গর্বিত জাতি, দেশ, সভ্যতা। দেশে-দেশে পড়ে থাকে মৃতের স্তূপ, উপকূলে দীর্ঘ হয় শরনার্থিদের মিছিল আর উদ্বাস্তুদের আস্তানা। কবি অতিকায় 'টিনোসেরাসে'র প্রতীকী চিত্রকল্পে দেশে-দেশে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মদমত্ততাকে প্রকাশ করেন—

টিনোসেরাসেরা মাটি ফুঁড়ে দ্রুত বেরোচ্ছে আবার
পারিপার্শ্বিকের সৌন্দর্যকে তছনছ করে, শুরু হবে
সংহারের পালা, হয়ে যাবে নিমেষে কাবার
বিভিন্ন গর্বিত জাতি, পারবে না বিপুল অগুরু

ঢাকতে লাশের গন্ধ। কূলে উপকূলে দেশান্তরি
মানুষের ভিড় বাড়ে ক্রমাগত। এত কোলাহল,
তবু কেন এমন নির্জন বাসভূমি?
('স্মৃতিতে ধারণযোগ্য কিছু নয়', *হোমারের স্বপ্নময় হাত*)

কবি বিশ্বব্যাপী পারমাণবিক বিস্ফোরণে বারবার বার্ট্রান্ড রাসেলের সেই ভবিষ্যদ্বাণী স্মরণ করেন—Has man a future? বার্ট্রাণ্ড রাসেল পারমাণবিক উন্মাদনায় বিশ্বধ্বংসের ইঙ্গিত করেছিলেন। কবিও পারমাণবিক অস্ত্রমুক্ত দুনিয়ায়, যুদ্ধহীন ভবিষ্যতে সবার সাথে মিলে-মিশে বেঁচে থাকার আশা পোষণ করেন (শামসুর, ২০০৬: ১৮৪)। কবিও স্বপ্নাদ্য সিংহের মত হেঁটে চলেন বিনষ্ট প্রান্তর দিয়ে এবং এক মনে আওড়ান—ঘৃণা নয়, ''চিরদিন প্রেমই শুধু কীর্তনের অভীষ্ট বিষয়''।

বিশ্বজুড়ে মতাদর্শের মরণ দশা আর নান্দনিকতার কাল-বদলও কবিকে বিমূঢ় ও বিমর্ষ করে। যৌবনেই বামপন্থাকে বানপ্রস্থে যেতে দেখেন কবি এবং 'মধ্যবিত্ত মেজাজে' দূরে দাঁড়িয়ে আরো লক্ষ করেন 'আশির দশক মাদি ঘোড়ার মতন পাছা দোলাতে দোলাতে চলে যাচ্ছে' আর বিগত কাল খাঁচায় দাঁড়বন্দি তোতাপাখির মত বিমর্ষ কণ্ঠে প্রভুর নাম-সংকীর্তনে রত। রবীন্দ্রনাথকে কবি হেঁটে চলে যেতে দেখেন কোন 'অ-বনেদি গলি দিয়ে নেয়ামত/ দরজির ঈষৎ বাঁকা উঠোন পেরিয়ে' ভীষণ নিঃসঙ্গরূপে, আর পুত্রদের অর্থাৎ নতুন প্রজন্মের ''তেতে-ওঠা মতবাদঝলসিত কথা'' শুনে কবি সত্যিই বিচলিত হয়ে ওঠেন ('স্মৃতিতে ধারণযোগ্য কিছু নয়', *হোমারের স্বপ্নময় হাত*)। নানা জীবজন্তুর প্রতীকে আয়রনি, শ্লেষ, ব্যঙ্গে কবি তাঁর সময়ের এইসব বহির্জাগতিক ও অন্তর্জাগতিক খণ্ড-প্রলয়গুলোকে ব্যক্ত করেন—

কিছুটা বিভ্রান্ত বটে ইদানীং, তবু চোখ কান
খোলা রাখি, সমাজতান্ত্রিক প্রীতি নিয়ে ধান্দাবাজি
ঢের হ'ল আশেপাশে, ধর্মযাজকের সত্তায় প্রবল শান
দ্যায় খর রাজনীতি। বিপ্লব ফ্যাশন কোনো-কোনো
গুলজার মহলে এবং
ধোপার কুকুর যারা, তাদের নিকট ভীতিটাই
মৌল অতিশয় ; ছাগলের ছাল-ছড়ানো কসাই নিয়মিত
গায় ওহো সাঁই সাঁই গণতন্ত্রগীতি।
অকস্মাৎ ব্রোঞ্জের চওড়া প্লেট থেকে
বেমক্কা বেরিয়ে পড়ে সুশোভিত ড্রইংরুমের
গালিচায় তিন লাফ দিয়ে
রাঙা চোখে বিপ্লবের নান্দনিক ব্যাখ্যা দাবি করে
মহেঞ্জোদারোর ষাঢ় আর রাবীন্দ্রিক সন্ধ্যার উতল মেঘমালা
ফুঁড়ে চলে যায় স্তব্ধ পূর্ণিমায় পুলিশের গাড়ি।
('স্মৃতিতে ধারণযোগ্য কিছু নয়', *হোমারের স্বপ্নময় হাত*)

সাম্যবাদের মুমূর্ষতায় এবং ধর্ম আর রাজনীতির কপট প্রীতিবন্ধনে সমকালের সেই বিভ্রান্ত সময়ে নির্মম কসাইয়ের কণ্ঠে কবি শোনেন গণতন্ত্রগীতি। ছাগলের ছাল ছড়ানো যাদের নিত্যকর্ম, তেমন অমানবিক নেতৃত্বের হাতেই গণতন্ত্র বন্দী তখন। একটি পরাবাস্তব চিত্রকল্পে ব্রোঞ্জের চওড়া প্লেট থেকে বেরিয়ে আসা 'মহেঞ্জোদারোর ষাঁড়' আসলে ড্রইংরুম বিলাসী কতিপয় শৌখিন বিপ্লবী, যারা বিপ্লবের নান্দনিক ব্যাখ্যা চায় আর সুবিধাবাদী, গোবেচারা শ্রেণীকে কবি ইঙ্গিত করেন 'ধোপার কুকুর'রূপে। ওদিকে সংবাদপত্রে ইথিওপিয়ার দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের ফটোগ্রাফগুলো কবির অবচেতনলোক দখল করে নেয়। সেই জীর্ণ কঙ্কালসার মানুষগুলো কবির স্বপ্নে এসে হজির হয়। কবি তাঁর স্বপ্নদৃশ্য বর্ণনা ও ব্যাখ্যার সূত্রে উপস্থাপন করেন ইথিওপিয়ার নিরন্ন মানুষের প্রতি তাঁর সমবেদনা—

তারপর নিজেকে দেখতে পেলাম জনশূন্য,
ধুধু প্রান্তরে। জমি ফেঁটে চৌচির। কোথাও একডগা ঘাস
নেই, এক ফোঁটা পানি নেই। শুধু ঝিঁঝি পোকার
ডাকের মতো একটা শব্দ উঠে আসছে মাটি থেকে। হঠাৎ
যেন মাটি ফুঁড়ে বেরুল একটা কালো মানুষ। মানুষ
না বলে কঙ্কাল বলাই ভালো। লোকটা মাটির ওপর
বসে পড়ল এবং কোত্থেকে যেন একটা শিশু এসে বসল ওর
কোল জুড়ে। হাড়-জিরজিরে শিশুটির দু'চোখে জীবনের
দ্রুত পলায়নের দৃশ্য। সেই লোকটা আর শিশুটিকে
দেখে মনে হ'ল যেন মৃত্যু শুয়ে আছে মৃত্যুর কোলে।
('হোমারের স্বপ্নময় হাত', *হোমারের স্বপ্নময় হাত*)

শেষ পঙ্‌ক্তিতে 'মৃত্যু যেন শুয়ে আছে মৃত্যুর কোলে' প্রবল আয়রনি হয়ে দুর্ভিক্ষপীড়িত সমকালকে উপহাস করে। কবির এ স্বপ্নের ভেতর আগের মত জটিল সব পরাবাস্তব চিত্র নেই। তাই তার ব্যাখ্যাও সহজ। প্রকৃতপক্ষে, পৃথিবীর বাস্তব দৃশ্যগুলোই হয়ে ওঠে এমন নির্মম, বীভৎস, অধিবাস্তবের মত, যে কবির স্বপ্ন-দৃশ্য সেই বাস্তবতাকে অতিক্রম করে যেতে পারে না। বাস্তব ও স্বপ্ন কবির কাছে সমার্থক হয়ে ওঠে। জীবন ও মৃত্যুর ভেদ যখন লুপ্ত, চারিদিকে ধ্বংসস্তূপ ছাড়া যখন আর কিছুই চোখে পড়ে না, যখন বাতাসে রক্তের গন্ধ ছাড়া অন্য কোনো গন্ধ নেই, তখন কবি তাঁর কণ্ঠকে উচ্চগ্রামে বেঁধে কর্কশ সুরে ধ্বংসস্তূপের গান গাওয়াই যথার্থ বলে মনে করেন—

বর্তমানে জীবন-মৃত্যুর ভেদ লুপ্ত,
কর্কশ বাঁশির তালে তালে গলা ছেড়ে
আমাকে গাইতে হবে গান। সুর যত
ওঠে উচ্চগ্রামে, তত রক্ত ঝরে বুক থেকে ; ধ্বংসস্তূপে গান
গাইলে নিশ্চিত বুকচেরা রক্ত ঝরাতেই হয়,

এই রক্তধারা যায় ছায়াপথে, নক্ষত্রের দিকে।
('এই রক্তধারা যায়', *হোমারের স্বপ্নময় হাত*)

ফলে, রূপক নয়, পরাবাক্ নয়, কবি শব্দ-ভাষার প্রত্যক্ষতাকেই অবলম্বন করেন এ পর্যায়ে। লক্ষনীয় যে, দেশের যে কোনো সংকটে কবির কাছে যখনই জাতীয় দাবি সোচ্চার হয়ে উঠেছে, তখনই জনতার ভাবনা আর কবির নান্দনিকতা সমার্থক হয়ে উঠেছে কবির কাছে। বরং অনেক ক্ষেত্রে নান্দনিকতাই কবির চেতনার অনুসারী হয়ে ওঠে। তবে, শামসুর রাহমানের এ ধরনের চেতনা-প্রধান কবিতাগুলোও যে নান্দনিকতা-নিরপেক্ষ, তা নয়। আধার ও আধেয়র এক সময়োচিত সমঝোতা সাধিত হয় এই কবিতাগুলোতে। ফলে, শব্দ-ভাষাকে কবি তাঁর সংগ্রামী চেতনার সমান্তর করে তুলতে বর্জন করেন কৃত্রিম কারুকাজ এবং প্রাসঙ্গিকতা ও প্রত্যক্ষতাকে প্রকট করে তোলেন কবিতায়। ভাষাকে আয়ুধ করে তুলতে কবি কখনো শাণিত শব্দে প্রতিপক্ষকে কটাক্ষ করেন, কখনো ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে নানা অসঙ্গতি নির্দেশ করেন। দেশে-দেশে স্বৈরাচারী শোষকের প্রবল উত্থান এবং বাংলাদেশেও একই বাস্তবতার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে কবি নানাভাবে কটাক্ষ করেন। দম দেয়া পুতুলের মত চাটুকার পরিবেষ্টিত, অকেজো মন্ত্রী-পারিষদে মোড়ানো বাংলাদেশের স্বৈরাচারী সরকার কাঠামোর হাস্যাস্পদ রূপটি কবি উন্মোচন করেন নানা জীবজন্তু আর আনাজ-তরকারির ইঙ্গিতে—

পুতুল খেলার ভারি শখ তাঁর
পেছন থেকে সুতো নেড়ে, সুতো ছেড়ে
তিনি হরহামেশা নিজের মেজাজটাকে শরীফ রাখেন।
পুতুলগণ তাঁর চারপাশ
মুড়ে দিয়েছেন শুভেচ্ছা, অনলস খেদমত আর অন্তবিহীন
তোষামোদে। তাঁর শাসনামল, একজন
পুতুলের জবানিতে , একটি নিখাঁদ স্বর্ণযুগ।
. . .
এইসব পুতুল পরিবৃত খেলোয়াড়
যে আসনে সমাসীন, তাতে কোনো মুৎসুদ্দি, ভাঁড়, নেকড়ে,
ভালুক, উল্লুক, বেবুন,ঘোড়া অথবা
খচ্চর উড়ে এসে জুড়ে বসলেও আমরা টু শব্দটি করবো না।
তাঁর কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে,
চিচিঙ্গা, মিষ্টি কুমড়ো আর বেগুনের মতো
মন্ত্রী প্রতিমন্ত্রীগণ বাকায়দা নতুন ক'রে শপথবাক্য উচ্চারণ করবেন,
তাঁর অমোঘ নির্দেশে
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় দিগ্বিদিক মুড়িমুড়কির মতো ছড়িয়ে দেবে রাষ্ট্রদূত।
('কিচ্ছু বুঝি না, কিচ্ছু বলি না', *বুক তার বাংলাদেশের হৃদয়*)

কবি তাঁর নানা কবিতায় ব্যঙ্গ প্রকাশ করেন নানা টেকনিকে। কখনো কবি তাঁর প্রেক্ষণটি সামান্য পরিবর্তন করে নেন অথবা কাউকে সম্বোধনপূর্বক তাকে নানা অসঙ্গতির কথা শুনিয়ে যান। কবি যেন

এক বিদুষক—দর্শককে নানা ভঙ্গিমায়, কথকতায়, ভাঁড়ামিতে, আয়রনিতে শুনিয়ে যান তার সময়ের নানা অসঙ্গতির কথা। যেমন নিম্নোক্ত কবিতাটিতে পূর্বসূরীদের সম্ভাষণপূর্বক কবি অভিযোগ প্রকাশের সুরে তাঁর বক্তব্য প্রকাশ করেন নাটকীয়ভাবে, জিজ্ঞাসাসূচক বাক্য ব্যবহার করে—

হে আমার
প্রবীণ দানেশমন্দ পূর্বসূরীগণ, আপনারা
দোষী, এরকম অপবাদ
দেয়া কিছুতেই
সাজে না আমাকে। মাঝে-মাঝে কিছু কথা কানে আসে,
তা-ই শুধু শোনাব আপনাদের আজ।
একটু সময় হবে সেসব শোনার ?

কানে আসে দেশে-দেশান্তরে
সুসজ্জিত দর্পিত সেনারা
দুনিয়া কাঁপানো এক ভীষণ আওয়াজে
করে কুচকাওয়াজ এবং
শোষণ চলছে দিগ্বিদিক পুরোদমে,
হাবিলের চেয়ে কাবিলের সংখ্যা অতি দ্রুত আজ
হাজার গুন যাচ্ছে বেড়ে ; শুনি
একটি বোতাম টিপলেই
আমাদের প্রিয় পৃথিবীর গায়ে পারমাণবিক
ছাই জমা হবে রাশি রাশি।
('পূর্বসূরীদের উদ্দেশে', টেবিলে আপেলগুলো হেসে ওঠে)

প্রকৃতপক্ষে, পূর্বসূরীদের প্রতি সম্ভাষণ কবির কবিতার একটি কৌশল, যার মাধ্যমে কবি ভিয়েতনাম-ম্যানিলা-জাপানসহ বিশ্বব্যাপী পারমাণবিক বিস্ফোরণের ভয়াবহতা নিয়ে তাঁর উৎকণ্ঠাকে প্রকাশ করেন। পূর্বসূরীদের বিনয়সহ সম্ভাষণপূর্বক এই ধ্বংসলিপি শোনানোর মধ্যে কবির প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ-স্পৃহাও প্রকাশ পায়। কবিতায় সম্ভাষণের রীতি এলিয়টের ভাষায় কবির দ্বিতীয় স্বর (second voice) প্রক্ষেপণ। একটি কবিতায় সাধারণত একসাথে একটি স্বরই বা যে কোনো একটি দৃষ্টিভঙ্গি প্রযুক্ত হয়ে থাকে। এলিয়ট তাঁর ''*The Three Voice of Poetry* '' প্রবন্ধে কবির প্রথম স্বর (first voice) বলতে বুঝিয়েছেন তাঁর স্বগতকথন অর্থাৎ নিজের সাথে কথা বলার রীতি, দ্বিতীয় স্বর (second voice) বলতে বুঝিয়েছেন, দর্শক বা অন্য কাউকে উদ্দেশ্য করে কবির সম্ভাষণকে এবং তৃতীয় স্বর (third voice), যার প্রয়োগে এলিয়ট নিজেই স্বকীয়তা অর্জন করেছিলেন, তা হলো কবির সৃষ্ট কোনো চরিত্রের স্বরে তাঁর নিজস্ব স্বরকে প্রতিস্থাপন করা (Eiot, 1969: 89)। শামসুর রাহমান দৈশিক নানা সংকটে তাঁর অন্তর্গত বিবিক্ততা কাটাতে এবং জনসম্পৃক্ত হতেই হয়ত বারবার দ্বিতীয় স্বরকে বহুলভাবে অবলম্বন করেছেন এ পর্যায়ের কবিতায়। যেমন, স্বৈরাচারী শোষককে উদ্দেশ্য করে কবি নিম্নোক্ত কবিতায় প্রয়োগ করেন তাঁর দ্বিতীয় প্রেক্ষণ—

এই যে শুনুন, আপনি যখন ঝকমকে চামচে সুপ খান
চমৎকার, তখন আপনার
সাফসুতরো হাতে, ধবধবে শার্টের আস্তিনে এতটুকু
রক্তচিহ্নও চোখে পড়ে না কারও। আপনি যখন হাসির জুঁই
যত্রতত্র ঝরিয়ে দেন, কে বলবে আপনি আতশ মেজাজ ? গোস্তাকি মাফ করবেন
হুজুর নামদার, আপনাকে জালিম বলবে
এমন বেহুদা তালিম কেউ পায়নি এ-তল্লাটে।

. . .

কিন্তু হে লৌহমানব,
আপনি খেয়ালখুশির খেয়া ভাসালেই
নিষিদ্ধ ঘোষিত হবে না সূর্যোদয় কিংবা পূর্ণিমা,
প্রেমিক-প্রেমিকার চুম্বন।
আপনি প্রাণভরে গার্ড অভ অনার নিতে পারেন আর
একজন কবিকে দাঁড় করিয়ে দিতে পারেন
ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে,
বহুৎসব করতে পারেন তার গ্রন্থরাজি দিয়ে,
পারেন আপনি পারেন ;
তবু তার কবিতাবলি বন্দুকের ধমককে
উপেক্ষা ক'রে ঈগলের মতো উড়তে থাকবে, উড়তে থাকবে
উড়তে থাকবে, উড়তে থাকবে।

('এই যে শুনুন', *আমার ক'জন সঙ্গী*)

অত্যাচারী, জালিম সরকারকে যথাযথ আদবের সাথে সম্ভাষণপূর্বক কবি মূলত সেই স্বৈরশাসকের বিলাস-ব্যসনপূর্ণ জীবনযাপনের বিপরীতে তার রক্তপিপাসা নিবারণের নিষ্ঠুরতা, তথাকথিত জনদরদী সত্তার মুখোশে সাধারণ জনগণের সাথে প্রবঞ্চনার নাটক ও স্বাধীনচেতা শিল্পীর বাক্‌নিয়ন্ত্রণের হীন স্বার্থকে বিদ্রূপ করেন। প্রকৃতপক্ষে, কবির এ সব ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের তলায় থাকে স্বৈরাচারের স্বরূপ উন্মোচন এবং তার পতন ঘটানোর মধ্য দিয়ে দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন কামনা। কখনো কখনো এদেশের স্বৈরশাসনামলকে নিকারাগুয়ার প্রেসিডেন্ট সামোসার শাসনকালের সাথে তুলনা করে কবি প্রবল ব্যঙ্গ ও পরিহাসে বিস্ফারিত হন। ব্যঙ্গের সাথে সাথে গল্প-বলার ভঙ্গিতে নাটকীয়তা সঞ্চার করেন কবি—

আমাদের দেশে আছেন একজন
যিনি নিকারাগুয়ার সামোসার মতো কীর্তিমান।

. . .

আমাদের সেই মেহেরবান
ঝড়তুফান এবং বান অগ্রাহ্য ক'রে ছুটে যান
দুর্গতদের অত্যন্ত কাছে,
দরাজ হাতে এদিক ওদিক হৈ হৈ বিলিয়ে বেড়ান
ত্রাণসামগ্রী, রাঙা ধানের খৈ
ওহো খাজনার চেয়ে বাজনা বেশি;
এলোকেশী কপালকুণ্ডলা এগিয়ে আসে ছিন্ন বেশে
ভিক্ষাপাত্র হাতে। রহমদিল
তাঁর হাঁটুঢাকা গামবুটে চুমু খায় দেশডোবানো পানি।

জানি, টেলিভিশন সাক্ষী, আমরা জানি।
. . .
কোনো বেতমিজ যদি হঠাৎ
চেঁচিয়ে ওঠে, কী আনন্দ পাও তুমি শাসনদণ্ড ধারনে, তবে
তিনি নতুন চাল দিয়ে দাবার ছকে নিজস্ব তখত্‌টি সামলে নেন।
আমরা কিচ্ছু বুঝি না, কিচ্ছু বলি না,
শুধু বোবা হয়ে থাকি।
('কিচ্ছু বুঝি না, কিচ্ছু বলি না', *বুক তার বাংলাদেশের হৃদয়*)

'কিচ্ছু বুঝি না, কিচ্ছু বলি না''—এই দীর্ঘ কবিতাটিতে সাতটি স্তবকে কবি স্বৈরাচারী সরকার ও তার মন্ত্রণালয়ের নানা অসঙ্গতির চিত্রকে ব্যাঙ্গাত্মকরূপে উপস্থাপন করেন। চাটুকার পরিবেষ্টিত, মুখোশধারী, দ্বৈতচরিত্রের এই সরকার যে মানুষের প্রতিবাদী কণ্ঠকে কীভাবে রুদ্ধ করে রেখেছিল, তার প্রকাশ ঘটাতে কবি প্রতি স্তবকের শেষে প্রচণ্ড আয়রনিতে উচ্চারণ করে গেছেন—'' আমরা কিচ্ছু বুঝি না, কিচ্ছু বলি না''। বাক্যাংশের পুনরাবৃত্তি যে কত শ্লেষপূর্ণ হতে পারে, তার দৃষ্টান্ত এই কবিতাটি। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই স্বাধীনতার গৃহশত্রু, রাজাকারদের দেশে নির্বিবাদ বিচরণ, রাজকীয় জীবনযাপনকে কটাক্ষ করে কবি রাব্বুল আলামীনের কাছে ফরিয়াদ জানান রক্তাক্ত অন্তরে—

হে পাক পরওয়ার দিগার, হে বিশ্বপালক,
আপনি আমাকে লহমায়
একজন তুখোড় রাজাকার ক'রে দিন। তা হলেই আমি
দ্বীনের নামে দিনের পর দিন তেলা মাথায়
তেল ঢালতে পারব অবিরল,
গরীবের গরিবি কায়েম রাখবো চিরদিন আর
মুক্তিযোদ্ধাদের গায়ের চামড়া দিয়ে
ডুগডুগি বানিয়ে নেচে বেড়াব দিগ্বিদিক আর সবার নাকের তলায়
একনিষ্ঠ ঘুনপোকার মতো অহর্নিশ
কুরে কুরে খাব রাষ্ট্রের কাঠামো, অবকাঠামো।
('একটি মোনাজাতের খসড়া', *দেশদ্রোহী হতে ইচ্ছে করে*)

মোনাজাতের ভঙ্গিতে, প্রকৃতপক্ষে, ভীষণ আয়রনিতে কবি বিদ্যমান রাজনৈতিক অসঙ্গতিকে বিদ্ধ করতে চান। রাষ্ট্রে অবস্থান করে দিন-রাত নিজেদের আখের গুছিয়ে যারা গোপনে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধেই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, তাদের সুদিন আর হুইলচেয়ারে বসা মুক্তিযোদ্ধাদের ভাগাড়ে পড়ে থাকতে দেখে কবির মনে হয় তাঁর প্রিয় স্বদেশ আজ উল্টোরথে চড়ে চলছে। বিশেষত, এতদিন লুকিয়ে থাকা 'গির্জের ইঁদুরগুলো' অর্থাৎ যুদ্ধাপরাধীর দলকে এখন 'বনবিড়ালে'র মত প্রবল ঝাঁপিয়ে পড়ে আমাদের শান্তির চাতাল পুনরায় ছিন্ন-ভিন্ন করতে দেখে প্রবল দুঃক্ষোভে কবির ইচ্ছে হয় দেশদ্রোহী হতে ('দেশদ্রোহী হ'তে ইচ্ছে করে', *দেশদ্রোহী হতে ইচ্ছে করে*)। কবি কখনো প্রত্যক্ষ শ্লেষে, কখনো এইরূপ নানা

প্রতীকী চিত্রকল্পের মাধ্যমে স্বদেশের প্রতি তাঁর সচেতন দায়বদ্ধতার প্রকাশ ঘটান। প্রিয় বাংলাদেশকে সুপ্রভাত জানিয়ে কবি বেদনায়-ভালোবাসায় তাঁর অন্তরের উষ্মা, শ্লেষ, ব্যঙ্গ বর্ষণ করেন গভীর অভিমানে, যেমন একদা দুঃখিনী বর্ণমালাকে উদ্দেশ্য করে বিদ্ধ করেছিলেন তাঁর শব্দ-ভাষার বাণ। হ্যামলেট তাঁর মায়ের প্রতি যেমন ভীষণ গঞ্জনা ও তীব্র তিরস্কারে ফেটে পড়েছিল, তেমনি খেদে ও অন্তর্জ্বালায় উৎপীড়িত কবি তার বাংলা মা'কে বিদ্ধ করেন প্রবল শেলে—

শোনো বাংলাদেশ, স্বপ্নের ফেনা লেগে তোমার চোখ
এমন অন্ধ হয়ে যায়নি যে, তুমি
দেখতে পাচ্ছ না শকুনের ঝাঁক বড়শির মতো নখ দিয়ে
আকাশের উদর ছিঁড়েখুঁড়ে হিঁচড়ে টেনে আনছে
মেঘের নাড়িভূড়ি ;
দেখতে পাচ্ছ না সংসদভবন নাক ডেকে ঘুমাচ্ছে,
রাজনীতিবিদগণ জনগণের কাছ থেকে
বিচ্ছিন্ন হয়ে বনভোজন করছে দীর্ঘকাল ;
শাসনতন্ত্র কাটা ঘুড়ির মতো ভাসমান,
উন্নয়নবিশারদগণ পাঁচশলা পরিকল্পনাকে
কুরে কুরে খাচ্ছেন ঘুনের ধরনে

দেখতে পাচ্ছ না, বখাটে বুদ্ধিজীবীদের মাথায়
বেধড়ক উৎসাহে ক্রমাগত হাগছে পেঁচা আর বাদুড়,
দেখতে পাচ্ছ না, সাত ঘাট থেকে চেয়েচিন্তে-আনা
হে ব্যর্থ অন্নপূর্ণা,
যে, তোমার সন্তানের পাতের ভাত খায় সাত কাকে।
গুড মর্নিং বাংলাদেশ, সুপ্রভাত,
হাউ ডু ইউ ডু ?
('গুড মর্নিং বাংলাদেশ', *অস্ত্রে আমার বিশ্বাস নেই*)

ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় সম্ভাষণ করে, নানা অসঙ্গতির মালা-চিত্রকল্পে, শাণিত শব্দে কবি তাঁর বাংলা মায়ের বর্তমান বিস্রস্ততাকে ব্যঙ্গ করেন। 'ধন্য সেই পুরুষ কবিতায় কবি এ দেশের ধন্য পুরুষ শেখ মুজিবর রহমান, '' যার নামের ওপর ঝরে/ মুক্তিযোদ্ধাদের জয়ধ্বনি'', তাঁকে সম্বোধন করে তাঁর অবর্তমানে বিনষ্ট সমকালের নানা অসঙ্গতির কথা অভিযোগ ও আক্ষেপের সুরে উপমা ও চিত্রকল্পে প্রকাশ করেন—

দেখ, একে একে, সকলেই যাচ্ছে বিপথে অধঃপাত
মোহিনী নর্তকীর মতো
জুড়ে দিয়েছে বিবেক-ভোলানো নাচ মনীষার মিনারে,
বিশ্বস্ততা চোরা গর্ত খুঁড়ছে সুহৃদের জন্যে
সত্য খান খান হয়ে যাচ্ছে যখন তখন
কুমোরের ভাঙা পাত্রের মতো,
চাটুকারদের ঠোঁটে অষ্টপ্রহর ছোটে কথার তুবড়ি,
দেখ, যে কোন ফলের গাছ

সময়ে-অসময়ে ভরে উঠছে শুধু মাকাল ফলে।
ঝলসে-যাওয়া গ্যাসের মতো শুকিয়ে যাচ্ছে মমতা
দেখ, এখানে আজ
কাক আর কোকিলের মধ্যে কোনো ভেদ নেই।
নানা ছল ছুতোয়
স্বৈরাচারের মাথায় মুকুট পরাচ্ছে ফেরেব্বাজের দল।
('ধন্য সেই পুরুষ', *অবিরল জলভ্রমি*)

যদিও প্রথম পর্বে ষাটের দশকে পশ্চিম পাকিস্তানী স্বৈরশাসনের প্রেক্ষাপটে লেখা 'টেলেমেকাস' কিংবা স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে বাংলাদেশের নানা অরাজকতার প্রেক্ষাপটে রচিত 'চাঁদ-সদাগরে'র মত শিল্প-সার্থক কবিতা কবি এ পর্যায়ে লেখেন না আর এবং পুরাণ বা অন্য কোনো বহিরাশ্রয় অবলম্বনের পরিবর্তে প্রত্যক্ষ প্রতিবাদে সরব হয়ে ওঠেন, তবু, সময়ের দাবিতে নান্দনিকতার দোহাই দিয়ে নির্বিবাদী থাকেননি। বিংশ মতাব্দরি প্রথম থেকেই প্রতীকী কবিতায় ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের ব্যবহার জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। বাংরা কবিতায় বিষ্ণু দে, সমর সেন, সুকান্ত ভট্টাচার্য, সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখের কবিতায শ্লেষ ও ব্যঙ্গ উপযোগিতার দাবি পূবণ করেও রসোত্তীর্ণ হযেছে। শামসুর রাহমানের এ পর্যাযের কবিতায় ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের প্রয়োগ সর্বাংশে শিল্প-সার্থক না হলেও বিরূপ সময়ের বদরাগী বীতংসরূপে তা শোষক-পক্ষকে হুল ফোটাতে সমর্থ হয়। কবির উদ্দেশ্যও ছির তাই। তবে, প্রতিবাদ করতে গিয়ে কবি কবিতার নান্দনিকতাকে একেবারে বর্জন করেননি। ইতঃপূর্বে ব্যবহৃত নানা আঙ্গিককেও তাঁর প্রতিবাদী শব্দ-ভাষার উপযোগী করে তোলেন। যেমন: শব্দ-পুনরাবৃত্তির পুরনো কৌশলে নানা উপমায় কবি তালিকাবদ্ধ করেন সময়ের নানামুখী সংকটকে—

এই এক সময়, যখন কেউ কারো আস্থাভাজন নয়।
এই এক সময়, যখন শ্বেতচন্দনের বদলে
গন্ধকের গন্ধ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে এবং গোলাপকে
হঠিয়ে ঘেটুফুল
সম্প্রসারণবাদীর ভূমিকায় কী দড়! এই এক সময়
যখন কোকিলের ঘাড় মটকে
কাক নিয়ে স্বৈরাচারীদের জয়োল্লাস দিক-দিগন্তরে।
. . .
এই এক ভয়ংকর সময়। যারা একনায়কের
স্তব করার বদলে নিন্দামুখর , তাদের পেছনে
লেলিয়ে দেয়া হচ্ছে ডালকুত্তা, যারা
কণ্ঠে তুলে নিয়েছে প্রতিবাদের ঝাঁঝালো ভাষা,
হাতে কল্যাণের পতাকা তারাই ক্রুশবিদ্ধ হচ্ছে বারবার।
('এই এক সময়', *টেবিলে আপেলগুলো হেসে ওঠে*)

শ্বেতচন্দনের বদলে গন্ধকের গন্ধ অর্থাৎ শান্তির বদলে যুদ্ধ-নৈরাজ্য, গোলাপকে হঠিয়ে ঘেটুফুলের উত্থান, অর্থাৎ চাটুকার ও অযোগ্যজনের উদ্বর্তন এবং কোকিলের ঘাড় মটকে দিয়ে কাক নিয়ে স্বৈরাচারীর পশ্চাদ্ধাবন মূলত সময়ের উল্টোরথকেই নির্দেশ করে। কবি সমান্তরাল কাঠামোয় সময়ের

সেই অসঙ্গতিকেই প্রকাশ করেছেন। 'নির্ধারিত কোনো তারিখ নেই' কবিতায় কবি রূপক ও প্রতীক ও আখ্যানের মধ্য দিয়ে যুগে-যুগে শোষক ও একনায়কের বিরুদ্ধে সর্বহারাদের নানা বিপ্লবের প্রয়াস, ব্যর্থতা ও পুনরায় নানা শক্তিতে উজ্জীবিত হওয়ার সংকল্পকে ব্যক্ত করেন। কবি আগন্তুক জিপসীর মুখে এক কাহিনি শোনান, যেখানে যুগ-যুগ ধরে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানো, প্রহরী সজ্জিত, সুরক্ষিত, সুউচ্চ, রহস্যময় এক প্রাসাদ কে ঘিরে বারবার সর্বহারার দলের সব বিপ্লব ব্যর্থ হয়ে যায়। প্রথমে একদল দাঁড়কাক হানা দেয় সেই প্রাসাদে। তাদের ধারালো চঞ্চু দিয়ে ছিন্ন-ভিন্ন করে দিতে চায় প্রাসাদের সব রহস্য। কিন্তু আপাদমস্তক দামী ধাতুতে মোড়া প্রহরীদের বন্দুকের গুলিতে তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। প্রাসাদের বাইরে পড়ে থাকে সেই দাঁড়কাকগুলোর শব। তারপর হঠাৎ একদল শিম্পাঞ্জি সেই প্রাসাদের উপর চড়াও হয় একদিন। তারাও পরাভূত হল। তার বহুদিন পর একদল মানুষ লঠিসোঁটা নিয়ে ছুটে যায় সেই প্রাসাদের দিকে। তাদেরও শোচনীয় পরাজয় ঘটে। সেই পরাস্ত লোকগুলোরই একজন, সেই জিপসির মুখে তবু ধ্বনিত হয় অব্যাহত বিপ্লবের বার্তা—''বিজয়ের কোনো নির্ধারিত তারিখ নেই''। বস্তুত, ওই কাকের দল, শিম্পাঞ্জির পাল, মানুষের দঙ্গলের ক্রিয়াকলাপ যুগে-যুগে নানা বিপ্লবের স্বপ্ন, প্রয়াস,ব্যর্থতা ও সংকল্পকে প্রতীকায়িত করে। কবি জিপসির আখ্যানের মধ্য দিয়ে পৃথিবীর বিপ্লবের ইতিহাসকেই প্রতীকায়িত করতে চেয়েছেন এবং আসন্ন বিপ্লবের স্বপ্নে উজ্জীবিত হতে চেয়েছেন ('নির্ধারিত কোনো তারিখ নেই', *টেবিলে আপেলগুলো হেসে ওঠে*)। 'কালদীর্ণ কোকিলের মত' কবিতায় কবি এক বিপ্লবী কবির মসীযুদ্ধের দৃশ্য অঙ্কন করেন কবি। সেই কবি, যাঁর মোহন ঐন্দ্রজালিক শব্দের জাদুতে হাজার-হাজার মানুষ পথে নামে বিপ্লবের সংকল্পে, যাঁর ইঙ্গিতে মুখ-থুবড়ে-পড়ে থাকা শহর প্রকম্পিত হয় শ্লোগানে-শ্লোগানে, আততায়ীর দল হয় ছত্রভঙ্গ, সে কবি শেষ পর্যন্ত স্বৈরশাসকে নির্দেশে নিক্ষিপ্ত হয় কারাগারে। কিন্তু, হাতকড়া, কয়েদখানার চার দেয়াল, চাবুকের ক্ষমাহীন আঘাত, ফাঁসি-কাষ্ঠ কিছুই অবদমিত করতে পারে না তাঁর বিপ্লবকে। কারণ, মৃত্যুর পরও কালদীর্ণ কোকিলের মত তাঁর গান ধ্বনিত হবে বিপ্লবের উজ্জীবনী মন্ত্ররূপে। কবির ভাষায়—

> উত্যক্ত হয়ে ওরা একদিন কবিকণ্ঠে
> পরালো মৃত্যুর ফাঁস ; আর কী আশ্চর্য, ফাঁসির মঞ্চে
> ঝুলন্ত কবির শরীরের প্রতিটি রোমকূপ থেকে বিচ্ছুরিত হলো
> কবিতার পর কবিতা, যেন মেঘকৃষ্ণ গর্জনশীল আসমানে
> বিদ্যুচ্চমক এবং সেই কবিতাবলি কালদীর্ণ কোকিলের মতো ডেকে ডেকে
> ভীষণ রক্তিম ক'রে তুললো নিজেদের চোখগুলো।
>
> ('কালদীর্ণ কোকিলের মতো', *অবিরল জলভ্রমি*)

এভাবে আখ্যানের সুরে নাটকীয়ভাবে কবি বিপ্লবের নানা মাত্রাকে উপস্থাপন করেন এবং বিশ্বব্যাপী স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের জয়কে প্রতীকান্বিত করেন। কবিতায় প্রতীকী দ্রোহ সঞ্চার করতে এইভাবে কবি অনেক কবিতায় দীর্ঘ আখ্যানসূত্রিতা অবলম্বন করেছেন। যেমন, 'গল্পটি আমার প্রিয়' কবিতায় গল্পচ্ছলে কবি এক কল্প-কাহিনীর অবতারনা করেন, যেখানে বিরাট এক রাজ্যের রাজা কথায়-কথায় শুলে চড়ান দ্বিধাহীন। সে দেশের কারাগার ছিল 'কানায় কানায় ভরা বানডাকা নদীর মতন' কয়েদীতে ঠাসা। প্রজারা সকলেই বশংবদ। রাজা দিন-রাত চাটুকার বেষ্টিত থাকতেন। তিনি ছিলেন দানখয়রাতেও উৎসাহী, দয়া পরবশ। সবাই রাজার প্রসাদ সংগ্রহে তৎপর অথচ এক সূর্যকান্ত বালক সব ভয় তুচ্ছ করে অবলীলায় তুচ্ছ করে রাজার প্রসাদ, বলে—''রাজা, তোর হাত থেকে নেব না কিছুই।''('গল্পটি আমার প্রিয়', *দেশদ্রোহী হতে ইচ্ছে করে*)। স্পষ্টতই অনুধাবন করা যায় যে, সেই আজব দেশের স্বৈর-রাজা বাংলাদেশের তদানীন্তন স্বৈরশাসকেরই অবিকল প্রতিকৃতি এবং ওই বিদ্রোহী বালকের প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে কবি মুক্তিকামী মানুষের প্রবল গণতন্ত্র-স্পৃহাই প্রতীকান্বিত করেন। রক্তপিপাসু স্বৈরাচারী সরকারের শিরস্ত্রাণ একদিন ধুলায় গড়াবে—এই কাঙ্ক্ষিত ছিল কবির। 'পাইথন' কবিতায় কবি এক স্বেচ্ছাচারী অজগরের প্রতীকে চিহ্নিত করেন স্বৈরাচারীকে এবং কামনা করেন একদিন প্রচণ্ড ভূমিকম্পে সেই পাইথনটা তার বিশাল শরীর নিয়ে তলিয়ে যাবে অতল খাদে—

তবে কি এখন শুরু হবে সেই ভূমিকম্প, যার ধমকে
টাল সামলাতে না পেরে
পাইথনটা নিজেই পড়ে যাবে অতল গিরিখাদে?
('পাইথন', *অস্ত্রে আমার বিশ্বাস নেই*)

ভূমিকম্পের মত কোনো বিপ্লব এসে পাইথনরূপী শোষককে পরাস্ত করবে এবং এদেশের জনগণকে গণতন্ত্রের রৌদ্রকরোজ্জ্বল প্রান্তরে পৌঁছে দেবে, কবির কবিতায় এই প্রতীকায়নের উদ্দেশ্য ছিল তাই। 'ঝড়' কবিতায় কবি ঝড়ের প্রতীকী চিত্রকল্পে স্বৈরাচার-বিরোধী গণঅভ্যুত্থানের এবং সেই আসন্ন প্রলয়ের পুঞ্জীভূত রূপ প্রকাশ করেছেন। কবির ভাষায়—

অকস্মাৎ আকাশের মুখে কালি ঢেলে ঝড় আসে
দিগন্ত কাঁপিয়ে লণ্ডভণ্ড চতুর্দিক, গেরস্তের
ঘর ভাঙে তাসের বাড়ির মতো, বুড়ো বট মুখ
থুবড়ে মাটিতে পড়ে শেকড়সমেত, যেন কোনো
স্বৈরাচারী শাসকের সিংহাসন ধূলায় লুটায়
দিগ্বিদিক রাজপথ-উপচানো গণঅভ্যুত্থানে।
('ঝড়', খুব বেশি ভালো থাকতে নেই)

১৯৮৭ সালের ১০ নভেম্বর বাংলাদেশে স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনকে জোরদার করতে নূর হোসেন নামক এক যুবক তাঁর বুকে-পিঠে '' স্বেরাচার নিপাক যাক গণতন্ত্র মুক্তি পাক'' লিখে ঝাঁপিয়ে পড়ে আন্দোলনে এবং পুলিশের গুলিতে শহীদ হন। নূর হোসেনের আত্মত্যাগ সেদিন এদেশের মানুষের গণতন্ত্র আদায়ের দাবীকে আরো সোচ্চার ও প্রবল করে দিয়েছিল। স্বৈরাচারীর ভিত নড়ে উঠেছিল এবং ১৯৯০ এ তার পতন নিশ্চিত হয়। শামসুর রাহমান *বুক তার বাংলাদেশের হৃদয়* কাব্যে নূর হোসেনের বুকে লেখা বিপ্লবী পঙ্‌ক্তিমালাকেই গণতন্ত্রের প্রতীকরূপে অংকন করেন। তাঁর কবিতায় নূর হোসেনের বুক হয়ে ওঠে বাংলাদেশের হৃদয়ের প্রতীক, ঠিক যেমন ৬৯' এর গণ অভ্যুত্থানে আসাদের শার্ট হয়ে উঠেছিল জাতির রক্তাক্ত পতাকার প্রতীক। কবির ভাষায়—

উদোম শরীরে নেমে আসে রাজপথে, বুকে-পিঠে
রৌদ্রের অক্ষরে লেখা অনন্য স্লোগান,
বীরের মুদ্রায় হাঁটে মিছিলের পুরোভাগে এবং হঠাৎ
শহরে টহলদার ঝাঁক ঝাঁক বন্দুকের সীসা
নূর হোসেনের বুক নয় বাংলাদেশের হৃদয়
ফুটো করে দেয় ;
('বুক তার বাংলাদেশের হৃদয়', *বুক তার বাংলাদেশের হৃদয়*)

কবি নিজেও এক নির্বাসিত অথচ দ্রোহী শিল্পী। কবি তাঁর সমস্ত ইন্দ্রিয়কে এবং তাঁর কলমকেও ধিক্কার জানান স্বৈরাচারীদের বিরুদ্ধে দ্রোহের দ্বিধায়। বারংবার জিজ্ঞাসাসূচক বাক্যে তিনি নিজেকেই বিদ্ধ করেন ('কবির নির্বাসন', *অস্ত্রে আমার বিশ্বাস নেই*)। মন্তব্যের পরিবর্তে কবিতায় উপর্যুপরি প্রশ্নবোধক বাক্যের প্রয়োগ ঘটানো হয়ে থাকে কবির নানা অভিব্যক্তি ও প্রতিক্রিয়ার তীব্র, ক্ষুব্ধ, ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গি প্রকাশে—বারবার আত্মজিজ্ঞাসার মাধ্যমে অবদমিত দ্রোহের প্রকাশ ঘটাতে। মূলত এইসব প্রশ্নের কোনো উত্তর প্রত্যাশা করেন না কবি। কারণ, প্রশ্ন আর উত্তর এই দু'য়ের মাঝখানে থাকে তাঁর সোচ্চার অনুভূতি। 'কেন মানুষের মুখ' কবিতায় গণমানুষের অব্যক্ত নানা রক্তাক্ত জিজ্ঞাসাকে ছুড়ে দেন কবি এই রীতিতে, অনুভূতির একাত্মতা নিয়ে—

কেন মানুষের মুখ বারবার ম্লান হয়ে যাবে?
কেন আমাদের হাতে পায়রা পাথর হয়ে যাবে?
মুখের ভেতরে কেন অমাবস্যা ঊর্ণাজাল বুনে
যাবে ক্রমাগত? যোদ্ধাবেশে শত শত
কংকাল সওয়ার হয়ে আসে
কেন রাতে ভৌতিক ঘোড়ায়?
কেন আমাদের
এত মৃত্যু দেখে যেতে হবে অসহায় ভঙ্গিমায়?
('কেন মানুষের মুখ', *অবিরল জলভ্রমি*)

শামসুর রাহমান এ পর্যায়ে তাঁর কবিতার যে নান্দনিক বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করেন, তা বিপ্লবাত্মক। নিজের কবিতাকে তিনি এবার 'পাৎলুন গোটানো, খালি পা'য়ের ব্রাত্য কবিতা বলে উল্লেখ করেন। তিনি তাঁর কবিতাকে দেখতে চান এবার 'সতেজ রক্তজবা'র সাজহীন অপরূপ সাজে। '' ক্ষতিপূরণের দাবি না তুলেই গুলিবিদ্ধ বীরের ধরনে খুঁড়িয়ে চলে কবির জেদী পদ্য। যদিও কবি এ পর্যায়ে মনে করেন কবিতাকে সালঙ্কারা হবার প্রয়োজন নেইএবং ন্যাকা মিল বা 'ন্যালাক্ষপা' অনুপ্রাস থেকে সাত হাত দূরে থাকাই কবিতার জন্য শ্রেয়, তবু কদাচিৎ কিছু উপমা-চিত্রকল্প লক্ষ করা যায় তাঁর কবিতায় নতুন বৈশিষ্ট্যে। এ পর্যায়ের কবিতায় উপমা- চিত্রকল্পে প্রায়শই লক্ষ করা যায় বিপ্লবী অনুষঙ্গ। যেমন নিম্নোক্ত চিত্রকল্পটিতে অনুদ্ভাসিত ভোরকে তুলনা করা হয় স্বাধীনতার স্বপ্ন বুকে লুকিয়ে থাকা বিপ্লবীর সাথে—

ভোরবেলা এখনো গা ঢাকা দিয়ে আছে দূরে কোনো
বিপ্লবীর মতো
দুর্নিবার প্রত্যাশায়।
('ঘুমোতে যাবার আগে', *স্বপ্নেরা ডুকরে ওঠে*)

যখন সময়ের সন্ত্রাস কবির চেতনা জগৎকেই সম্প্রকাশী হতে বাধ্য করে—কবির চোখে বাগানের ফুলগুলো হঠাৎ করোটি হয়ে যায় আর বৃক্ষরাজি কঙ্কাল। যখন গোধূলিতে সেই বাগান উগরে দেয় রাশি রাশি শব, আমাদের অতীত বিপ্লবগুলোর এবং যখন কবি তাঁর কালের সন্ত্রাসকে প্রত্যক্ষ করেন 'শেয়ালের দাঁতে বিঁধে থাকা যুবাদের হৃৎপিণ্ডে'র ভয়াবহ বিকৃতিতে, তখন অবধারিতভাবে কবির কবিতার চিত্রকল্প অভিব্যক্তিপ্রবণ হয়ে ওঠে। কবির কাছে নদী হয়ে ওঠে শ্মশান আর ভাটিয়ালী গান শোনায় শোকগাথার মত। তখন তাঁর কাছে আকাশ আর নীলাম্বরী থাকে না, নানা ভয়ার্ত চিত্রে হয়ে ওঠে রক্তিম, উদভ্রান্ত—

আকাশ তো আগের মতোই নীল রঙে
ভরপুর, তবু তাকাই না
আকাশের দিকে রাত জেগে। তারাগুলি
ডাইনির চোখের ধরনে চেয়ে থাকে,
এবং গর্জনশীল নদী বারবার
ভীষণ কামড়ে ধরে কাজল মাটির ঘাড়, দেবদূতগণ
খেঁকশিয়ালের মতো হয়ে যান দ্রুত।
কখনো কখনো
মেঘ ফেটে রক্ত ঝরে, কয়েকটি লাশে
ঢেকে গেছে আমাদের সমস্ত আকাশ।
('এখন নিজেকে বলি', *অবিরল জলভ্রমি*)

এভাবে অজান্তেই কবির কবিতার চিত্রকল্পগুলো কখনো কখনো অস্বাভাবী হয়ে ওঠে। আরোগ্যশালায় বসে একইভাবে সারাদেশকেই কবির মনে হয় এক অসুস্থ প্রাণ, চাঁদকে মনে হয় 'ডাগর ক্ষতে'র মত ('রাতের ক্লিনিক', *অবিরল জলভ্রমি*)। যখন প্রিয় স্বদেশ কবির চোখের সামনে আর্তনাদ করে ওঠে, তখন কবিও হয়ে ওঠেন গলায় রক্ত তোলা এক কোকিলের মত। কখনো স্বৈরাচারী শোসকের নিয়ন্ত্রণে কবি তাঁর কণ্ঠের অবরুদ্ধতার জ্বালাকে প্রকাশ করেন এক পথভ্রষ্ট কোকিলের অরন্তুদ পরিণামে—

কে দেখাবে লয় ও তানের
কারুকাজ? সহজে ফোটে না আর এখানে গানের
ঝর্ণাস্নাত কুঁড়ি,
কোকিলের কণ্ঠে কারা দিয়েছে প্রবল ঠেসে নুড়ি।
ঝরে যায়, দিন ঝরে যায়,
অবিরল রক্ত তুলে গলায় কোকিল আজ নিয়েছে বিদায়।
('পথভ্রষ্ট কোকিল', *খুব বেশি ভালো থাকতে নেই*)

চতুর্থ পর্যায়ের কাব্যে শামসুর রাহমান তাঁর কবিতাকে বিপ্লবী পঙ্‌ক্তিমালা করে তুলেছেন। শব্দকে আয়ুধ আর প্রকাশভঙ্গিকে করে তুলেছেন বিধ্বংসী। কিন্তু, নান্দনিকতাকে একেবারে বর্জন করেননি। কারণ, সমাজের প্রতি কবির দায়বদ্ধতাকে তিনি যেমন অস্বীকার করেন না, তেমনি, শিল্পগুণ-বর্জিত, কেবল দ্রোহসর্বস্ব কবিতাকেও নিরর্থক বলে মনে করেন কবি। কবির ভাষায়—

> আমি মনে করি একজন কবি ভালো কবিতা লিখতে পারলেই তিনি দায়বদ্ধতার পরিচয় দেন। যদি তিনি জনসভা কিংবা মিছিলে যোগ দিয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে স্লোগান দেন, তাহলে সেটা হবে তার অন্য প্রকার নাগরিক হিসেবে দায়িত্ব পালন। আমার বলার উদ্দেশ্য এ নয় যে, কবি গজদন্তমিনারবাসী হয়ে সাদা কাগজে আকাশকুসুম সৃষ্টি করবেন। তিনি যেমন প্রেমের কবিতা লিখতে পারেন, গাছ-গাছালি, ফুল, পাখি, মাঠ, নদী ইত্যাদি নিয়ে লিখতে পারেন, তেমনি অনাচার, স্বৈরাচার ইত্যাদি ইত্যাদি বিষয়ে লেখারও অধিকার আছে তার। কিন্তু শর্ত একটাই। সেই রচনাকে অবশ্যই কবিতা পদবাচ্য হতে হবে।...রিল্‌কে মানুষের আত্মার গহনের ডুবুরি, এলুয়ার প্রেমবিষয়ক অসাধারণ পঙক্তিমালার স্রষ্টা বটে, কিন্তু জনগণের সংগ্রামেরও রূপকার। কিন্তু তাঁর কবিতা শ্লোগান নয়। আমরা উভয়ের কবিতা পড়তে ভালোবাসি (শামসুর, ২০০২, ২৮-২৯)।

সুতরাং, সর্বদা শিল্প-সচেতন কবি দৈশিক সংকটে গণতন্ত্রকামী জনতার সাথে সমস্বরিক হতে এ পর্যায়ে বিপ্লবী কবিতা রচনা করেছেন এবং নান্দনিক সূক্ষ্মতা অপেক্ষা সময়ের দাবিকে অধিকতর প্রাধান্য দিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-শ্লোগানে শব্দ-ভাষাকে যথাসম্ভব সরল ও প্রত্যক্ষ করে তুলেছেন বটে, কিন্তু যে মৌলিক শর্তে রচনা কবিতা পদবাচ্য হয়ে ওঠে, সে শর্তকে তিনি অগ্রাহ্য করেননি।

তথ্যপঞ্জিঃ

মনজুরুল ইসলাম সৈয়দ (২০১০) ''পুনর্নির্মাণের আয়োজন : শামসুর রাহমানের সাম্প্রতিক কবিতা'' *শামসুর রাহমান স্মারক গ্রন্থ*, [সম্পা. শামসুজ্জামান খান ও আমিনুর রহমান সুলতান] বাংলা একাডেমী, ঢাকা পৃ. (১০৩-১১০)

মীজানুর রহমান (জানু-মার্চ ১৯৯১) ''চরিত-কথা: প্রাসঙ্গিক বিষয়'', *মীজানুর রহমানের ত্রৈমাসিক পত্রিকা*, শামসুর রাহমান সংখ্যা, ষষ্ঠ বর্ষ ৩য় সংখ্যা, উ বি নী গ, ঢাকা, পৃ. (৩৪৯-৩৬৩)

শামসুর রাহমান (২০০৭) *কালের ধুলোয় লেখা*, (রোজনামচা অংশ), অন্যপ্রকাশ, ঢাকা

শামসুর রাহমান (২০০৬) ''চাই পারমাণবিক অস্ত্রমুক্ত দুনিয়া'', *কবে শেষ হবে কৃষ্ণপক্ষ*, একুশে বাংলা প্রকাশন, ঢাকা, পৃ. (১৮৩-১৮৪)

শামসুর রাহমান (জুলাই, ২০০২) ''কবিতার দায়'', *কিছুধ্বনি*, কবিতা পত্র, শামসুর রাহমান সংখ্যা, [সম্পা. আনওয়ার আহমদ] মারিয়া প্রিন্টার্স, বগুড়া, পৃ.(২৭-২৯)

শামসুর রাহমান (২০০৪) ''কিছু কথা'', *শামসুর রাহমান রচনাবলী*-১, [ভূমিকাংশ] ঐতিহ্য, ঢাকা

Eliot, T.S.(1969) *On Poetry and Poets*, Faber and Faber Limited, London

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ পঞ্চম পরিচ্ছেদ
ব্যক্তি-সত্তার নানা রূপান্তরঃ আধুনিক রীতির প্রয়োগকলা

১৯৯১ থেকে ২০০৬ পর্যন্ত শামসুর রাহমান তাঁর সমকালীন বাস্তবতা ও অন্তর্বাস্তবতা প্রকাশে মিশ্র নান্দনিকতার আশ্রয়ী। মূলত, কোনো বিশেষ নন্দন স্বভাবের আধিপত্য কিংবা তার উৎকর্ষের পরিবর্তে নান্দনিক বৈচিত্র্যই তাঁর এ পর্যায়ের কাব্যস্বভাব। এ পর্বে কখনো বাস্তবকে অবিকৃত রেখে কবি তাঁর অভিজ্ঞতার প্রতিফলন ঘটিয়েছেন, কখনো অন্তর্বাস্তবতার নানা স্বভাবে মূর্ত হয়েছে তাঁর শব্দ-ভাষা। কল্পনা, উদ্ভাসন ও রূপান্তর প্রক্রিয়ায় (transmutation) বিদ্যমান বাস্তবতাকে কল্প-বাস্তবতায় পরিবর্তনের 'টেকনিক'টি এ পর্যায়ের কবিতার নতুন নন্দন-লক্ষণ। গদ্য-সনেট, গদ্যভাষা, মিশ্র ছন্দ ও টানা গদ্যে নানাভাবে কবি প্রকাশ করেছেন তাঁর এ সময়ের কাব্য-ভাবনাকে।

শামসুর রাহমান তাঁর এ পর্যায়ের কবিতায় পূর্বের করণ-কৌশলের সাথে বিভিন্ন মাত্রায় সংশ্লেষণ ঘটাতে চেয়েছেন নতুন রীতির। কারণ, কবির অবচেতন ঘোরে শ্বেত শ্মশ্রুমণ্ডিত অমিতকান্তি কবি রবীন্দ্রনাথ এসে চুপিসারে বলে যান, 'তোমার কাব্য ভাষায় সেই স্পর্শ আনতে চেষ্টাশীল হও' যা সমকালীন বাংলা কবিতায় গরহাজির ('বদলাতে থাকে', *ছায়াগণের সঙ্গে* কিছুক্ষণ)। দীর্ঘদেহী কবি পল এলুয়ার কবিকে পরামর্শ দেন—'জড়ো করো দড়িদড়া ভাঙা কাঠ। আবার বানাও নাঙা গায় নতুন আঙ্গিকে নাও' ('ভ্রমণ', *ছায়াগণের সঙ্গে কিছুক্ষণ*)। কবি তাঁর অধুনা কবিতার প্রকরণে যোগ করতে চেয়েছেন নতুন মাত্রা। কবি কবিতার আধুনিক প্রপঞ্চটি সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। কখনো-কখনো তিনি হেসে 'কবিতার ঢেউয়ে ভেসে চকিতে উত্তর-আধুনিক' কিন্তু কবি মূলত কবিতার নিজস্ব বিবর্তনেই আস্থাবান । তাই উত্তরাধুনিক কোলাহলেও কবি সুগভীর নির্বেদে উচ্চারণ করেন তাঁর অভিসন্ধি—'কাদাতেই ফুল ফোটানো আমার ব্রত' ('আমার ব্রত', *তোমাকেই ডেকে ডেকে রক্তচক্ষু কোকিল হয়েছি*)। মূলত, আধুনিক ও উত্তরাধুনিক বাংলা কাব্যধারার মধ্যবর্তী অবস্থানে দাঁড়িয়ে একাকী একটি নতুন নান্দনিকতায় কবিতাকে বহমান করে তুলতেই প্রয়াসী ছিলেন শামসুর রাহমান। উত্তরাধুনিক কবিতাকে কবি কল্পনা করেন স্বপ্নে দেখা এক 'কাঠের ঘোড়া'রূপে, যে রীতির শেকড় ধরে টান মারে, ভাঙচুর সমর্থন করে, ভাষাকে ক্রীড়াপরায়ণ করে, রূপকল্পে আনে আলোড়ন এবং ঐতিহ্যের পথে হাঁটে ('কাঠের ঘোড়া', *তোমাকেই ডেকে ডেকে রক্তচক্ষু কোকিল হয়েছি*)। অবচেতনভাবে তাঁর কবিতায় কিছু উত্তরাধুনিক সংলক্ষণের অনুপ্রবেশ ঘটলেও তাঁকে বলা যেতে পারে

বাংলা আধুনিক কবিদেরই শেষ উত্তরসূরী। কারণ, উত্তরাধুনিকদের মত বাস্তবতা-নিরপেক্ষ কোনো 'অ্যান্টি-রিপ্রেজেন্টেটিভ' ভাবনাকে তিনি স্বীকরণ করেন নি তাঁর কাব্যে। তাঁর ভাষায়—

> যে-দেশে রজব আলী চাষির সানকিতে আজ কী শাদা কী লাল কোনও ভাতই ফুটে থাকে না ফুলের মতো, রজব আলীর বউ রাহেলা ছেঁড়া শাড়ি পরে হি হি কাঁপে শীতে যে-দেশে, যে-দেশে নাছোড় অপুষ্টিতে দৃষ্টি হারায় অগণিত শিশু, যে-দেশে ফতোয়াবাজদের মধ্যযুগীয় উৎপীড়নে, পাথর ও দোররার আঘাতে সিলেটের নূরজাহান এবং তারই মতো আরও কোনও কোনও বঙ্গ-দুহিতার মৃত্যুকালীন আর্তনাদ রোদে পোড়ে, বৃষ্টিতে ভেজে, বেনো জলে ভাসে, যে-দেশে ইয়াসমিনের মতো কোমল মেয়ে পুলিশের পৈশাচিক হি-হি হা-হা ধর্ষণের পরে খুন হয়, সে-দেশে আধুনিকতা এবং উত্তর-আধুনিকতা নিয়ে বুধবৃন্দ ও কবিকুলের বাহাস এক তুমুল তামাশা ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না।
>
> ('ইতিহাসের মোড়ে দাঁড়িয়ে ডাকছি', *মেঘলোকে মনোজ নিবাস*)

এ পর্যায়ে কবি দৈশিক ও বৈশ্বিক বাস্তবতাগুলো সম্পর্কে সচেতন, বিশেষত, ধর্মান্ধতা, সাম্প্রদায়িকতা, রাজনৈতিক অস্থিরতা, বিবর্ধমান সন্ত্রাস ও নৈরাজ্য কবিকে মর্মাহত করেছে। প্রতিক্রিয়াশীলতার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ শিকার তিনি নিজেও নানাভাবে হয়েছেন তাঁর সমকালে। অসংখ্য কবিতায় সরাসরি তিনি সে-সব নৈরাজ্যের চিত্র এঁকে গেছেন। ফলে, কবিতার নান্দনিক উৎকর্ষের প্রশ্নেও বিদ্ধ হয়েছেন বারংবার, নিজের প্রকাশের সীমাবদ্ধতাও কখনো-কখনো পীড়িত করেছে কবিকে। কিন্তু, চোখের সামনে বখে যাওয়া সমাজ রাষ্ট্রের বিপন্নতায়, নানা অন্তর্গত নিরাশ্রয়তার কথা, কবির অন্তর্জগতের নানা অভিঘাতকে তিনি কবিতার পর কবিতায় উৎকীর্ণ করে গেছেন এক ধরনের আত্মিক দায়বদ্ধতায়। ২০০৪ সালে তাঁর রচনাবলীর প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় দেশের বিরাজমান নৈরাজ্য ও সংকট নিয়ে প্রবল আক্ষেপ করে কবি লিখেছিলেন—

> আজ যখন রচনাবলীর ভূমিকা লিখছি, তখন মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারীরা রাষ্ট্রক্ষমতার অংশীদার। এই রাজনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে-সঙ্গে সংখ্যালঘু ও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষশক্তির লুণ্ঠন আর ধর্ষণের তাণ্ডবে স্তব্ধ হতে দেখেছি ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইলকে। একদিন যে-কলমে লিখেছিলাম ''বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে'' সেই কলমেই ফের লিখতে বাধ্য হয়েছি ''ভাঙাচোরা চাঁদ মুখ কালো করে ধুঁকছে''। (শামসুর, ২০০৪: ভূমিকাংশ)

কিন্তু সমূহ তমিস্রা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত কবি হতাশায় নিমজ্জিত হননি। বরং,'অন্ধকার থেকে আলোয়' উত্তরণের আশায় কবি একা একা নানা সংকটসমূহকে চিহ্নিত করে গেছেন। অশান্ত সময়ে কবি বারবার যিশু, লালন, সক্রেটিস, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি মনিষীর কথা স্মরণ করেছেন। একটি স্থিতিশীল সমাজের স্বপ্নে বেঁচে থাকতে চেয়েছেন। ফলে, সবক্ষেত্রে কবির নান্দনিকতা কোনো উৎকর্ষে উপনীত হয়েছে, তা নয়, তবে, এ পর্যায়েও কবি তাঁর কবিতায় নানা নিরীক্ষা অব্যাহত রেখেছেন—বিশেষত,

যে-সব কবিতায় দৈশিক সংকটের নানা অভিঘাত কবির অন্তর্বাস্তবতায় রূপান্তরিত হয়ে নতুন কল্প-দৃশ্যের জন্ম দেয়, সেই কবিতাগুলোতে শামসুর রাহমানের নান্দনিকতার নতুন আস্বাদ অনুভব করা যায়।

এ পর্যায়ে স্বপ্নের স্বায়ত্বশাসন মেনে নেন কবি। বিচিত্র স্বপ্ন ও দুঃস্বপ্নের অভিঘাতে তাঁর দৃশ্যজগৎ প্রায়শই রূপান্তরিত হয় এক অলীক জগতে, তার মধ্যে বিভিন্ন অনুপাতে মিশে থাকে সমকালীন বাস্তবতা। কবির এ পর্যায়ের কবিতায় প্রকৃতি জড় স্বভাব ভুলে মানুষের মত আচরণ করে। কখনো কবি মধ্যরাতে ঘুম ভেঙে দেখেন পাশের বাড়িটা দু'টি শাদা ডানা পেয়ে চকিতে উড়াল দেয় মেঘে ('মধ্যরাতে ঘুম থেকে জেগে', *তোমাকেই ডেকে ডেকে রক্তচক্ষু কোকিল হয়েছি*)। কবির কল্পনায় প্রকৃতি, পরিপার্শ্ব ও বস্তুজগতের কল্পনাত্মক রূপান্তর ঘটে যায়। তখন তাঁর কবিতায় দরজা-জানালা মুখ খিচিয়ে রয়, টেবিলটা বিড়বিড় করে, গাছগুলো কখনো হেঁটে যায়, কখনো উড়ে যায় নীলিমায়—কালপুরুষের সাথে নাচ জুড়ে দেয় মধ্যরাতে, 'প্রবীণ প্যাঁচা চালায় বুরুশ নিসর্গের ঘন চুলে—মলিন পাঞ্জাবি পরে চাঁদ মহাশূন্যে বসে স্বরচিত কবিতা পড়ে এবং শ্রোতাহীনতার হতাশায় আবার নেমে আসে কবির ঘরে, টেবিলের নীচে—

> গাছগুলি হেঁটে গিয়ে গলি ছেড়ে চায়ের দোকানে
> থামে, কিছু কথা ডানেবামে বলাবলি করে
> পরস্পর; চায়ের পিপাসা নেই, উড়ে
> যায় দূরে নীলিমায় নক্ষত্রসভায়।
> ...
> এ মর্ত্যের গাছ
> কালপুরুষের সঙ্গে নাচ জুড়ে দেয় মধ্যরাতে,
> যখন প্রবীণ প্যাঁচা চালায় বুরুশ নিসর্গের ঘন চুলে।
>
> লার্গাকটিলের টিলা থেকে
> গড়িয়ে গড়িয়ে দেখি মলিন পাঞ্জাবি পরে চাঁদ
> নিজের কবিতা পড়ে মহাশূন্যে, শ্রোতাহীনতায়
> হতাশায় নেমে আসে এই ঘরে টেবিলের নিচে।
> ('জনৈক মানসিক রোগীর খাতার কয়েকটি পাতা', *হেমন্ত সন্ধ্যায় কিছুকাল*)

'জনৈক মানসিক রোগীর খাতার পাতা' কবিতায় কবি প্যারানয়ার রোগীর দৃষ্টিকোণ থেকে প্রকৃতিকে করে তোলেন জীবন্ত এবং নিজের অজান্তেই কবির চেতন-অবচেতনের মানসভাষ্য তার সাথে একীকৃত হয়। মূলত, কবি কোনো মানবিকীকরণের অভিজ্ঞতাকে প্রকাশ করেন না এইসব ক্ষেত্রে, বরং এক ধরনের কল্পনাত্মক অভিব্যক্তিকে সংবেদী বাস্তবতারূপে নির্মাণের প্রয়াস পান। শামসুর রাহমান লোর্কা'র মত প্রকৃতি জগতের রূপান্তর সাধন করেন তাঁর কবিতায়। লোর্কা'র কবিতায়

''প্রাণীপতঙ্গের রহস্যজগৎ মানুষের রক্তে নিঃশ্বাসে পুরাণে স্বপ্নে বিচিত্র রূপান্তর হয়ে উঠেছে যে ক্ষণে ক্ষণে, রোমান্টিক বিভ্রমের অনুরব হয়ে আছে আলো, ফুলপাথরও কথা বলে ওঠে মানুষ ভাষায়'', তেমন বিভ্রম ও রূপান্তর লক্ষ করা যায় রাহমানের কবিতায়ও (দেবীপ্রসাদ, ১৯৯২: ভূমিকা)। লোর্কা'র কবিতায় যেমন দেখা যায় তরুশ্রেণী রোমন্থনরত, মাঠের পাপলার গাছ চাঁদের বীণা বাজাতে বাজাতে হাত ওঠায়, ধুলোট রাস্তায় সবুজাভ ফ্রক-কোট পরা গিরিগিটি লামার্তিনের কবিতার বই হাতে দাঁড়িয়ে থাকে বুড়ো মাস্টরমশাইয়ের মত, গিটারটি অবিরাম কেঁদে চলে, তেমনি রাহমানের কবিতায় শোনা যায় গাছ তরুনীর বিয়োগ ব্যাথার কাহিনী, টেবিলের কান্না, খাতা-কলমের দ্বন্দ্ব, কামনাকাতর চশমার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, কবিতার খাতার উড়াল ও বিচিত্র ভ্রমণ, বিদ্রোহী পাউরুটিগণের সংকল্প কিংবা কবিতার অলিখিত পঙ্‌ক্তিগুলোর দৌরাত্ম্য । কবি কল্পনা করেন তাঁর লেখার খাতা আর কলমের মধ্যে ভীষণ বিবাদ চলছে ('খাতা আর কলমের বিবাদ', *স্বপ্ন দুঃস্বপ্নে বেঁচে আছি)*। কবির কবিতার পরিত্যক্ত পঙ্‌ক্তিগুলো সবুজাভ কয়েকটি গলিত হাত হয়ে দেয়াল ফুঁড়ে বের হয়ে আসে। তারা দুর্বোধ্য ভাষায় কথা বলে যায়, তারপর একসময় সেই হাতগুলো রূপান্তরিত হয় নানা সতেজ ফুলে। কবি তাঁর তন্ময়তার ভেতর দিয়ে এক নতুন বাস্তবতাকে প্রত্যক্ষ করতে চান—

অকস্মাৎ
চোখে পড়ে—চার দেয়ালের বুক ফুঁড়ে আটটি পুরনো হাত
প্রায় পচে-যাওয়া, সবুজাভ,
বেরিয়ে এসেছে আর হাতগুলো কেমন বাচাল হয়ে ওঠে,
যদিও অবোধ্য সেই ভাষা।
...
সবুজাভ গলিত আটটি হাত কলরব থামিয়ে আমার দিকে আসে
ওদের আঙুল থেকে নক্ষত্রের কণা,
চাঁদের রূপালি ধুলো ঝরে, পচা মাংস থেকে
কৃমির বদলে নানা সতেজ ফুলের জন্ম হয়। বলে ওরা,
এবার ওদের ভাষা বোঝা যায়, 'আমরা তোমার
অলিখিত কবিতার পরিত্যক্ত পঙ্‌ক্তি, কবি,
অবহেলা আর উপেক্ষায় আজ আমাদের হয়েছে এ হাল।
('পরিত্যক্ত পঙ্‌ক্তির কথা', *স্বপ্ন ও দুঃস্বপ্নে বেঁচে আছি*)

এভাবে কবি তাঁর নৈর্ব্যক্তিক চেতনাকে কোনো অদ্ভুত বস্তু বা দৃশ্যের আশ্রয়ে মূর্ত ও বাঙ্ময় করে তোলেন। কবির মাথার ভেতর কখনো তাঁর কবিতার খাতার পাতাগুলো ঝোলে রক্তপায়ী বাদুড়ের মত—পঙ্খীরাজে চড়ে উড়ে যায় চাঁদ আর কালপুরুষের দেশে, সৌরলোকে, ছায়াপথে—পর্বতচূড়ায় বসে হয়ে যায় কোনো তরুণ ঈগল, যোঝে কোনো সাপের সাথে ('পর্যটন', *হেমন্ত সন্ধ্যায় কিছুকাল*)। কবিতার খাতার এই অন্তরীক্ষ-পর্যটন অস্বাভাবিক হয়েও খাঁটি ও বাস্তবসম্মত হয়ে ওঠে। কারণ, কৌশলের চেয়ে কল্পনাকেই কবি অধিক গুরুত্ব দেন। যে বাস্তবকে খালি চোখে দেখা যায় না,

কবি তাকেই কল্পনা করে যান অনায়াসে। মূলত কবি তাঁর নৈর্ব্যক্তিক অভিব্যক্তির দৃশ্যায়ণ ঘটান এই নতুনতর বাস্তব পদ্ধতিতে। যেমন, কবি প্রকৃতির বা বস্তু জগতের 'অবজেক্ট'গুলোকে তার পরিপার্শ্ব থেকে আপাতভাবে বিচ্ছিন্ন করে নতুন কোনো কল্পনায় অন্যরকমভাবে তাদের সঞ্চরণশীল করে তোলেন। কবিতায় গাছপালা, দেয়াল, খাতা, কলম বই কথা বলে ওঠে, নানা অভিব্যক্তি প্রকাশ করে। কবি পাউরুটির মধ্যে সঞ্চারিত করেন উদার মানবিকতাবোধ। তালাবদ্ধ কনফেকশনারির ভেতর বিদ্রোহী পাউরুটিগণের সভা বসে রাতের অন্ধকারে। অতঃপর পাউরুটিরা উড়ে চলে নীলিমায়, সবুজ বনের পথে এবং একসময় তারা নেমে আসে ক্ষুধার্ত, ঘুমন্ত কয়েকটি মানব সন্তানের কাছে উৎসর্গীকৃত হতে—

পাউরুটিগণ উড়ে উড়ে যাচ্ছে ডাগর রাত্তিরে
নক্ষত্রের জ্বলজ্বলে মহল্লায়, সুনীল সমুদ্রতীরে, সোমথ
নদীর
বুক ছুঁয়ে, আহত বনের গাছ এবং পাখির নীড়ে কিছু
আদর বুলিয়ে; উড্ডয়নের ক্লান্তি নেই দ্রোহীদের।

আখেরে উড়ন্ত পাউরুটিগণ নামে ভালোবেসে
ধূসর মাটিতে
যেখানে নির্ঘুম ছটফট
করছে ক্ষুধায় ক'টি মানবসন্তান।
('পাউরুটিগণ', *হৃৎপদ্মে জ্যোৎস্না দোলে*)

কবি চেনা জগতকে ভিন্ন স্বভাবে জীবন্ত করে তোলেন। কখনো কবির কবিতায় কোনো প্রাচীন গ্রন্থ হাই তোলে, ঘুমে ঢলে পড়ে, পরক্ষণেই গ্রন্থটি রূপান্তরিত হয় কারো মুখে। সেই মুখ থেকে বিচ্ছুরিত জ্যোতিতে কবির ঘরের টেবিলটি পরিণত হয় একটি জ্যোতির্ময়, প্রশস্ত কেদারায়। অতঃপর পুস্তকটি উধাও হয় এবং কবির সমস্ত ঘরে গুঞ্জরিত হয় এক অপরূপ সুর ('একটি প্রাচীন গ্রন্থ', *শুনি হৃদয়ের ধ্বনি)*। এমনিভাবে, কবির চেতনায় চলে অলৌকিক উদ্ভাসন, এক অদ্ভুত ক্রমরূপান্তর, চেতনা ও তন্ময়তার মেলবন্ধনে নতুনতর প্রত্যক্ষণ, যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে একটি নতুন কাঠামোর জন্ম দেয় এ পর্যায়ের কবিতায়। জগৎ বা সমকাল সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব ধারণা বা প্রতিক্রিয়ার পরোক্ষতাকে কবি এই পদ্ধতিতে নিকটতর ও অবিচ্ছেদ্য করে তোলেন তাঁর কবিতার রূপান্তরিত এই বস্তুজাগতিক বহিরাশ্রয়ে। ফলে, জগৎ সম্পর্কে কবির যাবতীয় প্রত্যক্ষণ নবত্ব লাভ করে এই নতুন 'ফর্মে'। যেমন, কবি রাত্রিকে জান্তব করে তোলেন প্রাণী-স্বভাবে নিম্নরূপে—

কালো রাত্রি আগুন রঙের চোখ ভীষণ পাকিয়ে
ওৎ পেতে ছিল,
নিচু হয়ে আসা আকাশের

কোঁচকানো ভুরু থেকে কিছু
কালো ঝরেছিল।
অকস্মাৎ লাফ;
লালাসিক্ত মুখের গহ্বরে পোরা হ'লে
একটি কাহিনী ভাঙা কলসের পানির ধরনে
গড়িয়ে গড়িয়ে চিহ্নহীন হতে পারে।

বুভুক্ষ নিশীথ আচানক ভীষণ হিংসুটে সেজে
তিরাশিটি বছরকে নিজের গুহায়
এক ঝটকায় গ্রাস করবার ব্যর্থতায় আরো
কুচকুচে; নিদ্রহীন অনেক চোখের
আর্দ্রতার নিচে
শীতের পাতার মতো কম্প্রমান তিরাশি বছর।
('তিরাশি বছর', *হেমন্ত সন্ধ্যায় কিছুকাল*)

যদিও রাত্রির এই অভিনব সম্প্রকাশধর্মী চরিত্র কবির তিরাশি বছরের জীবনের সাথে প্রতীকী অর্থে সম্পৃক্ত, তবু সেই নিশীথ কবির স্বপ্ন-কল্পনার সাথে মিশে সমাসোক্তিপ্রবণ হয়ে ওঠে হিংস্র-কুটিল, কালগ্রাসী সত্তায়। কবি প্রাকৃতিক অনুষঙ্গকে উপমারূপেও ব্যবহার করেন—'শূন্যতা আমার দিকে রাতের প্যাঁচার মত খুব/ একাগ্র তাকিয়ে থাকে'। মূলত, কবির অক্লান্ত কল্পনা-প্রবণতাই তাঁর কবিতার এই নতুন সংবেদী চারিত্র্য নির্মাণ করে। একে বিমানবিকীকরণ স্বভাব মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে, কবির কবিতার এই নতুন নন্দন-স্বভাব কবিতার অতি চেনা পুরনো প্রবণতারই নতুন রূপ-নির্মাণ। রোমান্টিক কবিরা সমাসোক্তির প্রয়োগ ঘটিয়ে যেভাবে প্রকৃতিকে সংবেদী করে তুলতেন, শামসুর রাহমান সেই প্রবণতাকেই বিস্তৃততর ও আধুনিক রূপ দিয়েছেন এই কবিতাগুলোতে। সমাসোক্তি থেকে কবি কখনো এক অন্তর্নিহিত পরাবাস্তবতায় বিচরণ করে আবার বাস্তবতায় ফিরে আসেন। যেমন, কবি তাঁর কবিতার খাতাটাকে উড়ে যেতে দেখেন পক্ষীরাজে চেপে দূর আকাশে এবং খাতাটি ভ্রমণ করে আসে সৌরলোক, ছায়াপথ, ভাঙা বাড়ি, বুনো ঝোপ, মেঘ আর 'পূর্ণিমা রঙের মানবীয় ঠোঁট' ও ফুলের সৌরভ নিয়ে উড়ে ফিরে আসে কবির টেবিলে। কবি তাঁর কল্পনাকে অবমুক্ত করে দেন মর্ত্য থেকে অন্তরীক্ষে। কবির কল্পনায় প্রকৃতি টুকরো-টুকরো মানবিক বৈশিষ্ট্যে জড়ত্বমুক্ত হয়। তার রূপটি সর্বদাই একরকম নয়। রবীন্দ্রনাথের কবিতায়ও পর্বত হতে চায় 'বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ', তরুশ্রেণী এমনকি মাটির নীচের অংকুর পাখা মেলতে চায় সুদূরে। ওই রোমান্টিক আকাঙ্ক্ষাই নতুন কালের বাস্তবতায় নতুন রূপ লাভ করে আধুনিক কবির কবিতায় কোনো গভীর, অন্তর্নিহিত পরা-চঞ্চলতায়। সমালোচক যথার্থই বলেন—''শামসুর রাহমানের অবস্থান রোমান্টিক ও আধুনিক চেতনার সঙ্গমস্থলে, যেখানে কবির সত্তা, উপলব্ধি, বিশ্ব ও প্রকাশ-মাধ্যমের মধ্যে ছেদহীন ঐক্য অনিবার্য নয়, এবং কল্পনা 'ইশ্বর' না হয়েও ভগ্নবিশ্বের খণ্ড খণ্ড অভিজ্ঞতাকে অন্বিত করার প্রায়

দেবোচিত কাজটি করে'' (সারওয়ার, ২০০৬: ৫৬)। প্রকৃতপক্ষে, শামসুর রাহমানের কবি-মানস বাংলা কবিতার বিস্তৃত সময়কাল ও তার স্বভাবকে শোষণ করেই নিজস্বতা অর্জন করে। তাঁর স্মৃতি-সত্তা-ভবিষ্যত পাশ্চাত্য ও বাংলা কবিতার সুবিস্তৃত কাব্য-পথের নানা মাত্রিক পদচ্ছাপে চিহ্নিত। কল্পনা প্রকাশের সহজাত ভারসাম্যটি কবি অর্জন করেন সেই পথে।

কল্পনা কবিতার চিরকালীন ভাবসম্পদ। মূলত, কবিতায় চিত্রকল্প, সমাসোক্তি, পরাবাস্তবতা—সর্বক্ষেত্রেই কবির কল্পনারই নানা মাত্রিক প্রকাশ ঘটে থাকে। কালে-কালে তা চিহ্নিত হয় নানা নামে, রূপান্তরিত বৈশিষ্ট্যে। রূপের নানা মাত্রিক প্রকাশে তা ভিন্নতা অর্জন করলেও তার সনাতন পরিচয় কবির কল্পনার অসীমত্বে। শামসুর রাহমান তাঁর এই শেষ পর্যায়ের কবিতাগুলোতে নানা প্রপঞ্চ এবং প্রাকরণিক ভিন্নতা সম্পর্কে সচেতন থাকা সত্ত্বেও তাঁর প্রকাশের নিজত্বের উপরই আস্থাশীল। ফলে, এ পর্যায়ের কবিতায় কবির বিচিত্র নিরীক্ষা অত্যন্ত স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে, নানা বৈচিত্র্যে প্রকাশিত হয়। তবে, কল্পনার আধিপত্য সেখানে সর্বৈব। যেমন, কখনো রোগশয্যায় শায়িত কবির বিছানার চারপাশ রূপান্তরিত হয় নলখাগড়ায় ঘেরা পঙ্কিল এক বদ্ধ জলাভূমিতে—

বিছানায় শুয়ে দেখি,
এ কী খাটের চৌদিকে গজিয়ে ওঠা নলখাগড়া
থকথকে কাদা, কয়েকটি তাগাড়া কাদাখোঁচা, হাড়গিলা
ভাঙা ডাল, মরা পচা পাতার মধ্যে গালফোলা
একটা কোলা ব্যাঙ আচানক ঠ্যাং তুলে লাফিয়ে
গা ঢাকা দেয় খাটের তলায়,
সেই বদ্ধ জলায় অমাবস্যার করাল ছাপ।
('অকাল বসন্ত', *হেমন্ত সন্ধ্যায় কিছুকাল*)

কবির কল্পনায় প্রায়শই তাঁর পরিপার্শ্ব রূপান্তরিত হয়। কবি বাস্তব থেকে কল্পনায় বিচরণ করে আবার বাস্তবে ফিরে আসেন। কবির তন্ময়তায় অনুভূতির দ্রুত সঞ্চরণে বাস্তব জগৎ রূপান্তরিত অবয়ব ধারণ করে। ●খনো অর্ধজাগরণেও সক্রিয় থাকে কবির এই 'ভিসন'। প্রকৃতি ও জড় বস্তুতে কবি জলের মত ছড়িয়ে দেন তাঁর সেই তন্ময়তা। কবিতার পর কবিতায় কবির অবচেতন কক্ষ-ভ্রমণের আবর্তন চলতে থাকে। তাতে কবিতায় নানা মাত্রা সঞ্চারিত হয়। উপরিতলে কবির প্রকৃতি-প্রেম যেমন অনুচ্চারিত থাকে না, তেমনি কবির নতুন এবং বিশেষ প্রত্যক্ষণটি তাঁর বস্তুজগৎকে রূপান্তরিত করে চলে এবং একইসাথে, সমকালীন সংকটের অভিঘাতে সৃষ্ট কবির অন্তর্বাস্তবতার রূপায়ণ ঘটে, এমনকি কবি সেই বাস্তবতাকে পরিহাস করারও সুযোগ পান। যেমন, নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিতে কবির প্রত্যক্ষণের লক্ষ্য এক নেকড়ে, অন্ধকারকে ধর্ষণ করে যে নেকড়ে চলতে থাকে শহরের পথে। কবির 'ভিসন'

তাঁর চলাকে একটি রূপান্তরিত নতুন অর্থে জান্তব করে তোলে এবং সেই সাথে দৃশ্যমান করে তোলে শহরের কোণে-কোণে জমে থাকা অন্ধকারের সত্যকে। নেকড়ের অবয়বে মূলত কবিই রাত্রির বুকে হেঁটে-হেঁটে সেই সব বাস্তবতা প্রত্যক্ষ করেন। কবি ঘরে বসে থেকেও নেকড়ের প্রেক্ষণে তাঁর ব্যক্তিগত প্রত্যক্ষণকে সক্রিয় করে তোলেন আর অন্ধকারকে স্বজ্ঞাপ্রবণ করে কবি বাস্তব ও কল্পনা মিলিয়ে সহজাতভাবে নির্মাণ করেন দৃশ্যটি—

> মধ্যরাতে এক নেকড়ে ধর্ষণ করে স্তব্ধতাকে; চমকে ওঠে শহর, জেগে থাকা কবির কলম থেমে যায়, ছিনতাইকারীদের আস্তানায় ঝাঁকুনি। চাঁদ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে মেঘের আঁচলে মুখ ঢাকে তাড়াতাড়ি; বিষণ্ন নারীর শাড়ি থেকে খসে পড়ে লম্পটের রোমশ হাত। নিঃস্তব্ধতার মাঝখানে নেকড়ের পথ চলা টহলদার পুলিশের নাকের ডগার নিচে। নিমেষে সে পৌঁছে যায় শহরের শেষ প্রান্তে। ছিনতাইবাজদের আখড়ায় পুনরায় মাতলামি, ইতরামি, লম্পটের হাত ক্রিয়াশীল। বিনিদ্র কবি জানালা থেকে দৃষ্টি সরিয়ে মনোযোগী কবিতার খাতায়, গড়ে উপমা, চিত্রকল্প।
>
> ('ধুলোমাখা জলরঙ', *মেঘলোকে মনোজ নিবাস*)

কবির এই চিত্রণে কালো রাতের দুষিত বাতাস যেন তরঙ্গায়িত হয়। এক ধরনের অতিসংবেদী পরিস্পন্দন সঞ্চারিত হয় কবিতায় অত্যন্ত সহজাতভাবে। সচেতন জগতের নানা সন্ত্রাসই কবির অবচেতনায় এমনিভাবে রূপান্তরিত হয়ে নতুন কল্পচিত্রসমূহে রূপান্বিত হয়। *মেঘলোকে মনোজ নিবাস* থেকে কবির কবিতায় এই রূপান্তর আরো জটিল ও সক্রিয় হয়ে ওঠে। বাস্তবের নানা বিকৃতিতে কবির অন্তর্জগতের নানা ভাষা-চিত্র অদ্ভূত সব কল্পনায় রূপান্তরিত হয়। চারিদিকে মিথ্যা আর হঠকারিতার তাণ্ডবে আমাদের স্বপ্ন-কল্পনা-বোধি ও বিবেক ভীষণ বিপর্যস্ত হলে কবির স্বপ্নে বা অবচেতনায় আসে বাস্তবের বিকৃত রূপ, চিরচেনা ঐতিহ্যের ভগ্ন ও বিপর্যস্ত রূপ। তখন মীরা বাঈয়ের কঙ্কন নগ্ন মেঝেতে গড়ায়, আলাওলের পদ্মাবতী রক্তস্নান শেষে সহমরণে চলে, লালনের অচিন পাখি রক্তাপ্লুত হয়—

> কয়েকটি কলহংস-শব্দ বাড়িটার পাছদুয়ার দিয়ে ভেতরে
> আস্তেসুস্থে প্রবেশ করে। কলহংসগুলোর শরীরে রৌদ্র-জ্যোৎস্না,
> জল-হাওয়ার দাগ, দীর্ঘশ্বাসের ছায়া কম্পমান। শেষ রাতের
> প্রহরকে চমকে দিয়ে মীরা বাঈড়এর ভজনস্নিগ্ধ হাতের কঙ্কন
> নগ্ন মেঝেতে গড়ায়। ছাদ, দেয়াল, সিঁড়ি, মেঝে ফুঁড়ে
> রক্তের ফোয়ারা। আলাওলের পুঁথি আর রবীন্দ্র রচনাবলী
> রক্তবমনে অচেতন। আলাওলের পদ্মাবতী রক্তস্নান সেরে ওঠে গভীর
> গভীরতর বেদনায়। সারা গায়ে আনারের দানার মতো রক্তফোঁটা
> নিয়ে হু হু বুকে লেকের কিনারে ছুটে যায় 'পদ্মাবতী'র কবির রাজহাঁসের
> পালকে বানানো লেখনীর সঙ্গে জলে সহমরণের অভিলাষে। রক্তভেজা
> অচিন পাখিকে দেখে ছেঁউড়িয়াতে আচমকা ছিঁড়ে যায় লালনের
> একতারার স্তব্ধ অথচ সপ্রাণ তার।
>
> ('ফ্ল্যাশব্যাক এবং.....', *মেঘলোকে মনোজ নিবাস*)

কবি বাস্তবাতীত এক নতুন বাস্তবতা নির্মাণ করেন। আপাতদৃষ্টিতে উদ্ধৃত পঙ্‌ক্তিমালায় কবির অবচেতন সন্ত্রাস নির্মাণে উত্তরাধুনিক কবিদের ঐতিহ্য-রীতির প্রয়োগ ও অতিবাস্তবতা বা 'হাইপাররিয়ালিটি'র মত একটি আবহ থাকলেও কবি মূলত তাঁর রক্তাক্ত হৃদয়ের প্রকাশ ঘটাতে নৈর্ব্যক্তিক অভিব্যক্তির দৃশ্যায়ণ ঘটান কেবল তাঁর কল্পিত অস্বাভাবী চিত্রকল্পগুলো জড়ো করে। দৈশিক নানা সংকটই কবির অবচেতন সত্তাকে এমন অতিরঞ্জিত, সন্ত্রাসবহুল, বিপর্যস্ত চিত্রকল্পগুলো রচনায় প্রণোদিত করে। কবির পরাবাস্তব বিভ্রমে ভ্যান ঘগের কাটা কান ঘরময় নেচে বেড়ায় এবং তাঁর ব্যাণ্ডেজটি একটি গাঙচিল হয়ে উড়ে যায় দূরে কিংবা মানিঅর্ডারের ফর্মে লেখা কবিতাটি হঠাৎ ভেনাস হয়ে সমুদ্র থেকে উঠে এসে সেঁটে যায় দেয়ালে—

> বাঁজখাই সূর্যের তাপ স্তিমিত হলে সে ফিরে আসে নিজের
> ঘরে। ঘরে ঢুকতেই ওর চোখে পড়ে মানি অর্ডার ফর্মে লেখা
> প্রেমের কবিতার খসড়াটি টেবিল থেকে উঠে দেয়ালে সেঁটে
> গেছে সমুদ্র থেকে উঠে আসা ভেনাস হয়ে। ঘরময় নেচে বেড়াচ্ছে
> একটা কান আর মেঝেতে পড়ে থাকা একটা ব্যাণ্ডেজ
> গাঙচিল-রূপে উড়ে যায় দূরে। আয়নার দিকে তাকিয়ে সে
> প্রশ্ন করে, ''আমি কি উন্মাদ হয়ে যাচ্ছি?''
> ('দিব্যোন্মাদ', *মেঘলোকে মনোজ নিবাস*)

কবির অবচেতনায় চলে এলোমেলো উল্লম্ফন। সচেতন কবি নানা অলৌকিক বিভ্রমে একবার উন্মার্গগামী হন, আবার ফিরে আসেন বাস্তবে। অলীক সম্মোহনে কখনো কবি ভুলে যান তাঁর আপন আস্তানার ঠিকানা। কবি এক পানের দোকানের সামনে এসে দাঁড়ান ভূতগ্রস্তের মত। তারপর সেই পানের দোকানই উড়ে যায় মেঘমালায় ('এই আলোরশ্মি', *না বাস্তব না দুঃস্বপ্ন*)। এভাবে বাস্তবতা থেকে পরাবাস্তবতায় কবির যাতায়াত চলে। প্রকৃতিকে অন্তর্বাস্তবতার অভিঘাতে রূপান্তরিত করে নতুনরূপে প্রকাশ করাও কবির এক ধরনের সম্প্রকাশধর্মী মানসিকতার পরিচায়ক। কবির মাঝে-মাঝেই মনে হয় তাঁর আশেপাশের ঘর-বাড়ি 'তাসের পাতার মত' দ্রুত ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয় কিংবা দাবানলে বন থেকে শহরমুখী সব ভয়ার্ত পশুপাখি কিংবা কবিকে ঘিরে ধরে আছে কিছু অর্ধ-পশু, অর্ধ-মানব অবাস্তব প্রাণী, যারা কবিকে সন্ত্রস্ত রেখে পরমুহূর্তেই বিলীন হয় ইথারে ('আমি যা দেখতে পাচ্ছি', *না বাস্তব না দুঃস্বপ্ন*)। কবি এইরূপ নানা দৃষ্টিভ্রমের শিকার হন হামেশাই। মূলত, প্রতি মুহূর্তে ব্যক্তি সত্তার অন্বেষণ বা অনুসন্ধান, স্মৃতি, বিষন্নতা, একাকীত্ব এমনকি দৈশিক ও বৈশ্বিক রাজনৈতিক সংকট থেকেও কবির অন্তর্জগতের এই বাস্তবতার জন্ম হতে পারে। কবির দৃশ্য জগতের নানা বিপন্নতা রূপান্তরিত হয় স্বপ্ন জগতে। কবির আত্মসংকটের ভয়াবহ প্রতিফলন ঘটে তাঁর অবচেতনে। কখনো তাঁর মনে হয়, কতিপয় হার্মাদ তাঁকে নিয়ে যাচ্ছে দূরে কোথাও, কখনো মনে হয় কিছু ভয়ঙ্কর

লোক একটি কণ্টকিত গাছে কবিকে ঝুলিয়ে দিয়ে উদ্দাম নৃত্য করে ('একটি দুঃস্বপ্নের ছায়া', *না বাস্তব না দুঃস্বপ্ন*)। এ পর্যায়ে কবি তাঁর কল্পনাকে ব্যাপকভাবে প্রকাশ করেন তাঁর কবিতায়। স্বপ্ন বা দুঃস্বপ্ন কবির অন্তর্জগতে এক নতুন ভুবন তৈরি করে—এক রূপান্তরিত জগৎ। সে জগৎ স্বভাবতই বাস্তব জগতের ঘটনাগুলোর মত কার্যকারণ রক্ষা করে চলে না। ফলে, কবির স্বপ্নগুলোর সম্প্রকাশধর্মী রূপায়ণ ঘটে। কবি তাঁর সেই অবচেতনের উল্লম্ফনধর্মী চিত্রগুলোকে সাজিয়ে মিশ্র ছন্দে রচনা করেন তাঁর স্বপ্নপুরাণ:

স্বপ্নে দেখি সূর্য বুকের দরজা খুলে ডাকে আমায়,
অসংকোচে প্রবেশ করি, অপরূপের জগৎ দেখি
উদ্ভাসিত দৃষ্টিপথেড়অচেনা গাছ পুষ্পে ছাওয়া,
আমার প্রবীণ মৃত পিতা শাগালের নিজ গাঁয়ের ছবি
বুকে নিয়ে আছেন শুয়ে হ্রদের ধারে; আমার মৃতা মা রূপালি
চাঁদের নায়ে বসে একা কোন্ সুদূরে যাত্রা করেন;
...
পিকাসো তাঁর গোয়ের্নিকা ছুঁড়ে মারেন তালেবানি
কসাইখানায়; লোর্কার লাশে প্রজাপতির অবাধ মেলা।
ভগ্ন সেতুর কংকালে কার বাসর সাজে অন্ধকারে।
বাউলা হাসান ঢোল বাজিয়ে তারা ছিটোন চতুর্দিকে।
বাইরে আমি ছড়িয়ে পড়ি মাঝে মাঝে কিসের টানে?
('স্বপ্নপুরাণ', *রূপের প্রবালে দগ্ধ সন্ধ্যারাতে*)

এভাবে স্বপ্নের সূত্রে কবি এক নতুন রূপান্তরিত জগৎ তৈরি করেন, সেখানে বস্তু জগতের কর্যকারণশৃঙ্খলা ভেঙে নতুন অবচেতন-শৃঙ্খলায় কবি নির্মাণ করেন তাঁর কল্প-লোক। সে কল্প-জগতে পিকাসো, লোর্কা, বাউলা হাসান আসেন নতুন প্রতিচ্ছবিতে, নতুন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায়। ক্লান্তি, 'ইনসমনিয়া'র ঘুমহীনতা কিংবা অর্ধ-জাগরণ বা সংক্ষিপ্ত নিদ্রা কবিকে ঠেলে দেয় 'বাস্তব অবাস্তবের মিশ্রিত বেড়াজালে'। স্বপ্নের ভেতর কোনো সুন্দরী হঠাৎ রূপান্তরিত হয় ডাইনিতে—কবির দৃষ্টিকে আঘাত করে প্রবলভাবে ('না বাস্তব না দুঃস্বপ', *না বাস্তব না দুঃস্বপ্ন*)। কবি গভীর রাতে 'চেতনপুরের বিজন পথে' একলা হেঁটে বেড়ান। শামসুর রাহমানের কবিতার এই নান্দনিকতার আস্বাদন ত্রিমাত্রিক। এই কবিতাগুলোর একটি তলে লুকানো থাকে বাস্তব জগতে আমাদের চেনা প্রকৃতির ছবি, আরেকটি তলে থাকে কবির সৃষ্ট রূপান্তরিত প্রকৃতি, এবং আরেকটি তলে থাকে সেই অন্তর্বাস্তবতার অন্তর্নিহিত কার্যকারণ অর্থাৎ সমকালীন সংকট বা ব্যক্তিগত যে কোনো বিপর্যয়, যা কবিকে প্রণোদিত করে ওই রূপান্তরিত বাস্তবতা নির্মাণে। এই কল্পনায় কবির কবিতার 'অবজেক্ট' এবং 'আইডিয়া'র মধ্যে একটি অপ্রত্যাশিত, অদ্ভুত সম্পর্কের সৃষ্টি হয়। এভাবেই বস্তুজগতের বিপরীতে একটি রহস্যময়, কল্পনাত্মক

চূড়া নির্মাণ করেন কবি, যা আপাত দুর্বোধ্যতা সঞ্চার করে কবিতায়। কারণ, কবির এই ধরনের কল্পনা-চিত্রণ খুব খাঁটি হলেও ঠিক স্পষ্ট না।

এ পর্যায়ে কবি কবিতার 'ন্যারেটিভ' কাঠামো নিয়ে নিরীক্ষা করেছেন কখনো কখনো। এই কবিতাগুলো মূলত একটি মনস্তাত্ত্বিক ভ্রমণের (psychological voyage) মত করে লেখা। কবি তাঁর চেতনার নিমগ্ন স্তরকে অর্গলমুক্ত করেন। চেতনার সেই সন্তরণ স্বভাবতই কার্যকারণশৃঙ্খলাসম্পন্ন নয়, বরং উল্লম্ফনধর্মী। সেখানে কখনো কবির সদ্যমৃত অনুজ মধ্যরাতে জেমস ডিনের ধরনে কবির ঘরের দরজায় হাত রেখে দাঁড়ায়, কখনো কবির ঘুমের সমুদ্রে ভেসে ওঠে অতিকায় সাদা মবি ডিকের মূর্তি—কবি নিজেকে দেখতে পান কাফন আর আতর-লোবানে শেষকৃত্যের জন্য শায়িত মানুষরূপে। কবির চেতনার নিমগ্ন স্তরে চলে নানা অসম্বদ্ধ চিত্র ও চিত্রকল্পের আনাগোনা। কখনো বসন্ত এসে মানুষের মত বসে কবির পাশে, কথা বলে তাঁর সাথে, আবার হঠাৎ চলে যায়। কবির স্বপ্নে কোনো এক শল্যচিকিৎসক হঠাৎ রূপান্তরিত হয় এক ঘাসফড়িংয়ে এবং আবারো কিছুক্ষণ পরে ঘাসফড়িং পরিণত হয় সেই শল্যচিকিসকে। অলংকার সাপ হয়ে জড়ায় রমণীর মণিবন্ধ, ঝড়ো বাতাসে নার্সের এপ্রন হয়ে যায় উড়ন্ত গাঙচিল। অবচেতনের নানা অভিব্যক্তিকে কবি প্রকাশ করেন বিস্রস্ত চিত্রকল্পে, খণ্ড-খণ্ড কল্প-চিত্রে, হঠাৎ কোনো পরাবাস্তব প্রহেলিকায়, কখনো টানা গদ্যে—

> ফল কাটার ছুরি আমূল বিদ্ধ হৃৎপিণ্ডে। হাতলে দু'টি প্রজাপতি। স্বপ্নে দেখা শল্যচিকিৎসক দাঁড়ানো কফিনের গা ঘেঁষে, জিভ দিয়ে ঠোঁট চেটে চেটে কখন যে তিনি ঘাস ফড়িং, বুঝতে অক্ষম। হৃৎপিণ্ড থেকে ছুরি কনক চুড়ি রূপসীর হাতে। আজকাল কী যে হচ্ছে শুক্রবারকে মনে হয় সোমবার, কখনও বুধবার রোববারের আদল ধরে। একটা ব্রেসলেট তার হাতে পরাতে গিয়ে দেখি অলংকার নয়, সাপ জড়িয়ে ধরে ওকে। পেছনে হটতেই পিঠ দেয়ালে, সাপিনী মোহিনীর রূপে এগোয় আমার দিকে। এক ঝাঁক প্রজাপতি আমাদের মাঝখানে দোদুল্য ঝালর। ঘাসফড়িং পুনরায় শল্যচিকিৎসক, বাইপাস অস্ত্রোপচারের জন্য তৈরি বৈরী ঋতুতে। ঋতু বদলের অপেক্ষায় বসে আছি ঝড় বাদলে, লম্বা করিডোরে, মেঘের মাদলে মিয়া কি মল্লার। দূও পাল্লার যাত্রী কেউ আছে কি এখানে হাসপাতালের বেডের শিথানের পাশে। খেলে একজন, পরনে তার কালো আলখাল্লা। ঠাণ্ডা পাথর বিছানায় উঠে আসে, কবি পাখর বুকে টেনে ঘুমান। পাখির গানেও তাঁর ঘুম ভাঙবে না। তার শরীর থেকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ে আঙুরের রস। শল্যচিকিৎসক খস খস করে কী যেন লিখছেন টুকরো কাগজে ঝোড়ো বাতাসে নার্সের এ্যাপ্রন এখন গাঙচিল।
>
> ('স্বপ্নের স্বায়ত্তশাসন', *মেঘলোকে মনোজ নিবাস*)

কবির এই মনস্তাত্ত্বিক ভ্রমণকে কবি স্তবক-পরম্পরায় 'ন্যারেটিভ ফর্মে' প্রকাশ করেছেন কখনো কখনো। সেই সব স্তবকগুলোতে কবির ভাবনার কোনো ধারাবাহিকতা বা শৃঙ্খলাও লক্ষ করা যায় না। একেকটি স্তবক ভিন্ন-ভিন্ন অবচেতন বাস্তবতার সাক্ষী। সবগুলো স্তবক মিলে কোনো সামগ্রিকতা

নির্মাণও কবির অভিপ্রায় নয়। কেবল 'সাইকেডেলিক' চিত্রমালার মত কবির অবচেতনের নিমগ্ন স্তর থেকে উঠে আসে এলোমেলো ছবি।

যদিও কবিতা রচনায় শামসুর রাহমান 'রেগুলার রিদম্' এ অধিকতর স্বস্তিবোধ করেন এবং অক্ষরবৃত্তেই তাঁর অধিকাংশ কবিতা রচিত, তবু বিভিন্ন সময়ে কিছু-কিছু গদ্যকবিতাও তিনি রচনা করেছেন। এ পর্যায়ে কবি টানা গদ্যেও কবিতা লিখেছেন। হুইটম্যান, রবীন্দ্রনাথ, অরুণ মিত্র প্রত্যেকেই যাঁর-যাঁর মত গদ্যকে অভিবাদন জানিয়েছেন তাঁদের কবিতায়। কিন্তু গদ্য-পদ্যের বিবাদভঞ্জন করতে গিয়ে কবিতাকে অনিয়মিত, উশৃঙ্খল করে তোলেননি তাঁরা। আধুনিক ও আধুনিকোত্তর কালে গদ্যে, টানা গদ্যে কবিতা রচনার নানা সার্থক ও ব্যর্থ প্রয়াস লক্ষ করা যায়। যেহেতু, প্রথম থেকেই প্রাত্যহিক ছন্দে আস্থাবান ছিলেন শামসুর রাহমান, সুতরাং তাঁর এ পর্যায়ের গদ্যকবিতাগুলোর চলনেও ওজন-রক্ষার একটি স্বাভাবিক নিয়ম থাকে। কাব্যরস বিঘ্নিত করে গদ্যকবিতা রচনা তাঁর উদ্দেশ্য নয়। *রৌদ্র করোটিতে* কিংবা অন্যান্য কাব্যের মাপা ছন্দে লেখা কবিতাগুলো থেকে টানা গদ্যে লেখা এই কবিতাগুলোর মৌল পার্থক্য কেবল পঙ্‌ক্তি-বিন্যাসে এবং উপস্থাপনের ধরণে। এই পার্থক্য আরো অস্পষ্ট এই জন্য যে, শামসুর রাহমান তাঁর প্রথম কাব্যগুলোতেই নৈমিত্তিক জীবনের ছন্দ-তান আবিষ্কারের সূত্রে ত্রিশোত্তর কবিতার ছন্দানুরাগ থেকে বেরিয়ে আসেন—নৈমিত্তিক ছন্দেই কবিতাকে গদ্যের কাছাকাছি নিয়ে আসেন। ফরহাদ মাজহার বুদ্ধদেব বসু'র 'কঙ্কাবতী' ও রাহমানে'র 'রুপালি স্নান' কবিতার তুলনামুলক ছন্দ-বিশ্লেষণসূত্রে যথার্থই বলেন—

> বুদ্ধদেব বসু এর আগেই তাঁর 'কঙ্কাবতী' কবিতায় মাত্রাবৃত্তের খোলামেলা চলনের ঝুনঝুনি দিয়ে বাংলা কবিতার মন কেড়ে নিয়েছিলেন। কিন্তু, দেখা গেল ছন্দ ও তার চলনটা চেনা হলেও শামসুর রাহমানের কবিতাটির মধ্যে ঠিক সেই ঝুনঝুনিটি বাজছে না, কোথায় জানি একটা কড়া আর রুক্ষ মেজাজ ফুটে উঠছে যার সঙ্গে 'কঙ্কাবতী'র মিল নেই। কবিতার মধ্য থেকে যে কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে সেটা মোটেও বুদ্ধদেবীয় নয়। যে একটা তরল সঙ্গীত 'কঙ্কাবতী'র মধ্যে বিচ্ছুরিত 'রুপালি স্নান'-এ সে মূর্চ্ছনাটা নেই'' (ফরহাদ, ১৯৯১: ৩৮১)।

প্রকৃতপক্ষে, প্রথম পর্বেই শব্দ-ভাষা ও প্রকাশভঙ্গির সাথে ছন্দ-ধ্বনির এক অভূতপূর্ব যোগাযোগ সাধনে সমর্থ হয়েছিলেন শামসুর রাহমান। সেই স্বতঃস্ফূর্ত বন্ধনটিকেই কবি নানা পর্বের কাব্যে নানাভাবে আরো বেশি নিজস্ব করে তুলেছিলেন এবং বাংলা কাব্যে তা রাহমানীয় স্বাক্ষর বহন করে

চলেছে আজো। শামসুর রাহমান তাঁর শেষ পর্যায়ের যে অল্প-কিছু গদ্যকবিতা রচনা করেন, সেখানে সমিল প্রবাহ না থাকলেও ছন্দের অন্তর্নিহিত স্বভাবটি একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায় না। বরং গদ্যে তাঁর কবিতা আরো জটিল ও বিমূর্ত হয়ে ওঠে। গদ্য-ভাষার গায়ে বুনো লতার মত জড়িয়ে থাকে উপমা-চিত্রকল্পও। কবি তাঁর চেতন-অবচেতন-স্বপ্নের এলোমেলো দৃশ্যকে আরো বেশি প্রত্যক্ষ ও স্বাধীনভাবে প্রকাশের উদ্দেশ্যে এ পর্বের কবিতায় গদ্য-ভাষা ও গদ্যছন্দের প্রয়োগ ঘটান—

> কলকব্জায় রঙচটা খাঁচা, লোহা-লক্কড়, বসন্তকে নীরব করে দেয়া কীটনাশক, লজ্‌ঝড় বাস-ট্রাকের পোড়া ডিজেলের অবিরত বমি; ব্যাপক দূষণে প্রকৃতি সূতিকাগ্রস্ত, শোচনীয় নারী। ঘোর অমাবস্যায় মোগল বেগম সাহেবাদের হাম্মামে ভীষণ হানিকর, উৎকট পূতিগন্ধময় চটচটে নর্দমার পানি, দ্রাবিড় যুগ থেকে ছুটে আসা। অগুনিত মাছ আর পাখির ঝাঁক স্তূপীকৃত। আমার ফুসফুস হাওয়া টানতে গিয়ে অপদস্থ, ফুলে ফুলে ওঠে জীর্ণ হাঁপর। কাপড় চোপড় ঠিকঠাক, মানানসই, অথচ অস্তিত্বের কাকতাড়ুয়ার রং ঢং। অতিকায় মাকড়সার জালে আমি চিৎপটাং। সাহসিকতার কোনও ভড়ং ছিল না, অথচ কতিপয় চামচিকা চক্কর কাটে চতুর্দিকে, আঁটে লাথি মারার ফন্দি।
>
> ('সারা জীবনই গোধূলির আকাশ', *মেঘলোকে মনোজ নিবাস*)

কবির নির্ঘুম রাতে চলে স্বরবর্ণ-ব্যঞ্জনবর্ণের বিচিত্র কোরিওগ্রাফ, অক্ষর নিমেষে জ্বলে-নেভে জোনাকির মত। অনবরত দৃষ্টিভ্রম কবিকে পীড়িত করে। কবি স্বপ্নের শাসন মেনে নিয়ে তাঁর সেই সব অলীক প্রত্যক্ষণ ও অনুভবকে মূর্ত করে চলেন গদ্য-ভাষায়—

> আমার কান ঘেঁষে যাওয়া পরিযায়ী পাখি এক লহমায় ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়ের গান। চুলে নক্ষত্রের নাচ, জ্যামিতিক গাছ ধারণ করে কোজাগরী জোৎস্না, গলে পড়ে মাধুর্য। কয়েক ঘণ্টা পরে উঠবে টকটকে সূর্য, শিরায় টগবগানি। একখণ্ড বড়সড় পোয়াতি জমি অচিরে করবে প্রসব। ধান, পাট, গম, যব, ভুট্টা, আলু, আদা, সর্ষে-কোনো ফসলসম্ভার নেবে সূর্যের চুম্বন, হাওয়ার আলিঙ্গন? সে জমি আমার লক্ষবস্ত্র বহু প্রহরের, তাকে দেখি জ্যোতির্বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে। নিয়মিত নিড়াই, আগাছাগুলো মৃত সৈনিক। পানি গড়ায়, স্ফীত-মৃত্তিকা-যোনি; হঠাৎ জমির উপর ধর্ষিতা নারীর ছিন্নদেহ, ঊনিশশো একাত্তরটি সূচ- বসানো স্তন, বৃদ্ধের বুলেটে ঝাঁঝরা বুক, বন্দুকের বাঁটে শিশুর থ্যাঁতলানো মুখ, গেরিলার উত্তোলিত বাগু আর ফাঁকে ফাঁকে শৌর্যের সূর্যমুখী।
>
> ('সারা জীবনই গোধূলি-আকাশ', *মেঘলোকে মনোজ নিবাস*)

স্পষ্টতই লক্ষণীয় যে, কবির গভীর অবচেতনার নানা দৃশ্য পরম্পরা নেই, কোনো কার্যকারণশৃঙ্খলা, এমনকি সময়ের শৃঙ্খলাও। চেতনার ক্রম রূপান্তর স্বপ্নের 'অবজেক্ট'গুলোকে প্রতিনিয়ত একেকটি নতুন কাঠামোয় বিবর্তিত করে চলে। কবিরই নিমগ্ন চেতনার চূর্ণ স্মৃতি বা অভিজ্ঞতা আংশিক রূপান্তরিত হয়ে একটি বিমূর্ত অভিব্যক্তি ধারণ করে। সেই সব অভিব্যক্তি প্রতিনিয়ত কবির

অবচেতনায় সঞ্চলমান। উদ্ধৃতাংশের শেষ অংশে ৭১' এর মুক্তিযুদ্ধের নানা টুকরো ছবি জীবাশ্মের মত রূপান্তরিত হয়ে দেখা দেয়। এক ধরনের বিমূর্ত অভিব্যক্তি সঞ্চারিত হয় এই কবিতাংশে, যেমনটি লক্ষ করা যায় 'অ্যাবস্ট্রাক্ট এক্সপ্রেশনিস্ট' চিত্রকলায়। যে বাস্তবতা খালি চোখে দেখা যায় না, কেবল অনুভব করা যায়, তেমনি এক বিস্ময় বিমূঢ় সত্য লুকিয়ে থাকে কবির এই রূপান্তরিত সৃষ্টিতে, যার প্রেরণা বা অভিঘাত আসে বাস্তব জগৎ থেকেই কিন্তু তার প্রকৃত আস্বাদ নিহিত এই বিনির্মিত কল্প-বাস্তবতায়। গদ্য-ভাষায় সেই স্মৃতি ও অবচেতনার এলোমেলো অনুষঙ্গের প্রকাশ আরো বাস্তবসম্মত হয়ে ওঠে।

শামসুর রাহমানের এ পর্যায়ের কবিতায় চলতে থাকে ছোট-খাটো নানা ধরনের 'ট্রান্সমিউটেশন' বা রূপান্তর। জীবন এবং অস্তিত্বকে এখানে কবি ছোট ছোট 'মেটামরফসিসে'র মত করে উপস্থাপন করেন প্রায়ই। কোনো নির্দিষ্ট কাঠামোর ভাবনাকে কবি বিগলিত করে দেন এবং অস্তিত্বকে প্রবহমান করে তোলেন। কখনো কবির স্বপ্নে আসে এক সুকান্ত বেদে। স্বপ্ন থেকে কবির বাস্তবেও চলে তার আনাগোনা আবার কখনো কবির স্বপ্নে দেখা সেই বেদের মুখটি কবি গলে যেতে দেখেন সালভাদর দালির আঁকা ছবির ঘড়িটির মত, পরক্ষণেই ওই মুখ একগুচ্ছ জলপাই হয়ে শূন্যে ঝোলে, কিংবা পরিণত হয় কোনো হরিণের প্রাচীন ভঙ্গুর করোটিতে। সেই করোটিতে একটি গোলাপ গুঁজে রেখে যায় কোনো এক নারী, যাকে খুঁজে বেড়িয়েছে ওই বেদে পুরুষ সমস্ত জীবন। ক্রমশ সেই বেদে প্রবেশ করে কবির চৈতন্যে। কবি আর বেদের ভাবনা ঐকিক হয়ে ঘুরে ফেরে সুদূর প্রাচীন অন্ধকারে। কবির ভাষায়—

কখনও কখনও সেই মুখ
সালভাদর দালির ঘড়ি হয়ে গলে যেতে থাকে
তারপর অকস্মাৎ একগুচ্ছ জলপাই হয়ে
শূন্যে ঝোলে, কখনও বা হরিণের প্রাচীন ভঙ্গুর
করোটিতে সহজে রূপান্তরিত। করোটিতে একটি গোলাপ
গুঁজে রেখে গেছে যেন কোনও নারী, যার
চৈতন্যে মধুর চন্দ্রোদয়। বেদে তাকে বহু যুগ
ধরে বুঝি ব্যাকুল বেড়ায় খুঁজে নদীতীরে, বিজন প্রান্তরে, লোকালয়ে।

কখনো যে সেই বেদে আমার ভেতরে কী কৌশলে
প্রবেশ করেছে, ঠিক বুঝতে পারিনি।
('বেদে', *রূপের প্রবালে দগ্ধ সন্ধ্যারাতে*)

কখনো কাফ্কার ছোটগল্পের চরিত্রের মত কবির কল্পনায় এক আগন্তুক এসে হঠাৎ বসে তার ঘরের কোণের চেয়ারটিতে। তারপর সেই অচেনা রূপবান যুবকটি মোমবাতির মত গলে যেতে থাকে।

পরক্ষণেই কবি দেখতে পান, সেখানে বসে আছে এক হনুমান ('মেটামরফসিস', *গোরস্তানে কোকিলের করুণ আর্তনাদ)*। সেভাবেই কবি তাঁর প্রিয়তমার হাত ধরে হাঁটতে হাঁটতে প্রবেশ করেন এক আসমানী রেস্তোরাঁয় এবং মুখোমুখি বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ দৃশ্যপটের আকস্মিক রূপান্তর ঘটে। প্রবল হাওয়ায় রেস্তোরাঁর টেবিলটি শূন্যে মিলায় এবং দীঘল ঘাসে আচ্ছাদিত কবি রূপান্তরিত হন জলজ প্রান্তরে কাদার ভেতর সঞ্চরমান এক কোলাব্যাঙে। অতঃপর একটি সোনালি হাত সেই কাদা থেকে টেনে তোলে কবিকে তাঁর আপন অস্তিত্বে ('আমরা দু'জন হাঁটি একসঙ্গে', *ছায়াগণের সঙ্গে কিছুক্ষণ*)। কখনো তাঁর প্রিয়তমার স্বপ্নেও চলে আজগুবি রূপান্তর। সে রূপান্তর যে কাফ্কা-কিয়ের্কেগার্ড পড়া চেতনার অবচেতন উৎসারণ নয়, তা কবি জানেন। কারণ, তাঁর প্রিয়তমা কাফ্কা-কিয়ের্কেগার্ডের রচনার 'মেটামরফসিস' সম্পর্কে অবহিত নয়। কেবল কবি তাঁর প্রিয়তমার স্বপ্নের সেই রূপান্তরকে অনুভব করেন সেই প্রপঞ্চ দিয়ে অন্তর্জগতের সত্যরূপে অথবা প্রিয়তমার স্বপ্নকে অবলম্বন করে বর্ণনা করেন কাফ্কার সেই রূপান্তরিত জগতের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ এক নতুন উপলব্ধিকে—

কয়েক
মিনিট না কাটতেই দেখতে পেলে
তোমার মাথার ভেতর গজিয়ে উঠেছে একটি গাছ
আর চারপাশে ঝোপঝাড় আর তোমার
করতলে একটা কদম ফুল ফুটে উঠল এবং
পর মুহূর্তেই কদম ফুল রূপান্তরিত ক্যামেলিয়ায়।
...
আবার দেখলে তুমি কখনও আরশোলা,
কখনও টিকটিকি রূপে ঘরের ধূসর দেয়ালে
হামাগুড়ি দিচ্ছি।
('তোমার একটি স্বপ্ন', *রূপের প্রবালে দগ্ধ সন্ধ্যারাতে*)

স্বপ্ন, অবচেতন, কল্পনালোক মিলে একটি জগৎ তৈরি করেন কবি । একধরনের দৃশ্যগ্রাহ্য রহস্যময়তা তৈরি করেন (visible mystery)। একধরনের সংবেদন অনুভব করা যায় সেই দৃশ্যায়নে। কবি যথার্থই মেঘলোকে নির্মাণ করেন এক 'মনোজ নিবাস'।

শামসুর রাহমানের এই পর্যায়ের কবিতার চিত্রকল্পগুলো ঠিক কংক্রিটের মত সংবদ্ধ হয়ে আসে না আবার পরাবাস্তব চিত্রকল্পের মত ঊর্ধ্বগ হয়ে যায় না, বরং ভেঙে-ভেঙে কিংবা এক ধরনের কম্পনের মত বা তরঙ্গের মত দোলায়িত হয় (epistemological impulse), গলিত পারদের মত সঞ্চরণশীল হয়, ঠিক সালভাদর ডালির গলে যাওয়া ঘড়িটির মত। এখানে ব্যবহৃত উপমা-

চিত্রকল্প-রূপকগুলো কবিতার প্রচলিত অলংকারগুলোর মত নয়। এই চিত্রকল্পগুলোর বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কোনো যৌক্তিক ব্যাখ্যা নেই। এইসব চিত্রকল্পে চাঁদ-ফুল-পাখিরা কবিতার পাতা জুড়ে স্বেচ্ছাবিহারী যেন। ঘুরে বেড়ায়, কথা বলে, নানা আচরণ প্রদর্শন করে ইচ্ছে মত। কোনো চিত্রকল্প ইতিবাচক বা সুখকর অভিব্যক্তিতে দেখা দেয়। মেঘ আদর করে আকাশকে, জানালাটি মদির অনুরাগ পৌছে দিতে চায় পাশের গাছের মর্মমূলে, একরাশ ফুল আর কোকিলের সঙ্গত তাদের সে প্রণয়কে সুরে-সৌরভে স্বাগত জানায় ('ভয়ঙ্কর সৌন্দর্য নিয়ে', *শুনি হৃদয়ের ধ্বনি*)। কখনো কবি তাঁর চশমাটিকে কামার্ত হতে দেখেন তন্বী কবিতাটির প্রতি—প্রেমিক পুরুষের মত সে মুঠোবন্দী করতে চায় কবিতা-নারীর স্তনদ্বয় ('নিষ্ঠুর প্রতারণা', *নক্ষত্র বাজাতে বাজাতে*)। কবির কোনো কোনো চিত্রকল্প দারুণ নেতিবাচকতায় মোড় নেয়। চিত্রকল্পের সেই জটিল, অর্ন্তস্বভাবী আচরণ, পাঠককে তাঁর কবিতার যথাযথ ব্যাখ্যায় অপারগ করে তোলে—বিশেষত, যখন কবির ভাষা হয়ে ওঠে রূপকাত্মক, নিম্নরূপে—

> কয়েকটি কোঁকড়ানো মেঘ,
> যেগুলো চরছিল নার্সারিতে, চিবোচ্ছিল কচি ঘাস, এখন উধাও। তুমি তোমার
> ক্লান্ত শরীর এলিয়ে দিয়েছ মধ্যরাত্রির শয্যায়। আমার বাসনাগুলি পুরুষ মৌমাছি
> হয়ে উঠছে তোমার ক্লান্ত যৌবনের মৌচাক ঘিরে, তুমি না
> জেনেই ঘুমিয়ে পড়বে। ... আমার অসমাপ্ত কবিতার রঙিন মাছগুলি
> ডুবসাঁতার দিয়ে পৌঁছে যাচ্ছে তোমার মেহগনি কাঠের খাটের কিনারে,
> স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। ... তোমার ঘুম, একটি
> রাতজাগা পাখি, হাওয়ো-মাতাল গাছ, জনহীন গলি, এতিমখানার অন্ধ নীরবতা
> আমার মধ্যে কী এক অস্থিরতা ডেকে আনে। অন্ধকারের আড়ালে ঢাকা-পড়া
> নক্ষত্র আর ভাসমান মেঘের গলা জড়িয়ে আমার অসমাপ্ত কবিতা গন্তব্যের
> প্রায় সীমান্তে পৌঁছে যায়। দ্রুত হতে থাকে বুকের স্পন্দন। এই যাত্রা কে জানে
> কোথায় থামবে? কোনও পুরানো কবরস্তানে নাকি নতুন কোনও পুষ্পল উদ্যানে?
> ('আমার অসমাপ্ত কবিতা', *মেঘলোকে মনোজ নিবাস*)

কবির তন্ময়তায় কিংবা স্বপ্নে চলে এইরূপ রূপান্তর প্রতিনিয়ত। রূপান্তরিত হয় কবির কাল, প্রতিবেশ, দৃশ্যপট। সেই পরিবর্তিত জগতের সাথে মিশে কবির অস্তিত্বও হয়ে ওঠে প্রবহমান, ক্রমাগত বিবর্তিত। রূপান্তরিত হয় কবির নিজের শয্যাকক্ষ—মধ্যাহ্নে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে ধু-ধু তেপান্তরের মাঠ, কিছু পিপাসা-কাতর পথিক আবার অপরাহ্নে সেই ঘরই রূপান্তরিত হয় শুনশান গোরস্তানে, সায়াহ্নে সেই ঘরই রূপান্তরিত হয় এক জমজমাট সার্কাস দলের আস্তানায় আর মধ্যরাতে সেই ঘর পরিণত হয় দুঃখী গ্রাম নগরে, যেখানে সবার সব স্বপ্ন মিশে যায় গাধার বিষ্ঠায় ('মিশে যাচ্ছে গাধার বিষ্ঠায়', *কৃষ্ণপক্ষে পূর্ণিমার দিকে*)। কবি তাঁর কল্পনা ও শব্দভাষার কৌশলে বাস্তব জগতকে একটি অতীন্দ্রিয় পরাজগতে পরিণত করেন, আবার সেখান থেকে কোনো না কোনো সূত্রে ফিরে আসেন

বাস্তবে। তাঁর তন্ময়তায় এই গমনাগমন এক সহজাত স্বভাবে পরিণত হয় ক্রমশ। কবি তাঁর সেই বিভ্রম জাগানো চেতনার ধ্বনি-প্রতিধ্বনিকে প্রকাশ করেন নিম্নরূপে—

তন্ময়তা আমাকে
ওর মুঠোয় পুরে একেবারে ভুলে গিয়েছিল আমার
তরতাজা অস্তিত্ব। ভেবেছিল আমি বুঝি মাটির ঢেলা,
পাথর কিংবা নিদেনপক্ষে মুর্গির ডিম। হঠাৎ
স্মরণ হতেই মুঠো আলগা করে দিল এবং আমি
নড়েচড়ে বসি, নিঃশ্বাস
নিতে নিতে মনে হলো, আমার ভেতর কিসের বীজ যেন
চোখ মেলেছে, অন্তর্গত মরুভূমিতে ঝরনাধারা
বইতে শুরু করে যেন। সুনসান খেয়াঘাটের মাটিতে
পড়ে থাকা শুক্‌না পাতাগুলো মাছ হয়ে
পানিতে ঝাঁপ দেয়, পুরনো কয়েকটি বেঁটে বাঁশ
নিমেষে হরিণে রূপান্তরিত। পথের ধারে পরিশ্রান্ত, ঘুমন্ত
একজন কারিগরের হাতুড়ি নেচে-নেচে নুড়ি
আর পুরনো ইটকে পিটিয়ে গুড়ো করে
মুক্তো বানিয়ে ফেলে।
('চেতনায় ধ্বনি প্রতিধ্বনি', *রূপের প্রবালে দগ্ধ সন্ধ্যারাত*)

এভাবে কবির তন্ময়তার ভেতর জন্ম নেয় তাঁর 'হিল্লোলিত শস্যরাশি'; হিল্লোলিত এবং প্রবহমান। কবির অসুস্থতা, ইনসোমনিয়া, তাঁর শূন্যতা, মৃত্যুচেতনা, বস্তুজগতের নানা সন্ত্রাসের অভিঘাত তাঁর স্বপ্ন-জগতকে সচকিত করে তোলে স্বপ্নের ধরনে। কখনো কখনো কবি হয়ে ওঠেন এক ' দিব্যোন্মাদ'। তখন পরাবাস্তব হয়ে ওঠে তাঁর প্রাত্যহিক জগত। এভাবে কবি ক্রমশ তাঁর জগৎকে নৈর্ব্যক্তিক করে তোলেন। কবিতায় লক্ষ করা যায় এক ধরনের মনস্তাত্ত্বিক অতীন্দ্রিয়তা, যা এক নতুন বাস্তবতারূপে কবিকে আচ্ছন্ন করে রাখে। কবি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ থেকে সেই অতীন্দ্রিয়লোকে বিচরণ করে বেড়ান। কবির সে কল্প-বিশ্ব সচল, সংবেদী, স্পর্শ-দৃশ্য-ঘ্রাণপ্রবল। কখনো কখনো সচেতন জগতের চেয়েও বেশি সোচ্চার, ক্ষমাহীন, সন্ত্রাস ও প্রলয়কম্পিত। সেখানে অধিকক্ষণ বসবাস কবির জন্য দুর্বহ হয়ে উঠলে কবি কল্পলোক থেকে বাস্তবলোকে চলে আসেন। এভাবে স্বপ্ন ও বাস্তবে সমানভাবে চলে কবির গতায়াত। 'রিয়ালিটি' এবং 'সুররিয়ালিটি'র সহাবস্থান ঘটে তাঁর কবিতায়। রূপান্তরিত হতে থাকে কবির অন্তর্জগৎ ও শব্দভাষ্য। কবির চেতনায় 'স্বপ্ন আর বাস্তবের অপরূপ রাসায়নিক মিশ্রণ' ঘটে নিম্নোক্ত পঙ্‌ক্তিমালায়। কবির স্বপ্ন-জগতের ভেতর লাল-নীল নানা রঙের ঘোড়া আসে তাদের নিঃশ্বাসের গন্ধ নিয়ে। সেই ঘোড়াদের চোখের ভেতর কবি প্রত্যক্ষ করেন সাবেক কালের নানা ভগ্ন দৃশ্য একের পর এক। কবির স্বপ্ন জগতের সেই দৃশ্য, রঙ ও ঘ্রাণের অভিজ্ঞতা অটুট থাকে তাঁর বাস্তব জগতেও—

কয়েকটি ঘোড়া, শাদা, বাদামী, কালো, ওর চারিদিকে চক্রাকারে
ঘোরে। কখনও কখনও এত কাছে এসে পড়ে ওরা, ওদের নিঃশ্বাসের
তাপ এবং গন্ধ সে টের পায়। ঘোড়াগুলোর চোখে ভাঙা প্রাসাদ, উজাড়
বাগান এবং দালানের গায়ে দাপটে গড়িয়ে ওঠা আগাছার নাচ, জলসা
ঘরে প্রায় অস্তমিত আভিজাত্যের মাতলামি, ওস্তাদের ঠুমরি, সারেঙ্গির
সুর, নর্তকীর নূপুর ধ্বনি। একটি বাদামী ঘোড়ার কেশরের দিকে হাত বাড়াতেই
সেই সুন্দর প্রাণী মিলিয়ে যায়। তবে কি সে স্বপ্ন দেখছিল? এই
মুহূর্তে সেই খোয়াব মুছে গ্যাছে একেবারে? কিন্তু ঘোড়াদের সতেজ
নিঃশ্বাস এখনও তার মুখে লেগে আছে যেন।

('ছিন্নভিন্ন হতে থাকি কাস্তের আঘাতে', *টুকরো কিছু সংলাপের সাঁকো*)

এভাবেই কবির স্বপ্ন আর বাস্তবতার ফারাক কমে আসে। কবি তাঁর অবচেতনের স্বপ্নভাষ্যকে বর্ণনা করতে গিয়ে পঙ্‌ক্তি ও ছন্দকে ভেঙে দেন। শব্দ-ভাষা কবির চেতনার অনুসারী হয়।

কবির অন্তর্বাস্তবতার প্রতিফলনে সম্প্রকাশস্বভাবী হয়ে ওঠে কবিতার চিত্রকল্পসমূহ। কবি গাছপালা, চাঁদ, ফুল, পাখিকে অভিব্যক্তিপ্রবণ করে তোলেন। সময়ের নানা 'মুড্' সঞ্চারিত হয় তাদের স্বভাবে। নানা খণ্ড-খণ্ড চিত্রকল্পে প্রকৃতিকে মাধ্যম করে কবি প্রকাশ করেন তাঁর অন্তর্যন্ত্রণা। কবির ক্ষোভ, বেদনা, অপারগতা কিংবা অন্য কোনো অভিব্যক্তির প্রকাশ ঘটে প্রকৃতির সম্প্রকাশ-স্বভাবে—আসমানের ভাঙাচোরা চাঁদ মুখ কালো করে চেয়ে রয়, প্রবল উপহাসে ভেংচি কাটে কবিকে, কখনো চাঁদের মেজাজ বিগড়ে যায়, আকাশটাকে কে যেন প্রচণ্ড চড় কষে হঠাৎ—

ক. আসমানে
ভাঙাচোরা চাঁদ নিচে নেমে এসে হঠাৎ আমাকে
ভেংচি কাটে আর গাছপালা কথা বলে ক্ষণে ক্ষণে
অতিশয় দুর্বোধ্য ভাষায়।

('একটি ভাঙাচোরা স্বপ্নের খসড়া', *না বাস্তব না দুঃস্বপ্ন*)

খ. রাতে চাঁদটা হঠাৎ যেন বেজায়
বেঁকে বসল। বলা যেতে পারে, মেজাজ তার হয়তো
অকারণেই বিগড়ে গেছে। হয়তো
এখনই সে ছিটকে যাবে জলের ঢেউয়ে।

হঠাৎ আকাশটাকে কেন যেন বেখাপ্পা
ঠেকছে। বস্তুত যেন আকাশকে কেউ ভীষণ
চড় কষিয়ে তার সৌন্দর্যকে নির্দয়ের ধরনে
ধ্বংস করে ফেলেছে।

('অথচ বেলা-অবেলায়', *অন্ধকার থেকে আলোয়*)

সময়ের সন্ত্রাসকেও কবি প্রকাশ করেন প্রকৃতির নানা অভিব্যক্তিতে। যেমন, 'শকুন ও কোকিলের কাহিনী' কবিতায় কবি শুভ-অশুভের দ্বন্দ্বকে প্রতীকান্বিত করতে সম্প্রকাশধর্মী এক প্রাকৃতিক লড়াইয়ের অবতারণা করেন, যেখানে একদল মারমুখো শকুন উড়ে এসে আক্রমণ করে নিরীহ কোকিলদের। কোকিলের লাশ পড়ে থাকে সবুজ গাছের নীচে, রক্তে ভিজে যায় মাটি। গাছের ডালে কর্তৃত্ব কায়েম হয় শকুনদের। কিন্তু, অচিরেই কোকিলকূল গান ধরে মিষ্টি সুরে এবং তাঁদের সম্মিলিত আক্রমণে শকুনের দল পড়ি-মরি করে পালায় দূরে। কোকিলের গানে ও নাচে আবার প্রফুল্ল হয়ে ওঠে নদী ('শকুন ও কোকিলের কাহিনী', *গোরস্তানে কোকিলের করুণ আর্তনাদ*)। কবির সংকল্পই প্রতীকান্বিত হয় শকুন আর কোকিলের এই আখ্যানে। শেষ পর্যায়ে কবির চেতনা দারুণ উৎপীড়িত হয়ে উঠেছিল এইসব 'শকুন, নেউল আর কঙ্কালের সহবতে'। কখনো বিমূর্ত অভিব্যক্তিতে কবির কাছে ধরা দেয় তাঁর বর্তমান। অন্ধকার ঘরে অলীক সব সন্ত্রাস ঘিরে ধরে কবিকে। কবির সামনে আজগুবি দৃশ্যের অবতারণা হয় এবং দৃশ্যগুলো একে একে রূপান্তরিত হতে থাকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে— ঘরের দেয়াল ফুঁড়ে কঙ্কালের বীভৎস ভগ্নাংশেরা ঝরে এবং তারা কবিকে শোনায় রক্ত হিম করা কোনো কাহিনী, জল্লাদের ঝলসানো খড়্গে বিদ্ধ কোনো সুদূর কালের রূপসীর কাটা মুণ্ড কাঁদতে কাঁদতে হঠাৎ হেসে ওঠে। পরমুহূর্তেই দৃশ্যপট পাল্টে কবির ভেতর জন্ম নেয় অপরূপ ডালপাতাময় গাছ, সবুজ পাতারা নাচে হাতে, তিন রঙা তিন পাখি ডেকে আনে প্রজাপতিদের ('ঘুমোবার আগে', *গন্তব্য নাই থাকুক*)। এভাবে কল্পনায় রূপান্তরিত বাস্তবতায় কবি প্রকাশ করেন তাঁর সমকালকে। বস্তুত, কল্পনা ও বাস্তবের মিলনকে অর্থময় করে তোলার তাগিদ অনুভব করেছেন কবি এবং তার ফলেই এ পর্যায়ের কবিতায় জন্ম নিয়েছে কবির এই নতুন নান্দনিকতা। বেপরোয়া বৃক্ষ নিধন কবির সংবেদী চিত্তে যে বেদনা বিস্তারিত করেছিল, তিনি তাঁর প্রকাশ ঘটিয়েছেন প্রকৃতির রক্তাপ্লুত চিত্রণে, সমপ্রকাশধর্মী চিত্রকল্পে—

> এ কী? এই শহরের গাছগুলি ক্ষণে ক্ষণে রক্ত বমি করে
> প্রবল ভাসিয়ে দিচ্ছে পথ ঘাট, মাঝে মাঝে
> থামছে খানিক, পরমুহূর্তেই ফের ফিন্‌কি দিয়ে
> রক্ত ঝরে, যেন ওরা ভীষণ আক্রোশে ছুড়ে দিচ্ছে লাল থুতু।
> ('কৃষ্ণপক্ষে অসহায় পঙ্‌ক্তিমালা মহিমাবিহীন যিশু', *ভাঙাচোরা চাঁদ মুখ কালো করে ধুকছে*)

চারিদিকে খুন, ধর্ষণে, সাম্প্রদায়িক আক্রমণে কবির মনে যে আশঙ্কা, আতঙ্ক ও প্রতিবাদ ঘনীভূত হয় কবি তাকে সঞ্চারিত করে দেন প্রকৃতির মধ্যে। প্রকৃতিও কবির সাথে সাথে ভীষণ অসুখী হয়ে ওঠে। সমাজ জীবনের এই প্রচণ্ড মানবিক বিপর্যয়ে তাঁর কবিতায় ভর দুপুরেই নামে অমাবস্যা এবং চাঁদ হয়ে

ওঠে বিষণ্ন ও বিদ্রোহী। রোদ আর জ্যোৎস্না গভীর বেদনায় হয় রোরুদ্যমান—'' সারাদিন রোদ আর সারারাত ধরে জ্যোৎস্না কাঁদে, শুধু কাঁদে''। কুয়াশার কাফন আচ্ছন্ন করে কবিকে, অমাবস্যা চারিদিকে ঝুলিয়ে দেয় পাথুরে পর্দা। মানুষের আশঙ্কাকে ব্যক্ত করতে কবি বিচূর্ণ আকাশের উৎপ্রেক্ষা প্রয়োগ করেন—

আকাশটা যেন ভাঙা বাসনের মতো
এক্ষুণি পড়বে ঝরে আমাদের ভয়ার্ত মাথায়ড়এ রকম
আশঙ্কায় কাটছে সময় অনেকের।
('ভর দুপুরেই অমাবস্যা', *ভাঙাচোরা চাঁদ মুখ কালো করে ধুকছে*)

কবি বর্তমানকে উপস্থাপন করেন এক জন্মান্ধ সন্ধ্যার টুকরো টুকরো দৃশ্য ও শ্রুতিকল্পে, বিমূর্ত বাস্তবতায়—প্রকৃতির অস্বভাবী দৃশ্য-চিত্রণে—

মনে হচ্ছে পশ্চিম আকাশ
কালো বিস্কুটের মতো আর
চাঁদ কোনও বুড়োর ধরনে কতিপয়
ফোকলা দাঁতের আহামরি সৌন্দর্যের
বিদঘুটে বাজারু প্রচারে অশ্লীল!
বিদঘুটে হিংসুটে এক বৃক্ষতলে
ক'জন জুয়াড়ি
মেতেছে খেলায় আর কখনও
তাদের হুল্লোড়ে কেঁপে ওঠে
জমি, যেন গিলে খাবে সেই
ফতুর জুয়াড়িদের। আচানক নারীর কান্নার
ধ্বনি ভেসে আসে ক্ষণে ক্ষণে ঘোর কৃষ্ণ
দিগন্তের বুক চিরে।
('বিস্মিত দৃষ্টিতে', *গোরস্তানে কোকিলের করুণ আর্তনাদ*)

যখন এই দেশেই হিংস্র লোলুপ পশুদের ধর্ষণের শিকার হয়ে ললিতা বোনের অচেতন শরীর পড়ে রয় ঝোপঝাড়ে, তখন প্রকৃতির মধ্যে কবি ছড়িয়ে দেন সেই যৌন-সন্ত্রাসের ভয়াবহতা—''পুর্ণিমা লুপ্ত হয় হিংস্র অমাবস্যার যৌনাচারে'' আর পাথরের চোখ ফেটে যে কয় ফোঁটা অশ্রু ঝরে, তাও শুষে নেয় পোড়া মাটি ('শুষে নেয় পোড়া মাটি', *ভস্মস্তূপে গোলাপের হাসি*)। চারিদিকে প্রতিকারহীন নির্বিবাদী অত্যাচারকে কবি প্রকৃতির এমনি নানা অভিব্যক্তিতে প্রকাশ করে চলেন। কোকিল মূক হয়ে যায়, তমাল গাছের ডালপালা ও ছায়া শোকার্ত হয়ে রয় ভীষণ। যখন পথে-ঘাটে খুন হয়ে পড়ে রয় মানুষ তখন সেই খুনী সত্তাকে কবি প্রবিষ্ট করেন প্রকৃতির মধ্যে—'' অকস্মাৎ জ্যোৎস্নাকে খুন করে অন্ধকার ছেয়ে যায় চতুর্দিকে সন্ত্রাসীর মত'' ('ঘরে ফেরানো গানের জন্য', *ভস্মস্তূপে গোলাপের হাসি*)। কখনো প্রতীকী দৃশ্য ও চরিত্র কল্পনা করে কবি এই সন্ত্রাসের নগ্নতাকে প্রকাশ করেন। 'বস্তির খুব

কাছে' কবিতায় একজন বৃদ্ধকে আক্রমণ করে এক পাল শকুন। বৃদ্ধ প্রাণপণ লড়াই করেও পরাজিত হয়। শকুনেরা ভয়ঙ্কর হিংস্রতায় সওয়ার হয় তার উপর। অবশেষে শকুনের পাল অন্তর্হিত হলে সেখানে পড়ে থাকে 'কয়েকটি মানবিক হাড়'। কিন্তু, সেখানেই শেষ নয় কবিতা। কবির পরাবাস্তব কল্পনায় শেষ পর্যন্ত সেই মানবিক হাড়গুলো এক আলোকিত মানবে রূপান্তরিত হয়ে আকাশে ভাসতে থাকে—

জ্যোৎস্নারাতে বুড়োর হাড়গুলো সজীব, সুন্দর হয়ে
একজন অপরূপ মানব হয়ে আসমানে ভাসে।
('বস্তির খুব কাছে', *গোরস্তানে কোকিলের করুণ আর্তনাদ*)

সমকালীন সন্ত্রাস প্রতিকৃত হয় কবির অবচেতনায় কতিপয় হার্মাদের নানা আনাগোনায়। কবির দুঃস্বপ্নে কিংবা দৃষ্টিভ্রমে বারবার হানা দেয় নিষ্ঠুর এই হার্মাদ দল—

আমার দু'হাত বেঁধে কতিপয় হার্মাদ আমাকে কোথায়
যেন নিয়ে যাচ্ছে, ফের দেখি ভয়ঙ্কর
চেহারার কিছু লোক আমাকে ঝুলিয়ে
উঁচু কণ্টকিত গাছে সোৎসাহে দুলিয়ে শরীর
নেচে নেচে দৃষ্টি রেখে বিমর্ষ বন্দির দিকে বাজাচ্ছে ঢোলক!
('একটি দুঃস্বপ্নের ছায়া', *না বাস্তব না দুঃস্বপ্ন*)

কবি অলীক দৃশ্য বা শ্রুতি কল্পনার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেন তাঁর অন্তর্গত ভয়, নিঃসঙ্গতা এবং বিপন্নতা। কখনো কবি নিজেকে অস্পষ্টরূপে দেখতে পান একটি অন্ধকার কক্ষে, যার চার দেয়ালের বুক চিরে অকস্মাৎ বইতে থাকে রক্তধারা, শোনা যায় অদেখা যুবতীদের বুকফাটা আর্তনাদ। স্বপ্নের ভেতর কবি সেই মরণপ্রতীম চার দেয়ালের ভয়ঙ্কর অন্ধকার কক্ষ থেকে বের হতে পারেন না ('আখেরে আঁধারে', *অন্ধকার থেকে আলোয়*)। কবির ভয়ার্ত বাস্তবতা—মৌলবাদী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির রক্তচক্ষু ও উদ্যত খড়্গ কবিকে তাঁর সচেতন জগতে যেমন তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়, তেমনি তা ক্ষমাহীন হয়ে ওঠে কবির অবচেতনায়ও। কবিতার পর কবিতায় এমনি সব ভয়ঙ্কর কল্প-দৃশ্যের মধ্য দিয়ে কবি ব্যক্ত করেন তাঁর অনস্তিত্বের বাস্তবতার কথা। কোনো মধ্যরাতে ঘুম ভেঙে গেলে কবির মনে হয় কখনো কবির হাতখানা শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, কখনো তাঁর মুণ্ডুটিই ধড়চ্যুত হয়ে ঘুরে বেড়ায় ঘরময়। কিছু অদ্ভুত ছবি দৃশ্যমান হয়ে মিলিয়ে যায়, হঠাৎ হুড়মুড় করে ভেঙেচুরে যায় দেয়াল কখনো। কখনো কোনো জল্লাদের মুখ কিংবা বিভিন্ন হাতিয়ার নাচতে থাকে কবির চোখের সামনে। স্বপ্নের ভেতর কবিকে ঠুকরে খায় কয়েকটি কাক, তাঁর মাংস খুবলে খায় ক্ষুধার্ত শকুন। কবি তাঁর তন্ময়তায় কিংবা জাগরণেও শুনতে পান অদ্ভুত, দুর্বোধ্য, বেখাপ্পা ধ্বনি ('আমি আর আমি নই', *গোরস্তানে কোকিলের করুণ আহ্বান*)।

কবির রূপান্তরিত জগতে ঐতিহ্যের আনাগোনা চলে । কবি তাঁর অন্তর্বাস্তবতা প্রকাশেই ঐতিহ্যের চূর্ণগুলোকে অবলম্বন করেন এবং সেগুলোকে ভেঙে-চুরে, রূপান্তরিত করে নতুন বাস্তবতার সাথে মিলিয়ে দেন—

ছুটছি, ছুটছি জানি না কোথায়। গা থেকে ঝরছে
দরদর করে ঘাম নাকি খুন বলা মুশকিল।
আবার দেখছি শিরির প্রেমিক ফরহাদ হয়ে
জটিল পাহাড়ে কাটছি নহর। অথচ আমার
শিরিকে দেখতে পাই না কোথাও। আবার হঠাৎ
দেখি রাধা কাঁদে বকুলতলায়, আমি কৃষ্ণের
বাঁশিতে মদির সুর বাজাতেই চৌদিক থেকে
পাখি এসে বলেড়এই বাঁশি তুমি বাজিও না আর।
('স্বপ্ন না বাস্তব', *না বাস্তব না দুঃস্বপ্ন*)

কবির মগ্নচেতনায় জমে থাকা নানা ঐতিহ্য, চিত্র, সুর এমনকি চিত্রকর, কবি, বহুকালের চেনা নানা শিল্পী ও তাদের শিল্পকর্মগুলির বিচূর্নীভবন ঘটে, রূপান্তর ঘটে । আমরা এক নতুন বাস্তবতায় আবিষ্কার করি সেইসব ঐতিহ্যের চূর্ণরাশি। কবির তন্ময়তার ঘোরে বারবার আবির্ভাব ঘটে বীণা হাতে হংসারূঢ়া দেবী সরস্বতীর। জ্যোতির্ময়ী সরস্বতী আসেন কবির সন্নিকটে এবং তাঁকে উপহার দেন একটি হাসের পালক ('ধোঁয়াশার ভেতর যেতে যেতে', *শুনি হৃদয়ের ধ্বনি)*। মাঝে-মাঝে কবি বাস্তব থেকে অবচেতনায় চলে যান কোনো অলৌকিক প্রেতায়িত আসরে, সেখানে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ হয় সর্বকালের মহাকবিদের সাথে। কখনো কবির ঘরময় নেচে বেড়ান সূফী কবি, কখনো হঠাৎ মধ্যরাতে রবীন্দ্রনাথ এসে দাঁড়ান কবির পাশে। কোনো দিন কবির বিজন ঘরে আসর বসে অনেক কালের কবি-শিল্পীর—

গভীর রাতে যখন সবাই ঘুমের গুহায়
নিশ্চেতন, এ ঘরে বসে যায় প্রজাপতি, ফড়িং, জোনাকি, গাঙচিল,
ডাহুক, দোয়েল, পাপিয়া আর লাল নীল পদ্মের আসর। ছেঁউড়িয়ার
একতারা আর শান্তিনিকেতনের এস্রাজ হয় সঙ্গীতময়। রবীন্দ্রনাথ সেই
আসরে গ্যেয়টেকে হাত ধরে নিয়ে আসেন, নজরুল ইসলামের মনোহর
বাবরি দুলিয়ে নাচ জুড়ে দেন শ্যামা সঙ্গীতের তালে তালে পাবলো
নেরুদা আর মায়োকোভস্কির সঙ্গে। রুক্ষ, রোদেপোড়া ভ্যানগগ এক উন্মাতাল ঘোরে
ক্যানভাসে তোলেন তুলি এবং রঙের ঝড়। আমার সৌভাগ্যে ঝলমলে
আমি দেখি চোখ ভরে, শুনি অলৌকিক কলতান। তুমি দাঁড়িয়ে
আছো এক কোণে আমার হাতে ঘনিষ্ট, মদির, দ্যুতিময় হাত রেখে।
('অলৌকিক আসর', *মেঘলোকে মনোজ নিবাস*)

এভাবে কবির কবিতায় চলে আসে সুদূর কালের ঐতিহ্যের চূর্ণরাশি। কবির স্বপ্নের ভেতর সেই ঐতিহ্য আসে ভগ্নাবশেষরূপে।কবি সচেতন চিত্তেই একটি কল্পজগৎ নির্মাণ করেন, যেখানে সময়ের গণ্ডি অতিক্রম করে চণ্ডীদাস ও ভবভূতির মত ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের সাথে সাক্ষাৎ হয় কবির, এমনকি কবিকে তাদের আপ্যায়ণের জন্য উদ্ব্যস্ত হতেও লক্ষ করা যায়। তারপর হঠাৎ ঘরটি ঐরাবৎ হয়ে আকাশে উড়ে যায় এবং এই পরাবাস্তব ভ্রমণ শেষে কবি ফিরে যান তাঁর শয্যায় ('তার কথা', টুকরো কিছু সংলাপের সাঁকো)। এ পর্যায়ে কবির চেতনায়, স্বপ্নে, অবচেতনের নানা স্তর জুড়ে তৈরি হয় এমন শিল্পিত বিভ্রম। বাস্তব জগৎ থেকে কল্পজগৎ, কল্পজগৎ থেকে বাস্তব জগতে চলে কবির বিচরণ। ক্রমশ সময়কে কবি চলমান করে তোলেন। বিদ্যমান বাস্তবতা কবির কল্পজগতের নব্য বাস্তবতার সাথে একীকৃত হয়ে রূপান্তরিত হয়। কবি মহুয়ার আদলে তাঁর আধুনিক দয়িতাকে নিবেদন করেন সনেট আর ভিলানেল ('বৈশাখে সুস্পষ্ট লেখে', টুকরো কিছু সংলাপের সাঁকো)। একইভাবে 'সোনিয়া ডার্লিং'য়ের প্রতি নীলাভ জিন্স পরা একালের যুবকটির প্রতীক্ষা আর সুদূরকালের গীতিকার মহুয়ার জন্য নদের চাঁদের হৃদয়াবেগকে কবি একীকৃত করেন অনন্য কৌশলে ('অনন্তের গোধূলি রঙিন পথে', টুকরো কিছু সংলাপের সাঁকো)। ঐতিহ্যকে পুনর্নির্মাণ করেন কবি, কিংবা ঐতিহ্যের উল্লিখন ব্যবহার করেন কিন্তু তা কলাকৈবল্যবাদী উত্তরাধুনিক কবিতার ধরনে নয়; নিছক আয়রনির উদ্দেশ্যে কিংবা প্রলাপের মত করে উচ্চারিতড়্বাস্তব ও কল্পনার বিরোধ সূত্ররূপে নয় কিংবা বক্তব্য-বর্জিত ভাষার উল্লম্ফনরূপে নয়। তিনি কবিতায় অনেকটা মর্ডানিস্টদের ধরনেই ঐতিহ্যকে অবলম্বন করেন বাস্তবের বীভৎসতাকে প্রকট করে দেখানোর জন্য এবং সে বিভীষিকা থেকে উত্তরণের জন্যও। অর্থাৎ, কবিতায় ঐতিহ্যের নবায়নের মধ্য দিয়ে অন্তর্নিহিত বাস্তবতা রূপান্বিত হলেও তা বহির্বাস্তবতার স্বার্থও রক্ষা করে চলে । ভেতরে-বাইরে কবি ঐতিহ্য দ্বারা প্রভাবিত হন। কবির কবিতায় নানা ঐতিহ্যের যে রূপান্তর তা অন্তর্নিহিত সত্যের ঊর্ধ্বে না, বরং অন্তর্বাস্তবতার সেই সত্যই বর্তমান সত্য হয়ে ধরা দেয় কবির চেতনায়। কবি তাকে বিমূর্ত করে তুললেও বাস্তবের গহীন ও গূঢ় সত্য তাতে ঢাকা পড়ে না। ঐতিহ্যকে কবিতায় উপস্থাপনের এই দ্বিস্তরী নান্দনিকতা শামসুর রাহমান আয়ত্ত করেছিলেন নিজস্ব পরিবেদনা ও রূপায়ণ কৌশলে। আর দেশ ও বিশ্বের জন্য এক বিশেষ শ্রেয়োচেতনা ও শুভ কামনা তাকে ঐতিহ্য থেকেই শক্তি নিতে শিখিয়েছিল। সত্য বটে যে, সমকালীন বাস্তবতার অভিঘাতে, কবির নব্য রূপায়নে মহুয়া আর নদের চাঁদ কংসাই নদীর ধারে হাত ধরাধরি করে হেঁটে গেলে হুমরা বেদের বিষ ছুরি আঁধারে ঝলসে ওঠে, পিকাসো তাঁর 'গোয়ের্নিকা' ছুড়ে মারে তালেবানি কসাইখানায় আর লালনের অচিন পাখি রক্তাক্ত পড়ে রয় ছেউড়িয়ায়। তবু, চণ্ডীদাস, ভবভূতি, সূফী কবি, লালন, রবীন্দ্রনাথ বারবার এসে কবির পিঠে হাত রাখেন। তাঁরা কবিকে তিমির

Dhaka University Institutional Repository

বিনাশী পঙ্‌ক্তি রচনার স্বপ্ন দেখান। মহত্ত্বের স্পর্শ সাধনার পথেই যে পৃথিবীর ক্রম-মুক্তি সে সত্যও অনুধাবন করতে সমর্থ হয়েছিলেন কবি। মহত্ত্বের সংস্পর্শে অমবস্যা রূপান্তরিত হবে পূর্ণিমায় আর কাঁটাময় জঙ্গল পরিণত হবে সুশোভিত বাগানে সেই শুভ কামনা ছিল কবির শেষ পর্যন্ত ('শুধু চাই স্পর্শ সাধনার', গোরস্তানে কোকিলের করুণ আহ্বান)।

কেবল ঐতিহ্যের পথেই নয়, সার্বিকভাবে কবি চেয়েছিলেন পুনর্গঠিত এক স্বদেশ ও বিশ্ব। চারিদিকে সমূহ সন্ত্রাস ও অরাজকতা সত্ত্বেও কবি 'অন্ধকার থেকে আলোয়' যাবার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন বারবার। দারুণ 'কৃষ্ণপক্ষে'র মত বর্তমানকে বাস্তবতা জেনেও পূর্ণিমার দিকে চলার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। 'ভস্মস্তূপে গোলাপের হাসি' দেখতে চেয়েছেন। কবি তাঁর সেই শুভ কামনা ব্যক্ত করেন বর্ণনার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় রীতিতেই। যেমন, 'গলে-যাওয়া দীর্ঘকায় লোক' কবিতায় কবি তাঁর সামনে দীর্ঘকায় এক মানবকে হঠাৎ মোমের মত গলে যেতে দেখেন। তারপর জাঁহাবাজ ডাকাতের উপদ্রবে শহরবাসী যখন সন্ত্রস্ত ও অসহায়, তখন সেই গলিত মোমের স্তূপ থেকে উঠে আসে দীর্ঘদেহী রূপবান পুরুষেরা এবং তারা ছুটে চলে শত্রু তাড়ানো যুদ্ধে জয়ী হতে—

যখন শহরবাসী হতাশার হিম অন্ধকারে
হাবুডুবু খাচ্ছিল, হঠাৎ চৌদিক থেকে আলো
জেগে ওঠে আর কিয়দ্দূর থেকে অপরূপ গীত
ভেসে আসে। কী আশ্চর্য! গলিত মোমের
স্তূপ থেকে দীর্ঘদেহী রূপবান পুরুষেরা জেগে
উঠে শত্রু-তাড়ানোর যুদ্ধে জয়ী হতে ছুটে যায়।
('গলে-যাওয়া দীর্ঘকায় লোক', *গোরস্তানে কোকিলের করুণ আর্তনাদ*)

বাস্তব অনম্য জেনেও কবি রূপান্তরিত বাস্তবতায় সন্ত্রাস-মুক্ত সুন্দর দেশের স্বপ্ন নির্মাণ করে চলেন। তা প্রকাশের মাধ্যমরূপে অবলম্বন করেন কল্প-বাস্তবতাকে। বাস্তব জগতের মতই এক কল্পজগত নির্মাণ করেন কবি, যেখানে সমস্ত সহিংসতার মধ্যেও আশাবাদী এক উত্তরণ ঘটে যায় শেষ পর্যন্ত। যেমন, 'ডাহুক' কবিতায় কবি এক তিন মাথা-ওয়ালা ভয়ঙ্কর জীব কল্পনা করেন, যে গায়ক পাখির চিরশত্রু। সেই রক্তপায়ী জন্তুর চারপাশে ছড়ানো থাকে বহু পাখির ছিন্ন মুণ্ড, অর্ধভুক্ত যকৃৎ, প্লীহা। কিন্তু, শেষ পর্যন্ত সুরের সাধক ডাহুক পাখিটি সেই ভয়ঙ্কর প্রাণীর হিংস্রতার অন্ধকার গলিয়ে উড়ে যায় দিগন্তে—

আর কী অবাক কাণ্ড, সেই ভয়ঙ্কর প্রাণীর আমিষাশী
দন্ত-নখরের নাছোড় হিংস্রতাকে ফাঁকি দিয়ে এক দ্যুতিময়
পাখির কী তন্ময় উড়াল, সপ্ত সিন্ধু দিগন্তে অন্তহীন
প্রকৃতি-মাতানো কী গান!
('ডাহুক', *মেঘলোকে মনোজ নিবাস*)

Dhaka University Institutional Repository

ডাহুক আর বীভৎস জন্তুটির চিরন্তন দ্বন্দ্ব ও ডাহুকের এই উড্ডয়নের মধ্য দিয়ে কবি তাঁর কল্পভূবনেও একধরনের অলিখিত প্রতীকায়ন ঘটান এইভাবে এবং একটি ইতিবাচক উত্তরণের সম্ভাবনার ইঙ্গিত দেন। ঠিক যেমন অন্য একটি কবিতায় শকুন আর কোকিলের দ্বন্দ্বে শকুনের পরাভবের মধ্য দিয়ে কবি অশুভ শক্তির পতনের চিত্রণ ঘটান। দেশে বিরাজমান প্রবল কৃষ্ণপক্ষ রাতগুলি একদিন পূর্ণিমায় বিভাষিত হবে—

ষড়যন্ত্র যতই তুখোড় হোক, অন্ধকারে অস্ত্র
যতই শানাক কিংবা অশুভের সঙ্গে সন্ধি করে
বুনুক ধ্বংসের বীজ যত্রতত্র, আখেরে নিশ্চিত শুভ জয়ী
হয়ে চতুর্দিকে কৃষ্ণপক্ষে পূর্ণিমার পথ খুলে দেবে ঠিক।
('কৃষ্ণপক্ষে পূর্ণিমার পথ', *কৃষ্ণপক্ষে পূর্ণিমার দিকে*)

মৃত্যুর আগ পর্যন্ত সহস্র প্রতিকূলতার ভেতরও কবি এই শুভ উত্তরণের কথা ব্যক্ত করে গেছেন তাঁর কবিতায়। আধুনিক কবিদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য বিচ্ছিন্নতা, অনিকেত ভাব, জীবনের নঞর্থকতা প্রভৃতি শামসুর রাহমানকে গ্রাস করতে পারেনি। সত্য বটে, বৈশ্বিক, জাতীয় কিংবা ব্যক্তিগত নানা বিপর্যয়ে কবি বারবার বিবরবাসী হয়েছেন, কিন্তু অন্যায়-অপরাধ, অপশক্তির পাখা-বিস্তার, যুদ্ধ-শোষণ-সন্ত্রাস ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে যথাসময়ে আবার সোচ্চার হয়ে উঠেছেন। শেষ পর্যন্ত নঞর্থকতা তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি। শম্ভু মিত্র যথার্থই বলেছেন—''যখন অন্য কবিরা যান্ত্রিক সভ্রতার অবক্ষয়, বেদনা, দুঃখও আর্তিতে জর্জরিত, ঠিক তখনই তিনি প্রচণ্ড আশার ছবি এঁকেছেন। আর কোনো কারণে না হোক, অন্তঃত এই একটি গুণের জন্য আধুনিক বাংলা কবিতার ইতিহাসে তিনি অমর হয়ে থাকবেন'' (শম্ভু, ১৯৯১: ২৬২-২৬৩)। শেষ পর্বের কাব্যে কখনো পরোক্ষ নান্দনিকতায়, কখনো শব্দ-ভাষার প্রত্যক্ষতায় শামসুর রাহমান অবসান কামনা করেছেন বাংলাদেশে উগ্র মৌলবাদ, স্বাধীনতা বিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল শাসকচক্রের ষড়যন্ত্র, ফতোয়াবাজদের নির্মম দৌরাত্ম্য, সন্ত্রাস, হত্যা, ধর্ষণ, সংখ্যালঘু নির্যাতন প্রভৃতি অমাবস্যার মত সমস্ত অন্ধকারের। চণ্ডীদাসের বাণী—'সবার উপর মানুষ সত্য, তাহার উপর নাই' ছিল শেষ পর্যন্ত কবির আপ্তবাক্য (শামসুর, ২০১১: ১২৬)।

শেষ পর্বের নানা কবিতায় আশা ও দীর্ঘশ্বাসের মত ছড়িয়ে আছে কবির নানা বিচ্ছিন্ন ভাবনা, কবি সেগুলোকে ব্যক্ত করেছেন সহজ ভাষায়—নিজস্ব অনুভবের মত করে আউড়ে গেছেন কিন্তু এ পর্যায়ে কবির উপর ব্যাপকভাবে আধিপত্য করেছে তাঁর কল্পনা, স্বপ্ন, অবচেতনা ও তন্ময়তা। এ

Dhaka University Institutional Repository

অংশের কবিতাগুলোর মধ্যে কবির সেই কবিতাগুলোই অনন্যতা অর্জন করেছে, যেগুলোতে কবি বাস্তবের মতই এক রূপান্তরিত ভুবনকে নির্মাণের নান্দনিক কৌশল অবলম্বন করেছেন। কবি এখানে যেন একটি অদৃশ্য দরজা দিয়ে বারবার প্রবেশ করেন অবচেতনলোকের বিচিত্র ভুবনে, কোনো অলৌকিক আসরে কিংবা কোনো বিভীষিকাময় প্রান্তরে—মুখোমুখি হন অনেক অদৃশ্য সত্তার কিংবা হন অনেক অলীক সংঘটনের সাক্ষী হন। অতঃপর সেই অদ্ভুত রহস্যময় অবচেতনপুরী থেকে কিছু শব্দ, ভাষা, চিত্রকল্প, কিছু সংবেদনার আলো বা তামস নিয়ে তিনি ফিরে আসেন তাঁর লৌকিক জগতে। তখন কবির খাতা গুঞ্জরিত হয়ে ওঠে 'অজস্র রঙধনুরূপী শব্দের মিছিলে'। কবির খাতার পাতায় চরাচর জেগে ওঠে নানা অদৃশপূর্ব অলীক অথবা অনিন্দ্য অভিব্যক্তিতে, লোমহর্ষক সব স্বভাব ও আচরণে, ত্রাস সঞ্চারী অথবা ত্রাসিত অস্তিত্বের ভয়াবহ অন্ধকার নিয়ে। প্রকৃতই কবি বমন করে চলেন 'পূর্বষাঢ়া, রেবতী, বিশাখা, স্বাতী, শতভিষা, জোহরা, সিতারা, সপ্তর্ষিমণ্ডল' আর অনেক অচেনা মণিমুক্তা ('কবি', *মেঘলোকে মনোজ নিবাস*)। সমাসোক্তি, রূপান্তরধর্মিতা, সম্প্রকাশধর্মী ও বিমূর্ত নানা স্বভাবের কল্পচিত্রায়ণ, শব্দ-ভাষার অদ্ভুত ও অপরিমেয় প্রকাশক্ষমতা, গদ্য-ভাষা ও গদ্যছন্দের সহযোগ শামসুর রাহমানের এ পর্যায়ের কবিতাকে একটি অনাস্বাদিতপূর্ব নান্দনিকতায় অনন্যতা দান করেছে বাংলা কবিতায়।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যপঞ্জি:

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় [অনুবাদ] (১৯৯২) ষাঁড় ও কিন্নর: ফেদোরিকো গারসিয়া লোরকার কবিতা পৃ.(ভূমিকা)

ফরহাদ মাজহার (জানু-মার্চ ১৯৯১), ''শামসুর রাহমানের কবিতার একটি রাজনৈতিক পাঠ'', *মীজানুর রহমানের ত্রৈমাসিক পত্রিকা* [সম্পা: মীজানুর রহমান] ষষ্ঠ বর্ষ: ৩য় সংখ্যা, উবিনীগ, ঢাকা, পৃ. (৩৭৯-৪০৪)

শম্ভু মিত্র (১৯৯১) ''শামসুর রাহমানের কবিতা'', *মীজানুর রহমানের ত্রৈমাসিক পত্রিকা*, [সম্পা: মীজানুর রহমান], ষষ্ঠ বর্ষ: ৩য় সংখ্যা, উবিনীগ, ঢাকা, পৃ. (২৬২-২৭৩)

শামসুর রাহমান (২০১১) ''অন্তরঙ্গ শামসুর রাহমান'', [সাক্ষাৎকার: আবুল আহসান চৌধুরী], *কবি কথন : শামসুর রাহমানের নির্বাচিত সাক্ষাৎকার*, [সম্পা. আহমদ মাজহার ও পিয়াস মজিদ], শুদ্ধস্বর, ঢাকা, পৃ. (১১০-১২৮)

শামসুর রাহমান (২০০৪) ''কিছু কথা'', শামসুর রাহমান রচনাবলী-১, ঐতিহ্য প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ. (ভূমিকা)

সারওয়ার মুরশিদ খান (২০০৬) ''শামসুর রাহমান রচনাবলী-র ভূমিকা'', *নির্জনতা থেকে জনারণ্যে: শামসুর রাহমান* [সম্পা. ভূঁইয়া ইকবাল ও রেজাউল করিম সুমন], মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, পৃ. (৪৬-৫৯)

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

শামসুর রাহমান বাংলা কবিতার পঞ্চাশের দশকের প্রতিনিধিত্বস্থানীয় কবি—নান্দনিক অভিজ্ঞানে বৈশ্বিক ও আধুনিক অথচ কাব্য রচনায় নিজত্ব প্রত্যাশী, ক্রমাগত স্বাতিক্রমণেচ্ছু। বিশ্ব-কবিতা আত্মস্থকরণে তিনি অগস্ত্য সমান। বিশেষ কোনো রাজনৈতিক দর্শনে আবদ্ধ নন তিনি—রোমান্টিক-আধুনিক-উত্তরাধুনিক কোনো তক্‌মার প্রতি বিশেষভাবে পক্ষপাতী নন। রবীন্দ্রনাথ, বাঙালি আধুনিক কবি, সাম্প্রতিক উত্তরাধুনিক কবিদের যাঁর-যাঁর অবস্থানে রেখে মূল্যায়ন করেন তিনি। দান্তে থেকে শুরু করে পাশ্চাত্য কবিতার অধুনাতম ধারার কবিতার নন্দন-ভাবনাকে তাঁর কাব্য-অভিজ্ঞানে গ্রহণ-বর্জন-আত্তীকরণ এবং দৈশিক, নাগরিক দৈনন্দিন বাস্তবতার সাথে কবিতার শব্দ-ভাষা ও অভিপ্রায়কে মানানসই করে তুলে একটি নিজস্ব 'স্টাইল' নির্মাণ ও তাকে ক্রমাগত বৈচিত্র্যময় করে তোলার প্রয়াস শামসুর রাহমানের কবিতাকে এক অনন্য নিজস্বতা দান করে, যা বাংলাদেশের কবিতায় এক নতুন আভিজাত্য সঞ্চার করে—এ দেশের নাগরিক জীবনের শব্দ-ভাষা, ছন্দ-তান এবং জীবনোপলব্ধির মার্জিত ভঙ্গিটিকে প্রকাশ করে। বহির্বাস্তবতা ও অন্তর্বাস্তবতার ভিন্ন-ভিন্ন বহিরাশ্রয় ও প্রকাশভঙ্গি আবিষ্কৃত হয় শামসুর রাহমানের কবিতায়—মিথ-প্রতীক-পরাবাস্তবতা, স্বপ্নচিত্রকল্প, রূপান্তরধর্মিতায় (transmutation)। আধুনিক মানুষের জাগরণ, দুঃস্বপ্ন, চেতনা-বিভঙ্গের ভাষাচিত্র নির্মাণে প্রতিনিয়ত পাল্টায় তাঁর কবিতার পঙ্‌ক্তি-বিন্যাস। অন্তর্বাস্তবতার চিত্রণের সাথে-সাথে জাতীয় সংকটে গণ-দাবীর সাথে গভীর একতাবোধে বহুস্বরিক হয়ে ওঠে তাঁর কবিতা। তখন স্লোগানকে নান্দনিক করে তোলেন কবি। শোষকের বিরুদ্ধে বর্ষিত কবির ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ শিল্পিত হয়ে ওঠে। বারংবার কবি অন্তর্ময়তা থেকে বহির্লোকে পদযাত্রা করেন, আবার সংঘাত থেকে অন্তর্জগতে প্রস্থান করেন। সেই সূত্রে কবির কবিতার নান্দনিকতা পাল্টে যায় আমূল। প্রকৃতপক্ষে, শামসুর রাহমান অবিরাম প্রসবকাতর হওয়া সত্ত্বেও এভাবেই কবিতায় বৈচিত্র্যাভিলাষী।

শামসুর রাহমান পঞ্চাশের দশকে কাব্য রচনার শুরুতেই *প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে* কাব্যে 'ল্যাজারসে'র মিথ-প্রতিমায় তাঁর নাগরিক বিবিক্তি প্রকাশ করেন। নগর ঢাকার বুকে এক জীবন্মৃত সত্তা নিয়ে কবি পর্যবেক্ষণ করেন তাঁর পরিপার্শ্ব, যদিও পোড়ো-হৃদয়ে লালন করেন 'রূপালি স্নানে'র রোমান্টিক স্বপ্ন। দ্বিতীয় কাব্য থেকেই কবি অভিযোজিত হন নাগরিক জীবনবৈচিত্র্যের সাথে। *রৌদ্র করোটিতে*'তে কবি তাঁর একক বিপন্নতাকে ছোট-ছোট নানা বহিরাশ্রয়ে ছড়িয়ে দেন। কবি

Dhaka University Institutional Repository

নাগরিক জীবনের দিনানুদৈনিক ছন্দ-তানের ভাষাচিত্র খুঁজে পান। *রৌদ্র করোটিতে*'তে লব্ধ এই 'স্টাইল'টিই শামসুর রাহমানের কবিতার মৌল লক্ষণ হয়ে বাংলা কবিতায় একটি নতুন অভিপ্রায় সংযোজন করে। মূলত, এটিই বাংলাদেশের কবিতায় রাহমানীয় নান্দনিকতা বলে পরিচিত।

শামসুর রাহমানের স্বাধীনতা-বিষয়ক যে কবিতাগুলো সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়তা অর্জন করে, সেগুলো কবি রচনা করেন ষাটের দশকের লিভারপুল কবিদের পুনরাবৃত্তি ও তালিকায়ন রীতির কবিতার প্রবর্তনায়। শব্দ, শব্দগুচ্ছ, বাক্যাংশ, বাক্য, স্তবক-পুনরাবৃত্তির কৌশলে 'ক্যাটালগিং' পদ্ধতিতে কবি রচনা করেন 'স্বাধীনতা তুমি', 'তোমাকে পাওয়ার জন্য হে স্বাধীনতা'র মত সাবলীল অথচ হৃদয়োদ্দীপক কবিতাগুলো। সত্তরের দশকের অধিকাংশ কবিতা কবি এই 'ফর্মে' রচনা করেন। তবে, লিভারপুল কবিদের কবিতার এই বিশেষ আঙ্গিকটিকে ভিন্ন প্রেক্ষাপটে, নিজস্ব স্বভাবে কবি এমনভাবে পুনর্নির্মাণ করেছেন যে, স্বাধীনতার শব্দমালা শ্লেগানের মত সুরেলা হয়ে মুক্তিকামী বাঙালিকে উদ্দীপ্ত করে। এভাবেই বাংলাদেশের স্বাধীনতার সাথে তাঁর কবিতা সমসূত্রে কালজয়ী হয়ে ওঠে।

স্বাধীনতা-পরবর্তী সময় থেকে আশির দশকের মাঝামাঝি সময়ে লেখা তৃতীয় পর্যায়ের কাব্যগুলোতে শামসুর রাহমান ব্যষ্টি চেতনা থেকে আবার অন্তর্ময়তায় প্রস্থান করেন। *আদিগন্ত নগ্ন পদধ্বনি* (১৯৭৪) থেকে *কবিতার সঙ্গে গেরস্থালি* (১৯৮৩) পর্যন্ত কাব্যগুলোতে কবি বাস্তব-পরাবাস্তব-স্বপ্ন-কল্পনার স্বতঃচিত্রণে আগ্রহী হন। মনোবাস্তবতার প্রকাশে কবি বিংশ শতাব্দীর পরাবাস্তববাদী আন্দোলনের কবিদের মত কবিতায় ব্যবহার করেন স্বয়ংক্রিয় লেখনী পদ্ধতি (automatic writing)। কবি তাঁর কবিতায় আমদানি করেন স্বপ্নকল্পচিত্র (dream imagery), অতিবাস্তব চিত্রকল্প, গূঢ় প্রতীক, চিত্রকলার কলাকৌশল। এছাড়া, মিথ-প্রিয় কবি এ পর্বে 'ট্যান্টালাস', ডেডেলাস', 'ইকারুসের আকাশ', 'চাঁদ সদাগর' প্রভৃতি কবিতায় মিথের পুনর্নির্মাণি ঘটান। 'চাঁদ সদাগর' কবিতায় মনসা-পুরাণের স্বর্পাকীর্ণ চম্পক-নগরের প্রতিরূপকে কবি ৭৫' পরবর্তী বাংলার নৈরাজ্য-পীড়িত জনপদের চিত্র অঙ্কন করেন।

আশির দশকে বাংলাদেশে স্বৈরাচার-বিরোধী আন্দোলনে উত্তাল জনতার সাথে সমস্বরিক হয়ে ওঠে শামসুর রাহমানের কবিতা। আবারো তাঁর কবিতা অবচেতন বিমূর্ততা ও মিথ-প্রতীক থেকে শব্দ-ভাষার প্রত্যক্ষতা অবলম্বন করে। স্বৈরাচারী শোষণ ও নানা অসঙ্গতির বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-

Dhaka University Institutional Repository

আয়রনির প্রত্যক্ষ আয়ুধে ঝলসিত হয়ে ওঠে তাঁর কবিতা। এটি একাধিকবার চিহ্নিত যে, মতাদর্শগত কোনো দায়বদ্ধতা না থাকা সত্ত্বেও, যে কোনো দৈশিক রাজনৈতিক বিপন্নতায় শামসুর রাহমানের কবিতার নান্দনিকতার চেয়ে প্রয়োজন মুখ্য হয়ে ওঠে। কিন্তু একজন সৎ, শব্দকুশলী, পরিশ্রমী কবি স্বভাবতই যেমন আঙ্গিকনিষ্ঠ হয়ে থাকেন, শামসুর রাহমানও তাঁর দায়বদ্ধ চেতনাজাত কবিতাগুলোতে তেমনি অল্পাধিক শিল্প-সচেতন। ৯০' এর স্বৈরাচার পতন পর্যন্ত লেখা কবিতাগুলোতে উষ্মা, শ্লেষ, ব্যঙ্গ, প্রতিবাদে অবিরল শব্দের তীরে কবি বিদ্ধ করেছেন গণতন্ত্রবিরোধী স্বেচ্ছাচারী সরকারের শোষণ-নিপীড়ন-অন্যায়ের নানা দিকগুলো। শামসুর রাহমান দৈশিক সংকটে যেমন তাঁর অন্তর্জগতের খিল খুলে বেরিয়ে আসেন রাজপথে, তেমনি, বারবার স্বাধীন স্বদেশে স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণায় নিজেই নির্বাসিত হন অন্তর্জগতের বাস্তব-অধিবাস্তব পরালোকে। সেই সূত্রে রাহমানের কবিতার নান্দনিকতার রূপান্তর ঘটে বারবার।

৯০' এর দশক থেকে ২০০৬ সালে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত লেখা কাব্যগুলোতে বহির্বাস্তবতা ও অন্তর্বাস্তবতা, আশা ও নিরাশাকে বিপ্রতীপভাবে এক ভিন্নতর নান্দনিকতায় রূপান্বিত করেন শামসুর রাহমান। এ পর্যায়ে দৈশিক সংকটের নানা অভিঘাতে কবির অন্তর্বাস্তবতায় রূপান্তরিত হয়ে নতুন দৃশ্যকল্পে, নানা সম্প্রকাশ স্বভাবে, বিমূর্ততায়, বস্তুজগতের বাস্তবাতীত রূপান্তরকৌশলে, ভাষার রূপকায়ণে মিশ্র নান্দনিকতায় প্রকাশ পায়। এখানে মাঝে-মাঝেই কবির চেতনা-জগৎ অবচেতনার আশ্রয়ে রূপান্তরিত হয় এক অলীক, কাল্পনিক দৃশ্য জগতে, যার মধ্যে বিভিন্ন অনুপাতে মিশে থাকে কবির সমকালীন বাস্তবতার রূঢ় অভিঘাত। এই রূপান্তরধর্মিতার কৌশল শামসুর রাহমানের শেষ পর্যায়ের কাব্যে যেমন নতুন নান্দনিকতার আস্বাদ যোগায়, তেমনি খুন-ধর্ষণ-মৌলবাদে আবিল, বাংলার 'কৃষ্ণপক্ষ'কে 'পূর্ণিমা'র দিকে নিয়ে যেতে—'অন্ধকার' থেকে আলোক অভিসারী দেখতে চাওয়ার আমরণ বাসনা প্রকাশ করে গেছেন কবি তাঁর শব্দ-চিত্রে।

দেশ-কাল সচেতন, কবিতার বৈশ্বিক নান্দনিকতায় অভিযোজিত, প্রতিনিয়ত শিল্প-সন্ধিৎসু, স্বয়ম্প্রকাশে আত্মবিশ্বাসী কবি শামসুর রাহমান বাংলাদেশের কবিতার নান্দনিক আত্মতা প্রতিষ্ঠায় ও তার উৎকর্ষ সাধনে অন্যতম রূপকার—অনুজ কবিদের পথিকৃৎরূপে স্বীকৃত। কালান্তরের বাংলা কবিতায় তাঁর কবিকৃতির ইতিহাস কালপুরুষের মর্যাদায় চির-অনির্বাণ হয়ে থাকার প্রত্যাশা রাখে।

Dhaka University Institutional Repository

শামসুর রাহমানের জীবনপঞ্জি

১৯২৯ : পুরনো ঢাকায় মাতামহের বাড়ি ৪৬ নম্বর মাহুতটুলীতে ১৯২৯ সালের ২৩ অক্টোবর পূর্বাহ্নে বেলা দশটায় জন্মগ্রহণ করেন কবি শামসুর রাহমান। বাবা প্রয়াত মোখলেসুর রাহমান চৌধুরী, মা, আমেনা বেগম। পৈতৃক বাড়ি নরসিংদী জেলার রায়পুরায়, পাড়াতলী গ্রামে। ১৩ ভাইবোনের মধ্যে তিনি পিতা-মাতার চতুর্থ সন্তান।

১৯৩৬ : ৭ বছর বয়সে পুরনো ঢাকার ঐতিহ্যবাহী পোগজ হাই ইংলিশ স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণিতে ভর্তি হন।

১৯৪৫ : পোগজ স্কুল থেকেই প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

১৯৪৭ : ঢাকা ইন্টামিডিয়েট কলেজ থেকে আই.এ. পাশ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি বিভাগে অনার্স কোর্সে ভর্তি হন। তিন বছর অনার্স পড়েও শেষ পর্যন্ত পরীক্ষা না দেয়ায় পড়াশোনায় সাময়িক ছেদ ঘটে।

১৯৪৮ : নলিনীকিশোর গুহ সম্পাদিত সোনার বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয় প্রথম কবিতা 'ঊনিশ শ ঊনপঞ্চাশ'।

১৯৫০ : আশরাফ সিদ্দিকী ও আবদুর রশীদ খান সম্পাদিত *নতুন কবিতা* সংকলনগ্রন্থে শামসুর রাহমানের কবিতা অন্তর্ভুক্ত হয়। হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত *দাঙ্গাবিরোধী পাঁচটি গল্প* সংকলন প্রকাশে সহযোগিতা করেন।

১৯৫৩ : পাশ কোর্সে বি.এ তে উত্তীর্ণ হয়ে ইংরেজি নিয়ে এম.এ. তে ভর্তি হন।

১৯৫৪ : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.এ. প্রিলিমিনারিতে ভর্তি হন।

১৯৫৫ : এম.এ. শেষ পর্বে পড়ার সময়ে বিয়ে বাড়িতে জেহ্‌রা বেগমকে দেখে মুগ্ধ হয়ে কবি ঐ বছর জুলাই মাসে তাকে বিয়ে করেন। কিন্তু শেষ পর্বে আবারো পরীক্ষা না দেয়ায় তাঁর এম.এ. আর সম্পন্ন হয়নি। শামসুর রাহমানের শিক্ষাজীবন শেষ পর্যন্ত অসমাপ্তই রয়ে যায়।

১৯৫৬ : কন্যা সুমায়রা রাহমানের জন্ম

১৯৫৭ : দৈনিক *মর্নিং নিউজ* পত্রিকায় সহ-সম্পাদক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। একই সঙ্গে রেডিও পাকিস্তানে অনুষ্ঠান প্রযোজক হিসেবে যোগদান করেন এবং ২ বছর পর্যন্ত সে দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৫৮ : পুত্র ফাইয়াজ রাহমানের জন্ম

১৯৫৯ : দ্বিতীয় কন্যা ফাওজিয়া সাবেরিনের জন্ম।

১৯৬০ : দ্বিতীয় পুত্র ওয়াহিদুর রাহমান মতিনের জন্ম। প্রথম কাব্যগ্রন্থ *প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে*

Dhaka University Institutional Repository

প্রকাশিত।

১৯৬২ : কবিতা রচনার জন্য 'আদমজী সাহিত্য পুরস্কার' লাভ।

১৯৬৩ : দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ *রৌদ্র করোটিতে* প্রকাশিত।

১৯৬৪ : জানুয়ারি মাসে ঢাকায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাবিরোধী মিছিলে যোগদান করেন। নভেম্বর মাসে *দৈনিক পাকিস্তান*, যে পত্রিকাটি বর্তমানে দৈনিক বাংলারূপে পরিচিত, এর সহকারী সম্পাদক হিসেবে যোগদান করেন।

১৯৬৯ : কবিতার জন্য বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার লাভ করেন।

১৯৭১ : দেশে স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হলে কবি এপ্রিল মাসে ঢাকা ছেড়ে চলে যান নরসিংদীর পাড়াতলীতে, নিজ গ্রামে। সেখানে তিনি রচনা করেন 'স্বাধীনতা তুমি' ও 'তোমাকে পাওয়ার জন্য হে স্বাধীনতা' শিরোনামের কালজয়ী কবিতা দু'টি। 'মজলুম আদিব' (নির্যাতিত লেখক) ছদ্মনামে কবির এই কবিতা দু'টি 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। মে মাসে কবি ঢাকায় ফিরে আসেন এবং *দৈনিক পাকিস্তানে* পুনরায় যোগদান করেন।

১৯৭২ : *বন্দী শিবির থেকে* কাব্যটি প্রকাশিত হয় কলকাতার অরুণা প্রকাশনী থেকে।

১৯৭৬ : *আমি অনাহারী* কাব্যগ্রন্থ ও *শামসুর রাহমানের শ্রেষ্ঠ কবিতা* প্রকাশিত।

১৯৭৭ : তেরো বছর কাজ করার পর ১৯৭৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কবি 'দৈনিক বাংলা'র সম্পাদকরূপে নিযুক্ত হন। পাশাপাশি সাপ্তাহিক 'বিচিত্রা'র সম্পাদনার দায়িত্বও নেন। এ বছরই কবি 'একুশে পদক' অর্জন করেন।

১৯৭৯ : দ্বিতীয় পুত্র ওয়াহিদুর রাহমান মতিনের মৃত্যু।

১৯৭৯ : কবির স্মৃতিচারনমূলক গ্রন্থ *স্মৃতির শহর* প্রকাশিত। বাংলা একাডেমী প্রাঙ্গনে কবির পঞ্চাশ বছর পূর্তি অনুষ্ঠান

১৯৮১ : কবিতার জন্য 'আবুল মনসুর আহমদ সাহিত্য পুরস্কার', 'মওলানা ভাসানী পুরস্কার' ও 'মোহম্মদ নাসিরউদ্দীন স্বর্ণপদক' প্রাপ্তি।

১৯৮২ : *ইকারুসের আকাশ* ও *মাতাল ঋত্বিক* কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত।্জাপানের 'মিতসুবিসি পুরস্কার' লাভ।

১৯৮৩ : *উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ*, *কবিতার সঙ্গে গেরস্থালি*, *নায়কের ছায়া* কাব্যগ্রন্থ এবং *অক্টোপাস* উপন্যাস গ্রন্থ প্রকাশিত। ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল ফর কালচারাল রিলেসন্স-এর আমন্ত্রণে ভারতভ্রমণ।

১৯৮৫ : *হাসান হাফিজুর রহমানের অপ্রকাশিত কবিতা* সম্পাদনা।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৮৬ : *আমৃত্যু তাঁর জীবনানন্দ* প্রবন্ধগ্রন্থ প্রকাশিত।

১৯৮৭ : সামরিক সরকারের শাসনামলে প্রতিবাদস্বরূপ 'দৈনিক বাংলা থেকে স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেন। মাসিক সাহিত্য পত্রিকা 'অধুনা'র সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। স্বৈরাচারী এরশাদের এশীয় কবিতা উৎসবের বিরুদ্ধে 'শৃঙ্খল মুক্তির জন্য কবিতা' স্লোগান নিয়ে 'জাতীয় কবিতা উৎসব' আয়োজনে নেতৃত্ব দেন। 'জাতীয় কবিতা উৎসব' আয়োজনে নেতৃত্ব দেন। 'জাতীয় কবিতা পরিষদ' গঠিত হলে তিনি এর প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯০ সাল পর্যন্ত এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

১৯৮৮ : *মঞ্চের মাঝখানে*, *বুক তার বাংলাদেশের হৃদয়* ও *শামসুর রাহমানের রাজনৈতিক কবিতা* প্রকাশিত।

১৯৮৯ : 'কবি শামসুর রাহমানের ষাট বছর পূর্তি উদযাপন পরিষদ' এর উদ্যোগে কবিকে শ্রদ্ধাঞ্জলি ও সম্মাননা জ্ঞাপন।

১৯৯১ : কবিতার জন্য স্বাধীনতা পুরস্কার লাভ।

১৯৯২ : *খণ্ডিত গৌরব* ও *ধ্বংসের কিনারে বসে* কবিতাগ্রন্থ প্রকাশিত। কলকাতা থেকে 'আনন্দ পুরস্কার' লাভ।

১৯৯৩ : ভারতের হলদিয়া কবিতা উৎসবে অংশগ্রহণ।

১৯৯৬ : বাংলা একাডেমীর সভাপতি নিযুক্ত। ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানসূচকডিলিট উপাধি লাভ।

২০০০ : বাংলাদেশ রাইটার্স ক্লাব থেকে 'কবিশ্রেষ্ঠ' উপাধি লাভ।

২০০১ : *হৃদপদ্মে জোৎস্না দোলে* কাব্যগ্রন্থ, *শামসুর রাহমানের প্রবন্ধ* এবং *একান্ত ভাবনা* শিরোনামে কলামগ্রন্থ প্রকাশিত।

২০০৪ : জীবনস্মৃতি *কালের ধুলোয় লেখা* প্রকাশিত।

২০০৬ : শেষ দু'টি কাব্যগ্রন্থ *অন্ধকার থেকে আলোয়* এবং *না বাস্তব না দুঃস্বপ্ন* প্রকাশিত হয়। কলামগ্রন্থ *শেষ কবে হবে কৃষ্ণপক্ষ* প্রকাশিত হয়। দৈনিক 'আমাদের সময়' সম্মাননা লাভ। 'দি সার্ক পোয়েট' সম্মাননা অর্জন। ১৭ মার্চ দিল্লির হ্যাবিট্যাট সেন্টারের স্টেইন অডিটোরিয়ামে নোবেলবিজয়ী অমর্ত্য সেনের হাত থেকে দক্ষিণ এশিয়ার শ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে 'The Little Magazine SALAM' পুরস্কার গ্রহণ করেন। ১৭ আগস্ট বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬টা ৩৫ মিনিটে ঢাকায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে চিকিৎসারত অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর ইচ্ছে অনুযায়ী ঢাকায় বনানী কবরস্থানে, তাঁর মায়ের কবরের পাশে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

শামসুর রাহমানের গ্রন্থপঞ্জি

কাব্যগ্রন্থসমূহঃ

১. *প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে*, প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ১৯৬০, প্রকাশক: বার্ডস এ্যাণ্ড বুকস, ঢাকা, প্রচ্ছদ: কাইয়ুম চৌধুরী

২. *রৌদ্র করোটিতে*, প্রথম প্রকাশ: জুলাই ১৯৬৩, প্রকাশক: পূর্ব পাকিস্তান লেখক সংঘ, প্রচ্ছদ: কাইয়ুম চৌধুরী

৩. *বিধ্বস্ত নীলিমা*, প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ১৯৬৭, প্রকাশক: বইপত্র, চট্টগ্রাম, প্রচ্ছদ: কাইয়ুম চৌধুরী

৪. *নিরালোকে দিব্যরথে*, প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ১৯৬৮, প্রকাশক: নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, প্রচ্ছদ: কাইয়ুম চৌধুরী

৫. *নিজ বাসভূমে*, প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ১৯৭০, প্রকাশক: মাহতাবুননেসা, ঢাকা, প্রচ্ছদ: মুর্তজা বশীর

৬. *বন্দী শিবির থেকে*, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ১৯৭২, প্রকাশক: অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা, প্রচ্ছদ: পূর্ণেন্দু পত্রী

৭. *দুঃসময়ের মুখোমুখি*, প্রথম প্রকাশ: জুলাই ১৯৭৩, প্রকাশক: অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা, প্রচ্ছদ: পূর্ণেন্দু পত্রী

৮. *ফিরিয়ে নাও ঘাতক কাঁটা*, প্রথম প্রকাশ: এপ্রিল ১৯৭৪, প্রকাশক: বইঘর, চট্টগ্রাম, প্রচ্ছদ: কাইয়ুম চৌধুরী

৯. *আদিগন্ত নগ্ন পদধ্বনি*, প্রথম প্রকাশ: নভেম্বর ১৯৭৪, প্রকাশক: সন্ধানী প্রকাশনী, ঢাকা, প্রচ্ছদ: কাইয়ুম চৌধুরী

১০. *এক ধরনের অহংকার*, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ১৯৭৫, প্রকাশক: বইঘর, চট্টগ্রাম, প্রচ্ছদ: কাইয়ুম চৌধুরী

১১. *আমি অনাহারী*, প্রথম প্রকাশ: ১৯৭৫, প্রকাশক: বইঘর, চট্টগ্রাম, প্রচ্ছদ: কাইয়ুম চৌধুরী

১২. *শূন্যতায় তুমি শোকসভা*, প্রথম প্রকাশ: এপ্রিল ১৯৭৭, প্রকাশক: সন্ধানী প্রকাশনী, ঢাকা, প্রচ্ছদ: কাইয়ুম চৌধুরী

১৩. *বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে*, প্রথম প্রকাশ: এপ্রিল ১৯৭৭, প্রকাশক: সন্ধানী প্রকাশনী, ঢাকা, প্রচ্ছদ:

১৪. *শিরোনাম মনে পড়ে না*, প্রথম প্রকাশ: এপ্রিল ১৯৭৭, প্রকাশক: সন্ধানী প্রকাশনী, ঢাকা, প্রচ্ছদ: কাইয়ুম চৌধুরী কাইয়ুম চৌধুরী

১৫. *প্রতিদিন ঘরহীন ঘরে*, প্রথম প্রকাশ: জুলাই ১৯৭৮, প্রকাশক: সন্ধানী প্রকাশনী, ঢাকা, প্রচ্ছদ: কাইয়ুম চৌধুরী

১৬. *ইকারুসের আকাশ*, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ১৯৮২, প্রকাশক: সব্যসাচী, ঢাকা, প্রচ্ছদ: সৈয়দ হক

১৭. *উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ*, প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ১৯৮২, প্রকাশক: সন্ধানী প্রকাশনী, ঢাকা, প্রচ্ছদ: কাইয়ুম চৌধুরী

১৮. *মাতাল ঋত্বিক*, প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ১৯৮২, প্রকাশক: সন্ধানী প্রকাশনী, ঢাকা, প্রচ্ছদ: কাইয়ুম চৌধুরী

Dhaka University Institutional Repository

১৯. *কবিতার সঙ্গে গেরস্থালি*, প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ১৯৮৩, প্রকাশক: সন্ধানী প্রকাশনী, ঢাকা, প্রচ্ছদ: কাইয়ুম চৌধুরী

২০. *নায়কের ছায়া*, প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ১৯৮৩, প্রকাশক: ডানা প্রকাশনী, ঢাকা, প্রচ্ছদ: কাজী হাসান হাবীব

২১. *আমার কোনো তাড়া নেই*, প্রথম প্রকাশ: আগস্ট ১৯৮৪, প্রকাশক: গ্লোব লাইব্রেরি প্রা.লি., ঢাকা, প্রচ্ছদ: সৈয়দ ইকবাল

২২. *যে অন্ধ সুন্দরী কাঁদে*, প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪, প্রকাশক: বিউটি বুক হাউস, ঢাকা, প্রচ্ছদ: কাইয়ুম চৌধুরী

২৩. *অস্ত্রে আমার বিশ্বাস নেই*, প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫, প্রকাশক: বিউটি বুক হাউস, ঢাকা, প্রচ্ছদ: কাইয়ুম চৌধুরী

২৪. *হোমারের স্বপ্নময় হাত*, প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫, প্রকাশক: বইঘর, চট্টগ্রাম, প্রচ্ছদ: কাইয়ুম চৌধুরী

২৫. *ইচ্ছে হয় একটু দাঁড়াই*, প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫, প্রকাশক: অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা, প্রচ্ছদ: কাইয়ুম চৌধুরী

২৬. *ধূলায় গড়ায় শিরস্ত্রাণ*, প্রথম প্রকাশ: নভেম্বর ১৯৮৫, প্রকাশক: বিউটি বুক হাউস, ঢাকা, প্রচ্ছদ: কাইয়ুম চৌধুরী

২৭. *এক ফোঁটা কেমন অনল*, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ১৯৮৬, প্রকাশক: : বিউটি বুক হাউস, ঢাকা, প্রচ্ছদ: কাইয়ুম চৌধুরী

২৮. *টেবিলে আপেলগুলো হেসে ওঠে*, প্রথম প্রকাশ: মে ১৯৮৬, প্রকাশক: নবার্ক, কলকাতা, প্রচ্ছদ: অপরূপ উকিল

২৯. *দেশদ্রোহী হতে ইচ্ছে করে*, প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ১৯৮৬, প্রকাশক: বিউটি বুক হাউস ঢাকা, প্রচ্ছদ: কাজী হাসান হাবীব

৩০. *অবিরল জলভ্রমি*, প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ১৯৮৬, প্রকাশক: অনিন্দ্য প্রকাশনী, ঢাকা, প্রচ্ছদ: খালিদ আহসান

৩১. *আমরা ক'জন সঙ্গী*, প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ১৯৮৬, প্রকাশক: নিখিল প্রকাশন, ঢাকা, প্রচ্ছদ: কাজী হাসান হাবীব

৩২. *ঝর্না আমার আঙুলে*, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ১৯৮৭, প্রকাশক: নবার্ক, কলকাতা, প্রচ্ছদ: অপরূপ উকিল

৩৩. *স্বপ্নেরা ডুকরে ওঠে বারবার*, প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭, প্রকাশক: বিউটি বুক হাউস, ঢাকা, প্রচ্ছদ: কাইয়ুম চৌধুরী

৩৪. *খুব বেশি ভালো থাকতে নেই*, প্রথম প্রকাশ: সেপ্টেম্বর ১৯৮৭, প্রকাশক: পল্লব পাবলিশার্স, ঢাকা, প্রচ্ছদ: ওয়াহিদুল কাফিল

৩৫. *মঞ্চের মাঝখানে*, প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ১৯৮৮, প্রকাশক: পল্লব পাবলিশার্স, ঢাকা, প্রচ্ছদ: কাইয়ুম চৌধুরী

৩৬. *বুক তার বাংলাদেশের হৃদয়*, প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ১৯৮৮, প্রকাশক: বিউটি বুক হাউস, ঢাকা, প্রচ্ছদ: কাইয়ুম চৌধুরী

৩৭. *এসো কোকিল এসো স্বর্ণচাঁপা*, প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ১৯৮৮, প্রকাশক: বিউটি বুক হাউস, ঢাকা, প্রচ্ছদ: ধ্রুব এষ

Dhaka University Institutional Repository

৩৮. *হৃদয়ে আমার পৃথিবীর আলো*, প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ১৯৮৯, প্রকাশক: বিউটি বুক হাউস, ঢাকা, প্রচ্ছদ: কাইয়ুম চৌধুরী

৩৯. *সে এক পরবাসে*, প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ১৯৯০, প্রকাশক: বিউটি বুক হাউজ, ঢাকা, প্রচ্ছদ: কাইয়ুম চৌধুরী

৪০. *গৃহযুদ্ধের আগে*, প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ১৯৯০, প্রকাশক: বিউটি বুক হাউস, ঢাকা, প্রচ্ছদ: কাইয়ুম চৌধুরী

৪১. *খণ্ডিত গৌরব*, প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ১৯৯১, প্রকাশক: বিউটি বুক হাউস, ঢাকা, প্রচ্ছদ: কাইয়ুম চৌধুরী

৪২. *ধ্বংসের কিনারে বসে*, প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ১৯৯২, প্রকাশক: বিউটি বুক হাউস, ঢাকা, প্রচ্ছদ: সমর মজুমদার

৪৩. *হরিণের হাড়*, প্রথম প্রকাশ: বইমেলা ১৯৯৩, প্রকাশক: আনন্দ পাবলিশার্স প্রা.লি. কলকাতা প্রচ্ছদ: অশোক ভৌমিক

৪৪. *আকাশ আসবে নেমে*, প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪, প্রকাশক: বিউটি বুক হাউস, ঢাকা, প্রচ্ছদ: কাইয়ুম চৌধুরী

৪৫. *উজাড় বাগানে*, প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫, প্রকাশক: বিউটি বুক হাউস, ঢাকা, প্রচ্ছদ: ধ্রুব এষ

৪৬. *মানব হৃদয় নৈবেদ্য সাজাই*, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ১৯৯৬, প্রকাশক: সন্ধানী, ঢাকা, প্রচ্ছদ: কাইয়ুম চৌধুরী

৪৭. *তুমিই নিঃশ্বাস তুমিই হৃদস্পন্দন*, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ১৯৯৬, প্রকাশক: র‍্যামন পাবলিশার্স, ঢাকা, প্রচ্ছদ: ধ্রুব এষ

৪৮. *তোমাকেই ডেকে ডেকে রক্তচক্ষু কোকিল হয়েছি*, প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭, প্রকাশক: বিউটি বুক হাউস, ঢাকা, প্রচ্ছদ: ধ্রুব এষ

৪৯. *হেমন্ত সন্ধ্যায় কিছুকাল*, প্রথম প্রকাশ: বইমেলা, ১৯৯৭, প্রকাশক: বিউটি বুক হাউস, ঢাকা, প্রচ্ছদ: ধ্রুব এষ

৫০. *ছায়াগণের সঙ্গে কিছুক্ষণ*, প্রথম প্রকাশ: বইমেলা ১৯৯৭। প্রকাশক: বিউটি বুক হাউস ঢাকা, প্রচ্ছদ: ধ্রুব এষ

৫১. *মেঘলোকে মনোজ নিবাস*, প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮, প্রকাশক: বিউটি বুক হাউস, ঢাকা, প্রচ্ছদ: কাইয়ুম চৌধুরী

৫২. *সৌন্দর্য আমার ঘরে*, প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮, প্রকাশক: বিউটি বুক হাউস, ঢাকা

৫৩. *রূপের প্রবালে দগ্ধ সন্ধ্যারাত*, প্রথম প্রকাশ: বইমেলা১৯৯৯, প্রকাশক: বিউটি বুক হাউস, ঢাকা

৫৪. *টুকরো কিছু সংলাপের সাঁকো*, প্রথম প্রকাশ: বইমেলা ১৯৯৯, প্রকাশক: বিউটি বুক হাউস, ঢাকা

৫৫. *স্বপ্ন ও দুঃস্বপ্নে বেঁচে আছি*, প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ২০০০, প্রকাশক: বিউটি বুক হাউস, ঢাকা

৫৬. *নক্ষত্র বাজাতে বাজাতে*, প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ২০০০, প্রকাশক: বিউটি বুক হাউস, ঢাকা

৫৭. *শুনি হৃদয়ের ধ্বনি*, প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ২০০১, প্রকাশক: বিউটি বুক হাউস, ঢাকা

৫৮. *হৃদপদ্মে জোৎস্না দোলে*, প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ২০০১, প্রকাশক: বিউটি বুক হাউস, ঢাকা

৫৯. *ভস্মস্তূপে গোলাপের হাসি*, প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ২০০০২, প্রকাশক: বিউটি বুক হাউস, ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

৬০. *ভাঙাচোরা চাঁদমুখ কালো করে ধুঁকছে*, প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ২০০৩, প্রকাশক: ঐতিহ্য প্রকাশনী, ঢাকা

৬১. *গন্তব্য নাই বা থাকুক*, প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ২০০৪, প্রকাশক: ঐতিহ্য প্রকাশনী, ঢাকা

৬২. *কৃষ্ণপক্ষে পূর্ণিমার দিকে*, প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ২০০৪, প্রকাশক: ঐতিহ্য প্রকাশনী, ঢাকা

৬৩. *গোরস্থানে কোকিলের করুণ আহ্বান*, প্রথম প্রকাশ: বইমেলা ২০০৫, প্রকাশক: অন্য প্রকাশ, ঢাকা

৬৪. *না বাস্তব না দুঃস্বপ্ন*, প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ২০০৬, প্রকাশক: ঐতিহ্য প্রকাশনী, ঢাকা

৬৫. *অন্ধকার থেকে আলোয়*, প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ২০০৬, প্রকাশক: ঐতিহ্য প্রকাশনী, ঢাকা

উপন্যাসঃ

১. *অক্টোপাস*, প্রথম প্রকাশ: আগস্ট ১৯৮৩, প্রকাশক: বিউটি বুক হাউস, ঢাকা, প্রচ্ছদ: কাজী হাসান হাবীব

২. *নিয়ত মস্তাজ*, প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫, প্রকাশক: অনিন্দ্য প্রকাশন, ঢাকা, প্রচ্ছদ: খালিদ আহসান

৩. *অদ্ভুত আঁধার এক*, প্রথম প্রকাশ: আগস্ট ১৯৮৫, প্রকাশক: সুরভি প্রকাশনী, ঢাকা, প্রচ্ছদ: খালিদ আহসান

৪. *এলো সে অবেলায়*, প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪, প্রকাশক: দিব্য প্রকাশ, ঢাকা, প্রচ্ছদ: সমর মজুমদার

গল্পঃ

১. *শামসুর রাহমানের গল্প* (ছোটগল্প সংকলন), প্রথম প্রকাশ: ২০০২, প্রকাশক: স্বর-ব্যঞ্জন, শাহবাগ, ঢাকা

প্রবন্ধঃ

১. *আমৃত্যু তার জীবনানন্দ* (সাহিত্য-বিষয়ক প্রবন্ধ সংকলন), প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ১৯৮৬, প্রকাশক: বইঘর, চট্টগ্রাম, প্রচ্ছদ: কাইয়ুম চৌধুরী

২. *শামসুর রাহমানের প্রবন্ধ*, প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ২০০২, প্রকাশক: শ্রাবণ, ঢাকা

৩. *কবিতা এক ধরনের আশ্রয়*, (প্রবন্ধ), প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ২০০২, প্রকাশক: সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা

শিশুতোষঃ

১. *এলাটিং বেলাটিং* (শিশু-কিশোর কবিতা-ছড়া), প্রথম প্রকাশ: ১৯৭৪, প্রকাশক: আদিল ব্রাদার্স এ্যাণ্ড কোম্পানী, ঢাকা, প্রচ্ছদ: কালাম মাহমুদ

২. *ধান ভানলে কুঁড়ো দেবো* (শিশু-কিশোর কবিতা-ছড়া), প্রথম প্রকাশ: জুন ১৯৭৭, প্রকাশক: বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রচ্ছদ: রফিকুন নবী

Dhaka University Institutional Repository

৩. *গোলাপ ফোটে খুকীর হাতে* (শিশু-কিশোর কবিতা-ছড়া), প্রথম প্রকাশ: নভেম্বর ১৯৭৭, প্রকাশক: শিশু একাডেমী, ঢাকা, প্রচ্ছদ: রফিকুন নবী

৪. *রংধনু সাঁকো* (শিশু-কিশোর কবিতা-ছড়া), প্রথম প্রকাশ: বইমেলা ১৯৯৪, প্রকাশক: প্রকৃতজন, ঢাকা, প্রচ্ছদ: খান মঞ্জুরুল ইসলাম

৫. *লাল ফুলকির ছড়া*, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ১৯৯৫, প্রকাশক: প্রতিক্ষণ প্রা.লি. কলকাতা, প্রচ্ছদ: আবুল মনসুর

৬. *নয়নার জন্য* (ছড়া), প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭, প্রকাশক: বাংলাদেশ শিশু একাডেমী, ঢাকা, প্রচ্ছদ: ধ্রুব এষ

৭. *তারার দোলনায় দীপিতা* (ছড়া), প্রথম প্রকাশ: জুন ২০০৩, প্রকাশক: ঐতিহ্য প্রকাশনী, ঢাকা

৮. *আমের কুঁড়ি জামের কুঁড়ি* (ছড়া), প্রথম প্রকাশ: জুন ২০০৪, প্রকাশক: অন্যপ্রকাশ, ঢাকা

৯. *ইচ্ছে হলো যাই ছুটে যাই*, প্রথম প্রকাশ: ২০০৪, প্রকাশক: পাঠশালা, শাহবাগ, ঢাকা

১০. *ছড়া সমগ্র* (ছড়া), প্রথম প্রকাশ: ২৩ অক্টোবর, ১৯৯৮, প্রকাশক: জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা

অনুবাদ:

১. *ফ্রস্টের কবিতা* (অনুবাদ), প্রথম প্রকাশ: নভেম্বর ১৯৬৫, প্রকাশক: সাহিত্যিকা, ঢাকা, প্রচ্ছদ: আব্দুর রউফ

২. *মার্কোমিলিয়ানস* (অনুবাদ), মূল: ইউজিন ও নিল, প্রথম প্রকাশ: জুলাই ১৯৬৭, প্রকাশক: পিপলস পাবলিকেশন্স, চট্টগ্রাম

৩. *রবার্ট ফ্রস্টের নির্বাচিত কবিতা* (অনুবাদ), প্রথম প্রকাশ: অক্টোবর ১৯৬৮, প্রকাশক: খোশরোজ কিতাব মহল, ঢাকা, প্রচ্ছদ: আমিনুল হাকিম

৪. খাজা ফরিদের কবিতা (অনুবাদ), প্রথম প্রকাশ: জুন ১৯৬৯, প্রকাশক: নাজমে সাফাকাত, মুলতান, প্রচ্ছদ: কাইয়ুম চৌধুরী

৫. *হৃদয়ে ঋতু* (অনুবাদ, মূল: টেনেসি উইলিয়ামস্), প্রথম প্রকাশ: ১৯৭১ বা তৎপূর্ববর্তীকাল, প্রকাশক: কালাম মাহমুদ

৬. *হ্যামলেট, ডেনমার্কের যুবরাজ* (শেকস্পিয়রের অনুবাদ), প্রথম প্রকাশ: আগস্ট ১৯৯৫, প্রকাশক: বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রচ্ছদ: কাইয়ুম চৌধুরী

স্মৃতিকথা:

১. *স্মৃতির শহর* (কিশোরপাঠ্য স্মৃতিচারণমূলক রচনা), প্রথম প্রকাশ: অক্টোবর ১৯৭৯, প্রকাশক: শিশু সাহিত্য বিতান, চট্টগ্রাম, প্রচ্ছদ: কাইয়ুম চৌধুরী

২. *কালের ধুলোয় লেখা* (স্মৃতিকথা), প্রথম প্রকাশ: বইমেলা ২০০৪, প্রকাশক: অন্যপ্রকাশ, ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

সম্পাদনা:

১. *দুই বাংলার ভালবাসার কবিতা* (সম্পাদিত সংকলন, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে), প্রথম প্রকাশ: বইমেলা ১৯৮৮, প্রকাশক: মডেল পাবলিশিং হাউস, কলকাতা, প্রচ্ছদ: পূর্ণেন্দু পত্রী

২. *দুই বাংলার বিরহের কবিতা* (সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে যৌথ সম্পাদনা), প্রথম প্রকাশ: বইমেলা ১৯৯৭, প্রকাশক: মডেল পাবলিশিং হাউস, কলকাতা

অন্যান্য সংকলন:

১. *শামসুর রাহমানের শ্রেষ্ঠ কবিতা* , প্রথম প্রকাশ: সেপ্টেম্বর ১৯৭৬, প্রকাশক: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, প্রচ্ছদ: কাইয়ুম চৌধুরী

২. *প্রেমের কবিতা* (সংকলন), প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ১৯৮১, প্রকাশক: আনন্দ, ঢাকা, প্রচ্ছদ: খালিদ আহসান

৩. *শামসুর রাহমানের শ্রেষ্ঠ কবিতা*, প্রথম প্রকাশ: মার্চ ১৯৮৫, প্রকাশক: দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রচ্ছদ: পুর্ণেন্দু পত্রী

৪. *হাসান হাফিজুর রহমানের অপ্রকাশিত কবিতা* (ভূমিকা), প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ১৯৮৬, প্রকাশক: বইঘর, চট্টগ্রাম, প্রচ্ছদ: কাইয়ুম চৌধুরী

৫. *শামসুর রাহমানের রাজনৈতিক কবিতা* (সংকলন), প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ১৯৮৮, প্রকাশক: সুবর্ণ, ঢাকা, প্রচ্ছদ: কাইয়ুম চৌধুরী

৬. *স্বনির্বাচিত প্রেমের কবিতা* (সংকলন), প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ১৯৯৩, প্রকাশক: প্রমা প্রকাশনী, কলকাতা, প্রচ্ছদ: পূণ্যব্রত পত্রী

৭. *শামসুর রাহমানের প্রেমের কবিতা* (সংকলন), প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩, প্রকাশক: বিউটি বুক হাউস, ঢাকা, প্রচ্ছদ: কাইয়ুম চৌধুরী

৮. *নির্বাচিত ছড়া ও কবিতা*, প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬, প্রকাশক: সুবর্ণ, ঢাকা, প্রচ্ছদ: রফিকুন নবী

৯. *Selected Political Poems* (Collection), Translator : Sagar Chowdhury, First Publication: Feb 1999, Publisher: Subarna, Dhaka

১০. *উপন্যাস সমগ্র*, প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ২০০০, প্রকাশক: দিব্যপ্রকাশ, ঢাকা

১১. *মুক্তিযুদ্ধের কবিতা*, প্রথম প্রকাশ: ২০০০, প্রকাশক: সন্ধানী প্রকাশনী, ঢাকা, প্রচ্ছদ: কাইয়ুম চৌধুরী

১২. *কাব্যসম্ভার*, প্রথম প্রকাশ: জুন ২০০২, প্রকাশক: বিউটি বুক হাউস, ঢাকা

১৩. *সেরা শামসুর রাহমান* (সংকলন), প্রথম প্রকাশ: অক্টোবর ২০০৪, প্রকাশক: সময় প্রকাশন, ঢাকা

১৪. *নির্বাচিত ১০০ কবিতা* (সংকলন), প্রথম প্রকাশ: একুশের বইমেলা, ২০০৫, প্রকাশক: অন্য প্রকাশ, ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জিঃ

প্রাথমিক উৎসঃ

শামসুর রাহমান রচনাবলী-১, প্রথম সংস্করণ, ২০০৪, ঐতিহ্য প্রকাশনী, ঢাকা

শামসুর রাহমান রচনাবলী-২, প্রথম সংস্করণ, ২০০৬, ঐতিহ্য প্রকাশনী, ঢাকা

শামসুর রাহমান রচনাবলী-৩, প্রথম সংস্করণ, ২০১০, ঐতিহ্য প্রকাশনী, ঢাকা

কবিতা সমগ্র-১ শামসুর রাহমান, প্রথম সংস্করণ, ২০০৫, অনন্যা, ঢাকা

কবিতা সমগ্র-২ শামসুর রাহমান, প্রথম সংস্করণ, ২০০৬, অনন্যা, ঢাকা

কবিতা সমগ্র-৩ শামসুর রাহমান, তৃতীয় সংস্করণ, ২০১৩, অনন্যা, ঢাকা

কবিতা সমগ্র-৪ শামসুর রাহমান, প্রথম সংস্করণ, ২০০৭, অনন্যা, ঢাকা

দ্বৈতীয়িক উৎসঃ

অতুলচন্দ্র গুপ্ত (২০০২), *কাব্যজিজ্ঞাসা*, প্রথম সংস্করণ, বর্ণ বিচিত্রা, ঢাকা

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯৬২), *বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী*, রূপা সংস্করণ, কলকাতা

অরুন মিত্র

ক. (১৯৮৫), *পল এলুয়ারের কবিতা*, [অনুবাদ], প্রথম প্রকাশ, সারস্বত লাইব্রেরী, কলকাতা

খ. (১৯৯৯), *কবিতা : আমি ও আমরা* প্রথম প্রকাশ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

অরুণ সেন (১৯৮৫), *কবিতার দায় কবিতার মুক্তি*, প্রথম প্রকাশ, প্রতিক্ষণ পাবলিকেশনস, কলকাতা

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ও দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় [সম্পা.] (১৯৬৫) *আধুনিক কবিতার ইতিহাস*, প্রথম প্রকাশ, বাক্-সাহিত্য, কলকাতা

আকতার কামাল, বেগম

ক. (২০১৩) *কবির চেতনা : চেতনার কথকতা*, প্রথম প্রকাশ, ধ্রুবপদ, ঢাকা

খ. (২০১৪) *শামসুর রাহমানের কবিতা : অভিজ্ঞতা ও সংবেদ*, প্রথম প্রকাশ, কথাপ্রকাশ, ঢাকা

আনিসুজ্জামান ও অন্যান্য সম্পাদিত, (২০০৮), *শামসুর রাহমান স্মারক গ্রন্থ* , অন্যপ্রকাশ, ঢাকা।

আর্নস্ট ফিশার (২০০৯) *দি নেসেসিটি অব আর্ট*, [অনুবাদ: শফিকুল ইসলাম], দ্বিতীয় সংস্করণ, সংঘ প্রকাশন, ঢাকা

আবু হাসান শাহরিয়ার, (২০১১), *আমরা এক সঙ্গে হেঁটেছিলাম*, প্রথম প্রকাশ, ভাষাচিত্র, ঢাকা

আবুল কাশেম হায়দার [সম্পা.] (২০০৯), *স্বাধীনতার কবি শামসুর রাহমান*, প্রথম প্রকাশ, লেখালেখি, ঢাকা

আলী আহসান, সৈয়দ

ক. (১৯৮৫) *কবিতার রূপকল্প*, প্রথম সংস্করণ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

খ. (২০০৪) *শিল্পবোধ ও শিল্পচৈতন্য*, তৃতীয় সংস্করণ, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা

আশরাফ হোসেন, খোন্দকার

ক. (২০০৫) *বিশ্ব কবিতার সোনালি শস্য*, প্রথম প্রকাশ, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা

খ. (২০১০) *কবিতার অন্তর্যামী: আধুনিক উত্তরাধুনিক ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, প্রথম প্রকাশ, নান্দনিক, ঢাকা

গ. (২০১৩) *রোমান্টিক ও আধুনিক কবিতার অক্ষ-দ্রাঘিমা*, দ্বিতীয় প্রকাশ, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা

ঘ. (১৯৯৪) *বাংলাদেশের কবিতা : অন্তরঙ্গ অবলোকন*, প্রথম প্রকাশ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

ঙ. (২০০৪) *টেরি ঈগলটন : সাহিত্যতত্ত্ব* [অনুবাদ], নিউ এজ পাবলিকেশন, ঢাকা

আসাদুল্লাহ [সম্পা.] (২০০৯), *শামসুর রাহমান: অনন্য নক্ষত্র*, প্রথম প্রকাশ, ঘাস ফুল নদী, ঢাকা

আহমদ মাজহার, পিয়াস মজিদ [সম্পা.] (২০১১), *কবি কথন : শামসুর রাহমানের নির্বাচিত সাক্ষাৎকার*, প্রথম সংস্করণ, শুদ্ধস্বর, ঢাকা

কবির চৌধুরী (১৯৯৩), *শিলার ও অন্যান্য*, প্রথম প্রকাশ, বাংলা-জার্মান সম্প্রীতি, ঢাকা

কামাল আহমদ (২০১২), *শিল্পকলার ইতিহাস*, দ্বিতীয় পুনর্মুদ্রণ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

ক্রিস্টোফার কডওয়েল (১৯৮২), *ইলিউশ্যন অ্যান্ড রিঅ্যালিটি [বাস্তব ও বিভ্রম]*, [অনুবাদ. রণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়], প্রথম প্রকাশ, পপুলার লাইব্রেরী, কলকাতা

কুমার দীপ (২০১২) *নান্দনিক শামসুর রাহমান*, প্রথম প্রকাশ, শব্দকোষ, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা

চঞ্চলকুমার ব্রহ্ম (১৯৮৬) *কবিতা : উপভোগ ও মূল্যায়ন*, প্রথম প্রকাশ, নবার্ক, কলকাতা

জীবনানন্দ দাশ (২০০৬) *জীবনানন্দ-রচনাবলী*, তৃতীয় খণ্ড, প্রথম সংস্করণ, ঐতিহ্য, ঢাকা

জাহাঙ্গীর তারেক (১৯৮৮) *প্রতীকবাদী সাহিত্য*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

জে. আইজাক্স (২০০৪) *আধুনিক কবিতার পটভূমি*, [অনুবাদ. হুমায়ুন কবির], প্রথম দিব্যপ্রকাশ সংস্করণ, ঢাকা

জ্যোতি ভট্টাচার্য (১৯৯৬), *নন্দনতত্ত্ব ও মার্কসবাদ*, অগ্রণী বুক ক্লাব কলকাতা

ডক্টর এম. মতিউর রহমান (২০১৪) *সৌন্দর্য শিল্পকলা ও নন্দনতত্ত্ব*, ১ম খণ্ড, প্রথম প্রকাশ, অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা

ডঃ অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় (১৩৯২) *বাংলা সাহিত্যে সৌন্দর্যতত্ত্ব*, দে বুক স্টোর, কলকাতা

ডঃ ভানুভূষণ জানা (১৯৮৭) *রোম্যান্টিকতা ও বাঙলা কাব্যে রোম্যান্টিক ধারার বিবর্তন*, প্রথম প্রকাশ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা

ড. মাসুদুল হক (২০০৮) *বাংলাদেশের কবিতার নন্দনতত্ত্ব*, প্রথম সংস্করণ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

ড. মোহাম্মদ হান্নান (১৯৮৪) *বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস ১৮৩০-১৯৭১*, প্রথম সংস্করণ, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা

ড. সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত (২০০৮) *সৌন্দর্যতত্ত্ব*, চতুর্থ সংস্করণ, চিরায়ত প্রকাশন, কলকাতা

তরুণ মুখোপাধ্যায়

ক. (২০০৫) *কবি শামসুর রাহমান*, প্রথম প্রকাশ, এবং মুশায়েরা, কলকাতা

খ. (১৯৯৪) *নন্দনতত্ত্ব-জিজ্ঞাসা*, [সম্পা.], পুস্তক বিপণি, কলকাতা

Dhaka University Institutional Repository

তরুণ সান্যাল (১৯৭২) *আধুনিক কবিতা : বিচ্ছিন্নতা, বিশুদ্ধতা ইত্যাদি প্রসঙ্গ*, প্রথম প্রকাশ, সারস্বত লাইব্রেরী, কলকাতা

তন্ময় দত্ত সম্পাদিত (১৯৬৩) *প্রসঙ্গ: জাঁ পোল সার্ত্র*, বিদ্যুৎসাহী প্রকাশ, কলকাতা

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (১৩৫৩) *আধুনিক য়ুরোপীয় দর্শন*, বিশ্বভারতী, কলকাতা

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৯২) *ষাড় ও কিন্নর : ফেদেরিকো গারসিয়া লোরকার কবিতা*, প্রথম প্রকাশ, সাহিত্য অকাদেমি, নতুন দিল্লী

নিখিল বিশ্বাস (২০০৮), *শিল্পের চোখ*, পরিবর্ধিত মনফকিরা সংস্করণ, কলকাতা

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (২০০৬), *কবিতার কী ও কেন*, পঞ্চম সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

প্রকাশনা উপ-পরিষদ (২০০৬) [সম্পা.], *শামসুর রাহমান স্মারক গ্রন্থ*, প্রথম প্রকাশ, কবি শামসুর রাহমান নাগরিক স্মরণ সভা কমিটি, যুক্তরাজ্য

প্রবাসজীবন চৌধুরী (১৯৯১) *রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যদর্শন*, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা

প্রমোদবন্ধু সেনগুপ্ত (১৯৮৯) *পাশ্চাত্য দর্শন*, ব্যানার্জী পাবলিশার্স, পঞ্চদশ সংস্করণ, কলকাতা

বদরুল আলম নাবিল [সম্পা.] (২০০৭), *শামসুর রাহমানের পত্র ও প্রেমপত্র*, প্রথম প্রকাশ, সময় প্রকাশন, ঢাকা

বার্ণিক রায় (১৩৭৮) *কবিতা : চিত্রিত ছায়া*, প্রথম প্রকাশ, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা

বাবলু ভট্টাচার্য (২০১১) *পাবলো পিকাসো*, প্রথম প্রকাশ, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা

বারীন্দ্র বসু (১৯৮৭) *কবিতা, আধুনিকতা ও আধুনিক কবিতা*, প্রথম প্রকাশ, রত্নাবলী, কলকাতা

বিনয় ঘোষ (১৯৮০) *শিল্প সংস্কৃতি ও সমাজ*, দ্বিতীয় সংযোজিত সংস্করণ, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা

বিমলকুমার মুখোপাধ্যায় (১৯৯১) *রবীন্দ্রনন্দনতত্ত্ব*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

বিমলকৃষ্ণ সরকার (২০০৪) *কবিতার কথা*, প্রথম মুদ্রণ, নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা

বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় (১৯৭২) *রোমান্টিক কবি ও কাব্য*, প্রথম প্রকাশ, বাক্-সাহিত্য প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

বিষ্ণু দে

ক. (১৯৮০) *সেকাল থেকে একাল*, বিশ্ববাণী, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা

খ. (১৩৫৯) *সাহিত্যের ভবিষ্যৎ*, প্রথম সিগনেট প্রেস সংস্করণ, কলকাতা

বুদ্ধদেব বসু

ক. (১৯৮১), *বোদলেয়ার: তাঁর কবিতা*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

খ. (১৯৭৪) *কবিতার শত্রু ও মিত্র*, প্রথম প্রকাশ, এম.সি.সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড,কলকাতা

ভূঁইয়া ইকবাল ও রেজাউল কবির সুমন সম্পাদিত, (২০০৬) *নির্জনতা থেকে জনারণ্যে: শামসুর রাহমান*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা

ম. রফিকুল ইসলাম, (২০০০) *কিউবিজম ও অনুষঙ্গ*, প্রথম প্রকাশ, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা

মনজুরুল ইসলাম সৈয়দ (১৯৮৫) *নন্দনতত্ত্ব*, প্রথম সংস্করণ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় [সম্পা] (১৯৮৬) *সাহিত্য শিল্পভাবনা*, নবমন, নতুন পরিবর্ধিত সংস্করণ, কলকাতা

মঞ্জুভাষ মিত্র (১৯৮৬) *আধুনিক বাংলা কবিতায় ইয়োরোপীয় প্রভাব*, প্রথম প্রকাশ, নবার্ক, কলকাতা

Dhaka University Institutional Repository

মাসুদুজ্জামান (১৯৯৩) *বাংলাদেশ ও পশ্চিম বাংলার কবিতা তুলনামূলক ধারা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

মোরশেদ শফিউল হাসান অনুদিত, *ফেদারিকো গার্থিয়া লোরকা: নির্বাচিত কবিতা*, ১৯৮৪, প্রথম প্রকাশ, কপোতাক্ষি, ঢাকা

মুহম্মদ আব্দুল বারী (১৯৮৮) *দর্শনের কথা*, হাসান বুক হাউজ, চতুর্থ সংস্করণ, ঢাকা

মৃগাঙ্ক রায় (১৩৭২), *কবিতার কথা*, প্রথম প্রকাশ, সারস্বত লাইব্রেরী, কলকাতা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ক. *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, ত্রয়োবিংশ খণ্ড (১৮৮০), বিশ্বভারতী, কলকাতা

খ. *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, সপ্তবিংশ খণ্ড (১৯৭৪), বিশ্বভারতী, কলকাতা

রণেন্দ্রনাথ দেব (১৯৬৩), *কবিস্বরূপের সংজ্ঞা*, প্রথম প্রকাশ, বুকল্যান্ড প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

লেনিন আজাদ, *উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান : রাষ্ট্র, সমাজ ও রাজনীতি*, (১৯৯৭), ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা

শামসুর রাহমান

ক. *স্মৃতির শহর*, দ্বিতীয় প্রকাশ, ১৯৯০, ঢাকা নগর জাদুঘর, ঢাকা

খ. *কালের ধুলোয় লেখা*, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০০৭, অন্যপ্রকাশ, ঢাকা

গ. *আমৃত্যু তাঁর জীবনানন্দ*, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯৯, প্রতিভাস, কলকাতা

ঘ. *কবে শেষ হবে কৃষ্ণপক্ষ*, প্রথম প্রকাশ ২০০৬, একুশে বাংলা প্রকাশন, ঢাকা

ঙ. *মস্কো থেকে ফিরে*, প্রথম প্রকাশ ২০০৭, আনন্দ প্রকাশ, ঢাকা

শামসুর রাহমান ও মতিউর রহমান, *শহীদ নূর হোসেন*, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০১৩, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা

শামসুজ্জামান খান, আমিনুর রহমান [সম্পা.] (২০১০), *শামসুর রাহমান স্মারক গ্রন্থ*, প্রথম সংস্করণ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

শিবনারায়ণ রায় (১৯৭৩), *কবির নির্বাসন ও অন্যান্য ভাবনা*, প্রথম সংস্করণ, প্রকাশ ভবন, কলকাতা

শ্রীসুহাস চট্টোপাধ্যায় (১৯৮৪), *মার্কসবাদ ও নন্দনতত্ত্ব*, প্রথম সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা

সঞ্জয় ভট্টাচার্য (১৩৫১), *তিনজন আধুনিক কবি*, প্রথম সংস্করণ, পূর্ব্বাশা লি., কলকাতা

সত্যেন্দ্রনাথ রায়

ক. (১৩৯৬), *সাহিত্যতত্ত্বে রবীন্দ্রনাথ*, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা

খ. (২০০২), *সাহিত্যপ্রসঙ্গ ও শিল্পকথা*, বাউলমন প্রকাশন, প্রথম সংস্করণ, কলকাতা

সমর সেন (২০০৬), *কয়েকটি কবিতা*, সব্যসাচী দেব সম্পাদিত, অনুষ্টুপ বিশেষ সংস্করণ, কলকাতা

সাঈদ-উর-রহমান

ক. (১৯৮৫) *মার্কস ও মার্কসবাদীদের সাহিত্যচিন্তা*, [সংকলন ও অনুবাদ], একাডেমিক পাবলিশার্স, ঢাকা

খ. (১৯৮৩) *পূর্ববাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

সিতাংশু রায় (১৪০৮) *সৌন্দর্যদর্শন*, প্রথম সংস্করণ, সুবর্ণরেখা, কলকাতা

সুচেতা মিত্র (১৯৮৫) *শব্দের শরীরী প্রতিমা*, প্রথম প্রকাশ, এ মুখার্জি অ্যান্ড কোং প্রা: লি:, কলকাতা

সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ, (১৯৬০) *গ্রীক পুরাণ কথা*, প্রথম সংস্করণ, তুলি-কলম, কলকাতা

Dhaka University Institutional Repository

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯৯৫), *সুধীন্দ্রনাথ দত্তের প্রবন্ধসংগ্রহ*, প্রথম প্রকাশ পুণর্মুদ্রণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

সুধীরকুমার দাশগুপ্ত (১৩৮৬) *কাব্যলোক*, ১ম খণ্ড, ৫ম সংস্করণ, কলকাতা

সুধীর কুমার নন্দী (১৯৯৬), *নন্দনতত্ত্ব*, তৃতীয় সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা

সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায় (১৩৯০), *কাব্যনির্মাণ কলা*, করুণা প্রকাশণী , কলকাতা

সুভাষ মুখোপাধ্যায় (১৯৯৩), *কবিতার বোঝাপড়া*, প্রথম সংস্করণ, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা

হাসনাত আবদুল হাই (২০০৪) *সবার জন্য নন্দনতত্ত্ব*, প্রথম প্রকাশ, কাগজ প্রকাশন, ঢাকা

হাসান হাফিজুর রহমান (১৯৯৩) *আধুনিক কবি ও কবিতা*, পুনর্মুদ্রণ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

হুমায়ুন আজাদ (২০০৪) *শামসুর রাহমান : নিঃসঙ্গ শেরপা*, দ্বিতীয় সংস্করণ দ্বিতীয় পুনর্মুদ্রণ, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা

Abercrombie Lascelles (1922), *An Essay towards a Theory of Art*, Martin Secker Ltd., London

AdornoTheodor (2002), *Aesthetic Theory*, Continuum, London

Ainslie Doglas [trans] (1965), *Benedetto Croce, Aesthetic: As Science of Expression and General Linguistic*, The Noonday Press, U.S.A.

Auden W. H. (1958), *W. H. Auden: A selection by The Author*, Penguin Books Ltd., Australia

Baldick, Chris (2001) *The Concise Oxford Dictionary of Literary Terms*, Oxford University Press, U.K

Baudrillard, Jean (1983) *The Precession of Simulacra* [Trans. Paul Foss, Paul Patton and Philip Beitehman] Semiotertce, U.S.A.

Beiser Frederick (2009), *Diotima's Children*, Oxford University Press, London

Bell Clive (1913), *Art*, Frederick A. Stokes Company Publishers, New York

Bernard J.H. [trans.] (1914) *Kant's Critique of Judgement*, Macmillan and Co. Ltd, London

Blackmur R.P. (1957) *Form & Value in Modern Poetry*, Anchor Books, New York

Bob Perelman (1996), The Marginalization of Poetry: Language Writing and Literary History, Prinston University Press, U.K.

Bosanquet Bernard

a. (1886) *The Introduction to Hegel's Philsophy of Fine Art* [trans. kegan paul] Trench & co, London
b. (1919) *Croce's Aesthetic*, The British Academy, London
c. (1934) *A History of Aesthetics*, George Allen & Unwin LTD, London

Dhaka University Institutional Repository

Bradley A.C. (1884), *The Study of Poetry*, Macmillan and Co., London

Bradbury Malcolm & McFarlane James (1991) *Modernism 1890-1930*, Penguin Books LTD, London

Breton Andre (1969), *Menifestoes of Surrealism*, [trans. Richard Seaver and Helen R. Lane] University of Michigan Press, U.S.A

Brownson Lewis Carleton (1920) *Plato's Studies & Criticism of The Poets*, The Gorham Press, U.S.A

Burkhardt Armin and Nerlich Brigitte [ed] (2010) *Tropical Truth(s)*, Gruyter Gmblt & Co, Germany

Carritt E. F (1914), *The Theory of Beauty*, Mathuen & Co. Ltd., London

Chadwick Charles (1971), *Symbolism*, Methuen & Co Ltd, London

Collins Arthur H. (1913) *Simbolism of Animals & Birds*, Sir Isaac Pitman & Sons Ltd., London

Day N. Henry (1872) *Aesthetics or The Nature, Kinds, Laws, and Uses of Beauty*, Charles C. Chatfield & Co., U.S.A

Dr. S. Sen & others (1994), *Preface to the Lyrical Ballads*, , Unique Publishers, New Delhi

Eagleton Terry

a. (2007), *How to Read a Poem*, Blackwell Publishing, U.S.A
b. (2003), *Literary Theory*, The University of Minnesota Press, U.S.A

Eliot, T.S.

a. (1936) *Collected Poems 1909-1962*, Harcourt, Brace & World, Inc., New York
b. (1976) *Selected Essays*, Faber & Faber Limited, London
c. (1969) *On Poetry and Poets*, Faber and Faber Limited, London
d. (1970) *The Use of Poetry and The Use of Criticism,* Faber and Faber Limited, London

Eysteinsson Astradur & Liska Vivian [ed.] (2007) *Modernism vol.1*, John Benjamins publishing co., U.S.A.

Foucault Michel (1970) *The Order of Things : An Archaeology of the Human Sciences*, Routledge, London

Dhaka University Institutional Repository

Fowlie Wallace (1950), *Age of Surrealism*, The Swallow Press & William Morrow & Co, U.S.A

Fry F. Edward (1966), *Cubism*, Thames and Hudson LTD, London

Gilles Deleuze and Felix Guattari (1983), *Anti-Oedipus*, [trans. Robert Hurley, MarkSeem, and Helen R. Lane] University of Minnesota Press, U.S.A

Graham Gordon (2005), *Philosophy of the Arts*, Routledge, London

Hartley Anthony [ed.] (1966), *The Penguin Book of French Verse . 4*, Penguin Books Ltd., U.S.A

Hartman G. Henry (1919), *Aesthetics: A Critical Theory of Art*, R. G. Adams & Co., U.S.A

Henri Adrian, McGough Roger, Patten Brian (1975), *The Mersey Sound (Penguin Modern Poets-10)*, Penguin Books Ltd, Great Britain

Henrich Dieter (1992), *Aesthetic Judgement and the Moral Image of the World: Studies in Kant*, Stanford University Press, U.S.A.

Howard Griggs Edward (1913) *The Philosophy of Art*, B. W. Huebsch, New York

Howe Irving (1967) *Literary Modernism*, A Fawcett Publications, New York

Humphrey Nicholas (1984), *Consciousness Regained*, Oxford University Press, New York

Khadye K. M. (1922), *Benedetto Croce's Aesthetic Applied to Literary Criticism*, The Aryabhushan Press, India

Knight William (1891), *The Philosophy of the Beautiful*, Charles Scribner's Sons, New York

Langer Susanne K. (1959) *Philosophy in a New Key*, The New American Library, New York

Lauvriere Emile (1910) *Repeatition and Parallelism in Tennyson*, Oxford University Press, London

Lewis, C. Day, (1968) *The Poetic Image*, Cox & Wyman Ltd, London

Lyotard, Jean-Francois (1984), *The Postmodern Condition : A Report on Knowledge*, [trans. Geoff Bennington and Brian Massumi] Manchester University Press, U.K

Macquarrie John (1986), *Existentialism*, Penguin Books Ltd, New York

Dhaka University Institutional Repository

Mazur Krystyna (2005), *Poetry and Repetition: Walt Whitman, Wallace Stevens, John Ashbery*, Routledge, London

Mendelson Edward [ed.] (1979) *W.H. Auden: Selected Poems* , Vintage books, New York

Norman Charles (1966), *Poets On Poetry*, The Free Press, New York

Olivero Federico (1921), *Studies in Modern Poetry*, Humphrey Milford, London

Osborne Harold [ed.] (1979) *Aesthetics*, Oxford University Press, London

Pound Ezra (1966) *A Retrospect, Poets On Poetry* [ed. Norman Charles] The Free Press, New York

Prickard A. O. (1891) *Aristotle On The Art of Poetry*, Macmillan & Co., London
Reed Herbert (1996), *The Meaning of Art*, Rupa & Co, Calcutta

Ricks Cristopher (1997), *The Force of Poetry*, Clarendon Press, New York

Riley Denise [ed] (1992), *Poets on Writing*, Macmillan Academic and Provessional LTD, London

Roberts W. Rhys (1907) *Longinus On The Sublime*, Cambridge University Press, London

Roland Barthes

a. (1991) *Image Music Text*, [trans. Stephen Heath] Fontana Press,
b. (1991) *Mythologies* [trans. Annette Lavers], The Noonday Press, New York

Shelly Persy Bysshe (1904) *A Defence of Poetry*, The Bobbs-Merrill Company, IndianPolis

Smith Alphonso C. (1894) *Repeatition and Parallelism in English Verse*, University Publishing Company, New York

Spears K. Monroe [ed.] (1964), *Auden: A Collection of Critical Essays*, Prentice-Hall, Inc., U.S.A.

Spender Stephen (1965) *The Struggle of The Modern*, Methuen & Co Ltd, London

Symons Aurthur (1919) *Symbolist Movement in Literature*, E.P. Dutton & Co., New York

Tate Allen [ed.] (1960), *The Language of Poetry*, Russell & Russell, New York

Taterkiewiez Wladyslaw, (2005) *The History of Aesthetics*, vol. 2, 3 [ed. J. Harrell, C. Barrett, D. Petch], Continuum Publishing, London

Dhaka University Institutional Repository

Tarn Nathaniel [ed.] (1975) *Pablo Neruda*, Penguin Book LTD, England

Thomas, Dylan, (1972) *Collected Poems 1934-1952, Everyman's Library*, London

Vivian Percival (1900) *A Dictionary of Literary Terms*, Routledge, London

White Morton (1964) *The Age of Analysis: 20th Century Philosophers*, The New American Library, U.S.A.

Wilson, Colin (1982) *The Outsider*, foreword by Marlyn Ferguson, Penguin Putnam inc. , New York

প্রবন্ধঃ

অমলেন্দু বসু (জানু-মার্চ ১৯৯১)''শামসুর রাহমানের কবিতা'', *মীজানুর রহমানের ত্রৈমাসিক পত্রিকা* [সম্পা. মীজানুর রহমান] ষষ্ঠ বর্ষ ৩য় সংখ্যা, উবিনীগ, ঢাকা

অসীম সাহা (২০১৩)''ষাটের দশক ও *স্যাড জেনারেশন* আন্দোলন'', *নান্দীপাঠ*, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি-ঐতিহ্য বিষয়ক সাময়িকী, সংখ্যাঃ পাঁচ, ফেব্রুয়ারি, ২০১৩ [সম্পা. সাজ্জাদ আরেফিন] সিটি আর্ট প্রেস লিমিটেড, ঢাকা

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস (জুলাই, ২০০২)''স্মৃতির শহরে কবির জাগরণ'', *কিছুধ্বনি* কবিতাপত্র, শামসুর রাহমান সংখ্যা, ৩৭ বর্ষঃ ২য় সংখ্যা, [সম্পা.আন্ওয়ার আহমদ], মারিয়া প্রিন্টার্স, বগুড়া

জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী (২০০৬) "শামসুর রাহমানঃ তাঁর কবিতা", *নির্জনতা থেকে জনারণ্যে*, [সম্পা. ভূঁইয়া ইকবাল ও রেজাউল কবির সুমন] মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা

জুলফিকার হায়দার (ফেব্রু, ২০১৩)''ষাটের কবিতা : সন্ত্রস্ত সময়ের শিল্প'', *নান্দীপাঠ*, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি-ঐতিহ্য বিষয়ক সাময়িকী, সংখ্যাঃ পাঁচ, [সম্পা. সাজ্জাদ আরেফিন], সিটি আর্ট প্রেস লিমিটেড, ঢাকা

ফরহাদ মাজহার (জানু-মার্চ ১৯৯১), ''শামসুর রাহমানের কবিতার একটি রাজনৈতিক পাঠ'', *মীজানুর রহমানের ত্রৈমাসিক পত্রিকা* [সম্পাঃ মীজানুর রহমান] ষষ্ঠ বর্ষঃ ৩য় সংখ্যা, উবিনীগ, ঢাকা

মনজুরুল ইসলাম, সৈয়দ (২০১০) ''পুনর্নির্মাণের আয়োজন : শামসুর রাহমানের সাম্প্রতিক কবিতা'' *শামসুর রাহমান স্মারক গ্রন্থ*, [সম্পা. শামসুজ্জামান খান ও আমিনুর রহমান সুলতান] বাংলা একাডেমী, ঢাকা

মনজুরুল ইসলাম, সৈয়দ (২০০৬) ''শামসুর রাহমানের শহর'', *নির্জনতা থেকে জনারণ্যেঃ শামসুর রাহমান* [সম্পা.ভূঁইয়া ইকবাল ও রেজাউল করিম সুমন] মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা

মীজানুর রহমান (জানু-মার্চ ১৯৯১) ''চরিত-কথাঃ প্রাসঙ্গিক বিষয়'', *মীজানুর রহমানের ত্রৈমাসিক পত্রিকা*, শামসুর রাহমান সংখ্যা, ষষ্ঠ বর্ষ ৩য় সংখ্যা, উবিনীগ, ঢাকা

রশীদ করীম (২০০৬) ''শামসুর রাহমানের কবিতা'', *নির্জনতা থেকে জনারণ্যে*, [সম্পা. ভূঁইয়া ইকবাল ও রেজাউল করিম সুমন] মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা

বায়তুল্লাহ্ কাদেরী, (২০১০) ''শামসুর রাহমানের কবিতার বিষয় ও প্রকরণ'', *শামসুর রাহমান স্মারকগ্রন্থ* [সম্পা. শামসুজ্জামান খান ও আমিনুর রহমান সুলতান] বাংলা একাডেমী, ঢাকা

বায়তুল্লাহ্ কাদেরী (জুলা-অক্টো, ২০০৫), '' শামসুর রাহমানের কবিতা : চতুরাঙ্গিক জীবন-ভাবনা'', *সাহিত্য পত্রিকা*, [সম্পা. মোঃ আবু জাফর], ৪৭ বর্ষ সংখ্যা-১, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

শম্ভু মিত্র (১৯৯১) ''শামসুর রাহমানের কবিতা'', *মীজানুর রহমানের ত্রৈমাসিক পত্রিকা*, [সম্পা: মীজানুর রহমান], ষষ্ঠ বর্ষ: ৩য় সংখ্যা, উবিনীগ, ঢাকা

শামসুর রাহমান (জুলাই, ২০০২) ''কবিতার দায়'', *কিছুধ্বনি*, কবিতা পত্র, শামসুর রাহমান সংখ্যা, [সম্পা. আনওয়ার আহমদ] মারিয়া প্রিন্টার্স, বগুড়া

শামসুর রাহমান (জানু-মার্চ, ১৯৯১) ''পূর্ববাঙলার সাম্প্রতিক কবিতা'', *মীজানুর রহমানের ত্রৈমাসিক পত্রিকা*, ষষ্ঠ বর্ষ : তৃতীয় সংখ্যা, উবিনীগ, ঢাকা

শামসুর রাহমান (২০০৬) ''চাই পারমাণবিক অস্ত্রমুক্ত দুনিয়া'', *কবে শেষ হবে কৃষ্ণপক্ষ*, একুশে বাংলা প্রকাশন, ঢাকা

শামসুল হক, সৈয়দ (২০১০)'' আমাদের মহান সতীর্থ শামসুর রাহমান'', *শামসুর রাহমান স্মারক গ্রন্থ* সম্পা.শামসুজ্জামান খান ও আমিনুর রহমান] বাংলা একাডেমী, ঢাকা

সারওয়ার মুরশিদ খান (২০০৬) ''শামসুর রাহমান রচনাবলী-র ভূমিকা'', *নির্জনতা থেকে জনারণ্যে: শামসুর রাহমান* [সম্পা. ভূঁইয়া ইকবাল ও রেজাউল করিম সুমন], মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা

পত্রিকা:

কিছুধ্বনি কবিতা পত্র , আন্ওয়ার আহমদ [সম্পা.] , জুলাই ২০০২, ৩৭ বর্ষ : ২য় সংখ্যা, শামসুর রাহমান সংখ্যা, মারিয়া প্রিন্টার্স, বগুড়া।

কালি ও কলম , আনিসুজ্জামান [সম্পা.], অক্টোবর ২০০৬, তৃতীয় বর্ষ নবম সংখ্যা, শামসুর রাহমান স্মরণ সংখ্যা, ঢাকা।

মীজানুর রহমানের ত্রৈমাসিক পত্রিকা , মীজানুর রহমান [সম্পা.], জানু-মার্চ ১৯৯১, ষষ্ঠ বর্ষ ৩য় সংখ্যা, শামসুর রাহমান সংখ্যা, উবিনীগ, ঢাকা

নান্দীপাঠ, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি-ঐতিহ্য বিষয়ক সাময়িকী, সাজ্জাদ আরেফিন [সম্পা.], অক্টোবর ২০১০, সংখ্যা: চার, সিটি আর্ট প্রেস লিমিটেড, ঢাকা

নান্দীপাঠ, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি-ঐতিহ্য বিষয়ক সাময়িকী, সাজ্জাদ আরেফিন [সম্পা.], ফেব্রুয়ারি ২০১৩, সংখ্যা: পাঁচ, সিটি আর্ট প্রেস লিমিটেড, ঢাকা

সংক্রান্তি, রনজু রাইম [সম্পা.], ফেব্রুয়ারি ২০১১, বর্ষ: ৫ সংখ্যা: ৫, ডেসটিনি প্রিন্টিং প্রেস লিমিটেড, ঢাকা

মুনাজেরা , মোস্তাক আহমাদ দীন [সম্পা.], অক্টোবর ২০১১, তৃতীয় সংখ্যা, সুরমা ঘর, সিলেট

সাহিত্য পত্রিকা, মো: আবু জাফর [সম্পা.], জুলাই-অক্টোবর ২০০৫, ৪৭ বর্ষ সংখ্যা-১, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

সাক্ষাৎকার:

হুমায়ুন আজাদ (জানু-মার্চ, ১৯৯১) ''শামসুর রাহমানের মুখোমুখি'', *মীজানুর রহমানের ত্রৈমাসিক পত্রিকা*, শামসুর রাহমান সংখ্যা, ষষ্ঠ বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা, উবিনীগ, ঢাকা

আবুল আহসান চৌধুরী (২০১১)''অন্তরঙ্গ শামসুর রাহমান'', *কবি কথন: শামসুর রাহমানের নির্বাচিত সাক্ষাৎকার* [সম্পা. আহমদ মাজহার ও পিয়াস মজিদ], শুদ্ধস্বর, ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

আনিসুজ্জামান (২০১১) ''বুক তাঁর বাংলাদেশের হৃদয়'', *কবি কথন : শামসুর রাহমানের নির্বাচিত সাক্ষাৎকার*, [সম্পা. আহমদ মাজহার ও পিয়াস মজিদ], শুদ্ধস্বর, ঢাকা